

বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা **খাল্খাতা**
বাংলাদেশে পাটের ভবিষ্যৎ সংখ্যা
১০ম বর্ষ ২য় ও ৩য় যৌথসংখ্যা এপ্রিল - সেপ্টেম্বর ২০১৬

প্রধান সম্পাদক
শওকত হোসেন

সম্পাদক
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাড়ি ৪/১/এ, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
শিল্পী: সুব্রত চৌধুরীর অংকন অবলম্বনে

কম্পোজ
প্রান্তিক

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
১৫০.০০ টাকা
১৫০.০০ রুপি
৩ \$ ডলার

সম্পাদকীয়: এক

একসময়ে পাট ছিল মিশরের এক ধরনের তেতো শাক। আজ থেকে প্রায় ১৯০০ বছর আগে বাংলার উর্বর মাটিতে এর বীজ এসে এই গাছ লম্বাটে আকার ধারণ করে। পানিতে ভিজিয়ে রেখে এর আঁশ তুলে গৃহস্থ তার নানা কাজের উপযোগিতা খুঁজে পায়। এভাবে পাট হয়ে ওঠে গৃহস্থের দরকারি পণ্য। পাট শিল্পের মর্যদা লাভ করে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে স্কটল্যান্ডের 'ডাল্ডি' শহরে। এরও অনেক পরে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অগ্রগণ্য পাট, হয়ে ওঠে প্রধান অর্থকরী ফসল- অতঃপর 'সোনালি আঁশ'।

১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হলে অখণ্ড ভারতের মোট ১০৮টি পাটকলের পুরোটাই পড়ে ভারত সীমানায়। বিশ্বের ৮০% পাট উৎপাদনশীল অঞ্চল হয়েও একটি পাটকলও পড়েনি পূর্ব পাকিস্তান সীমানায়। ১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় বাওয়ানি গ্রুপের 'বাওয়ানি জুট মিল' নামক বাংলাদেশের প্রথম পাটকল। একই বছরে প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'আদমজী জুট মিল'। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ৭৭টি পাটকল। যেগুলোর নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের পুরোটাই ছিল বাওয়ানি, আদমজী, ইস্পাহানি এবং দাউদ ইত্যাদি গ্রুপ অব কোম্পানিজ তথা পাকিস্তানিদের দখলে। পাটের পুরো লভ্যাংশ নিয়ে যেত তারা। পূর্ববাংলার শমিকের ঘামে-শমে অর্জিত অর্থে উন্নত হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তান আর একতরফাভাবে বঞ্চিত হতে থাকে পূর্ব পাকিস্তান।

বিশ্বে যে পরিমাণ পাট উৎপাদিত হয় তার মধ্যে ভারত, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, চীন, মায়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান অন্যতম। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পাট উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান আগের জায়গায় না থাকলেও স্বাধীনতার কিছু পর থেকে আজ অব্দি দ্বিতীয়। মানের দিক থেকেও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পাট জন্মায় বাংলাদেশে। তদুপরি, দেশি-বিদেশি

চক্রান্তের শিকার হয় এখানকার পাটশিল্প । বিশ্বব্যাংকের ফতোয়া ছিল, পাটকল খোলা রাখলে যত ক্ষতি, বন্ধ রাখলে তার থেকে কম ক্ষতি । বিষয়টিকে সামনে এনে নানা নেতিবাচক শর্তসাপেক্ষে নতুন নতুন ঋণের বোঝা চাপাতে থাকে । ১৯৭২ সালে নারায়ণগঞ্জ, দৌলতপুর ও সরিষাবাড়িসহ বহু পাটকল ও পাটের গুদামে একের পর এক আগুন লাগানো হয় । ফলাফল হিসেবে পাটের আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমাগত ধস নেমে আসে । সেই সুযোগটি তখন লুফে নেয় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত । কটুকৌশলী ভারত উল্কার গতিতে দখল করতে থাকে আন্তর্জাতিক পাটের বাজার । সবশেষে ২০০২ সালের ৩০ জুন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ফন্দিবাজ, লুটেরা ও দুর্নীতিবাজদের ষড়যন্ত্রে বন্ধ হয়ে যায় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ আদমজী পাটকল । লাখ-লাখ শ্রমিকের জীবন দারিদ্র্যসীমার নিচে নামিয়ে এনে অপকৌশলে করা হয় দারিদ্র্যের পুনরুৎপাদন ।

তবে ড. মাকসুদুল আলম একদল বিজ্ঞানী নিয়ে পাটের জেনম আবিষ্কার করে আমাদের যেন ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলেন । কোটি কোটি কৃষক-শ্রমিককে আলোর নিশানা দেখিয়ে তিনি যেন বলছেন, ‘আর রক্তাক্ত দেহ—অভুক্ত উদর নয়’ । বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-দেশীয় লুটেরাদের বর্বরোচিত উন্নয়নের নামে আর শোষণ নয় । এবার পাটের ভবিষ্যৎ আশ্চর্য সম্ভাবনার, প্রকৃতই উন্নয়নের ।

শরমিন নিশাত

সম্পাদক

১৫.০৯.২০১৬

সম্পাদকীয়: দুই

খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৮০০ বছর পূর্বের ‘মনুসংহিতা’য় পাট্টা শব্দের উপস্থিতি লক্ষণীয়। মহাভারতে ‘পাট্টাজাম বস্ত্র’ এবং বাইবেলে ‘পট্টবস্ত্র’ হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায় পাটের। এছাড়া বড়ু চণ্ডীদাসের (১৩৪০-১৪৪০) শ্রীকৃষ্ণকর্তন কাব্যের বংশীখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশিতে পাট-গুচ্ছের অলংকারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রায় ১৯০০ বছর আগে মিশর থেকে আসা এক ধরনের শাক জাতীয় গাছের বীজ এখানকার উর্বর মাটিতে পড়ে আরও লম্বা ও মোটা হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে শাকের পাশাপাশি এর আঁশ এতদ অঞ্চলের গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। পাট হয়ে ওঠে নিত্যদিনের অপরিহার্য উপাদান। এভাবে ধীরে ধীরে পাটের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় এটি ব্যাপক চাষাবাদের বিষয় হয়ে ওঠে। পাট রপ্তানি হতে শুরু করে বিদেশে। একপর্যায়ে এ-খাত থেকে অর্জিত হতে থাকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা।

দুই.

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর আদমজী গ্রুপ, দাউদ গ্রুপ ও বাওয়ানি গ্রুপ পূর্ববাংলার পাটব্যবসার নেতৃত্ব দেয়। এসব গ্রুপ-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের।

পূর্ব পাকিস্তানের লোকজনের কর্মসংস্থান ঘটেছিল এইসব পাটকলে, কিন্তু লাভের প্রায় পুরোটাই চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে। বলা হয়ে থাকে, পূর্ব পাকিস্তানের পাটের টাকায় করাচি, পিণ্ডি ও ইসলামাবাদ গড়ে উঠেছিল। দুই পাকিস্তানের মধ্যে পাট-খাতের যে বৈষম্য, প্রধানত তাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি। মুক্তিযুদ্ধে আমরা বিজয়ী হয়েছি বটে কিন্তু অনভিজ্ঞতা এবং দুর্নীতির কারণে পাট-খাতকে আমরা আর আগের জায়গায় ধরে রাখতে পারিনি।

তিন.

একটা মিল বন্ধ হওয়ার আগে যে-ধরনের প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়া গ্রহণ করা দরকার ছিল, সেটা আদমজীসহ কোনো মিলের ক্ষেত্রেই রক্ষা করা হয়নি। বিশেষ করে আদমজীর কথাই ধরা যাক, অনেকদিন ধরে বেশকিছু তীব্র সংকট আদমজীতে বিরাজ করছিল— বিশ্বব্যাপক এবং আরও কিছু দেশ বারবার চাপ দিচ্ছিল মিলটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কোনোরকম পর্যালোচনা ছাড়াই আদমজী বন্ধ করে দেয়। সরকার ভাবল না,

বিশ্বের এই সর্ববৃহৎ পাটকলের প্রত্যক্ষ লোকসানের তুলনায় এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যৌথ লাভালাভ অনেক গুণে বেশি। প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের বাইরেও লক্ষ লক্ষ মানুষ আদমজী'র ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করত— এই মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তারা সবাই জীবিকা হারিয়ে বেকার-অসহায় ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। এভাবে একে একে বহু পাটকল মালিক ও সরকারের অদক্ষতা, দুর্নীতি এবং নানা দেশের ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। 'সোনালি আঁশ' নামের রক্তিম সূর্যের নিরুপায় অস্ত-যাওয়া দেখে দেশের সাধারণ ভুক্তভোগী মানুষ।

চার.

পাটের জেনম আবিষ্কার করেছেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা। পাটের জেনম আবিষ্কারক বিজ্ঞানীদের প্রধান ড.মাকসুদুল আলম। তাঁর মৃত্যুর পর এর প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেন ড. মঞ্জুরুল আলম। জেনম আবিষ্কারের পর এটি পেটেন্ট করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এর প্রায়োগিক দিক নিয়েও নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এতে নিশ্চিতভাবে ঘটতে যাচ্ছে পাটের গুণগত ও পরিমাণগত উৎকর্ষ। বিষয়টি এখন বাংলাদেশের সামনে এক বিশাল সম্ভাবনা। আজকাল বিশ্বজুড়ে পরিবেশবান্ধব হিসেবে পাটপণ্য ব্যবহারের পক্ষে মত তৈরি হচ্ছে। সব মিলিয়ে পাট-খাতের ওপর বর্তমান সরকারেরও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। বেশকিছু বন্ধ পাটকল চালু করা হয়েছে এবং ব্যক্তিমালিকানায় সচল-থাকা কিছু পাটকল সরকারি মালিকানায় স্থানান্তর করা হয়েছে, এছাড়া আরও কিছু বন্ধ পাটকল চালু করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

এক সময়ে সোনালি আঁশ ছিল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত। বহুদিন বাদে আবার যেন পাট এদেশের মানুষের ভাগ্য ফেরাতে আশ্বাস দিচ্ছে। এর আঁশই শুধু নয়, বাংলাদেশের পাটখড়ির ছাইও উঁচু কদর অর্জন করেছে বিদেশে ওষুধ ও প্রসাধন সামগ্রীর কাঁচামাল হিসেবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, রেমিটেন্স ও গার্মেন্টস খাতের পাশাপাশি বাংলাদেশের পাট খাতেও আজ সুদিন ফিরে আসা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সংখ্যাটি প্রকাশে যারা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

শওকত হোসেন

প্রধান সম্পাদক, হালখাতা

০১.০৯.২০১৬

সূচি

সা ক্ষা ৎ কা র

পাটখাতে নতুন করে সুদিন ফিরে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে
কা জী খ লী কু জ্জ মা ন আ হ ম দ ০৮

প্র বন্ধ

পাটশিল্প, পাটচাষ ও পাটবাণিজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার পথে
ব দ রু দ্দী ন উ ম র ১৮
পাটশিল্প বিনাশের দায় কার?
আ নু মু হা ম্ম দ ২৩

প্র বন্ধ

আদমজী পাটকলের বিলুপ্তি এবং বাংলাদেশে শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ
আ বু ল বা র কা ত ৪৩

সা ক্ষা ৎ কা র

বিশ্বে পাট নিয়ে বিশাল সম্ভাবনার নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ
মা ক সু দু ল আ ল ম ৬৬

প্র তি ক্রি য়া

জিন সম্পদে কৃষকের অধিকার
মো. শ হী দু র র শী দ ভূঁ ই য়া ৭৫
পাট নিয়ে স্মৃতি ও কিছু কথা
আ ব দু ল আ উ য়া ল ৮১

প্র বন্ধ

সোনালী আঁশের জিন-নকশা বাংলাদেশকে বদলে দেবে
মো. মা হ বু বু ল ই স লা ম ৮৪
আমাদের শ্রেষ্ঠ মেধাসম্পদ
হা সি না খা ন ৯০

প্রবন্ধ

পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ

হায়দার আকবর খান রনো ৯৫

পাটের ভবিষ্যৎ : ফিরে আসুক সোনালী আঁশের সোনালী দিন

জাহাঙ্গীর আলম ১০০

বাংলাদেশে পাটচাষের সম্ভাবনা ও প্রতিকূলতা

শামীম শামছি ১০৯

পাট: বাংলাদেশের সোনালি আঁশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শীর্ষক একটি পর্যালোচনা

হোমায়রা আহমেদ ১১২

প্রবন্ধ

পাটের অর্থনীতি

জাহাঙ্গীর আলম ১১৬

পরিবেশবান্ধব পাটচাষের জন্য প্রয়োজন প্রণোদনা

আরশাদ সিদ্দিকী ১২৮

প্রবন্ধ

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ

পরিকল্পনা ও সুপারিশ

মো. মাহবুবুল ইসলাম ১৩২

প্রবন্ধ

পাটখাতের উন্নয়নে নীতি নির্ধারণ

কাওসার রহমান ১৫৪

প্রবন্ধ

নদীভাঙ্গন প্রতিরোধে পাটের ব্যবহার

ম. ইনা মু ল হ ক ১৭৯

প্রবন্ধ

পাট উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব

মো. মু জি বু র র হ মা ন ১৮৪

সাক্ষাৎকার

পাটখাতে নতুন করে সুদিন ফিরে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

[বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘হালখাতা’র এবারের সংখ্যার বিষয় ‘বাংলাদেশে পাটের ভবিষ্যৎ’। ‘হালখাতা’র পক্ষ থেকে গত ১৪.০৮.২০১৬ তারিখ শনিবার বাংলাদেশের পাট-খাতের ওপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে মুখোমুখি হয়েছিলাম প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর। তাঁর জন্ম ১২ জুন ১৯৪৩ সালে সিলেটে। বাবা মৌলানা মুফজ্জল হোসেন, মা ছফিয়া খাতুন। বাবা ছিলেন বিভাগপূর্ব ভারতের আসাম বিধানসভার সদস্য (এমএলএ)। মা ছিলেন পারিবারিক ট্রাস্টের আমৃত্যু সভাপতি। ড. আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ, লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিকস এন্ড পলিটিক্যাল সাইন্স (LSE) থেকে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর এককভাবে লেখা, অন্যদের সঙ্গে যৌথভাবে লেখা এবং সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা মোট ৩৬। দেশি-বিদেশি

জার্নালে প্রকাশিত এবং গবেষণা রিপোর্টসহ প্রবন্ধসংখ্যা ২৫০-এর অধিক। সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করছেন অর্ধবার্ষিক জার্নাল Asia Pacific Journal on Environment and Development-এর।

গভর্নিং কাউন্সিল চেয়ারম্যান, 'ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস', পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দরকষাকষিতে নিয়োজিত বাংলাদেশ টিম-সমন্বয়ক তিনি।

অংশ নেন ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে। পরপর তিনবার নির্বাচিত সভাপতি (২০০২-২০১০), বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ।

প্রাক্তন সিন্ডিকেট সদস্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য; এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কমিটির

কো-চেয়ারম্যান এবং জাতীয় পাট কমিশনের চেয়ারম্যান।

কুয়ালিলামপুরে অবস্থিত এসোসিয়েশন অব ডেভলপমেন্ট রিসার্চ এন্ড ট্রেইনিং ইনস্টিটিউটস অব এশিয়া এন্ড দি প্যাসিফিক (ADIPA) 'র প্রেসিডেন্ট ছিলেন ১৯৭৯-'৮৩ মেয়াদে এবং রোমে অবস্থিত সোসাইটি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট (SID) 'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন ১৯৮৮-'৯১ মেয়াদে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনে কখনো চেয়ারম্যান কখনো সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সময় দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এখনো করছেন।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবায়ু প্যানেল (IPCC)-এর একজন প্রধান প্রণেতা ছিলেন এর তৃতীয় ও চতুর্থ মূল্যায়নে, যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ২০০১ ও ২০০৭ সালে। এই প্যানেল ২০০৭ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায়। তিনি এর অংশীদার। ২০০৯ সালে তাঁকে বাংলাদেশ সরকার একুশে পদকে ভূষিত করে।

মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও ইউনিয়নে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তী সময়ে পারিবারিক সিদ্ধান্তে একটি ট্রাস্ট গঠন করে পারিবারিক সমস্ত জমিজমা দিয়ে বাবার নামে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

হালখাতা

পাটের জেনোম বা জিন-নকশা আবিষ্কার করেছেন বাঙালি বিজ্ঞানীরা, যে বিজ্ঞানীদের প্রধান ছিলেন ড. মাকসুদুল আলম। ওনার মৃত্যুর পর জিন-নকশা আবিষ্কারের পরবর্তী অগ্রগতি আপনার জানামতে কোন পর্যায়ে রয়েছে?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

পাটের জেনোম বা জিন-নকশা আবিষ্কার নিঃসন্দেহে একটি বড় অর্জন। যে অর্জনের কৃতিত্ব একদল বাঙালি বিজ্ঞানীর, যাঁদের প্রধান ছিলেন ড. মাকসুদুল আলম। আমি যতদূর জানি, ওনার মৃত্যুর পর জিন-নকশা আবিষ্কারক বিজ্ঞানীদের যিনি দ্বিতীয় প্রধান হিসেবে ছিলেন তিনিই এখন প্রধান দায়িত্বে আছেন। ওনার নাম ড. মঞ্জুরুল আলম। তাদের কর্মস্থল বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে।

আর অগ্রগতির বিষয়ে যতদূর জানি, আবিষ্কারকৃত জিন-নকশা পেটেন্ট করবার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া এই গবেষণার অর্জন মাঠপর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই এর নানা বাস্তব-প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এসব বিষয়ে অবশ্য বর্তমানে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত এক্ষেত্রে তথ্যপ্রদানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বা কড়াকড়ি থাকতে পারে।

হালখাতা

পাটের জিন-নকশা আবিষ্কারের ফলে এর থেকে কী ধরনের সুফল পাওয়া যাবে বলে আপনি আশা করছেন?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

পাটের জেনোম বা জিন-নকশা আবিষ্কারের ফলে প্রয়োজন অনুসারে পাটের মধ্যে এর জিনকে নানাভাবে স্থাপন করা যাবে। যেমন শুষ্ক মৌসুমে যদি পাটচাষ করতে চাওয়া হয়, পাহাড়ি এলাকায় যদি পাটচাষ করতে চাওয়া হয় কিংবা পাটগাছকে যদি আরো লম্বা ও মোটা আকৃতির করতে চাওয়া হয়— এ সবকিছুই করা সম্ভব হবে প্রয়োজন অনুযায়ী জিন-নকশা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। আমি যতদূর জানি, এতে করে পাটের উৎপাদন যেমন বাড়বে একইভাবে পাটের মানও উন্নত হবে। শুনেছি, পাটের আঁশ এমন উন্নত করা সম্ভব হবে যা দ্বারা উন্নত সুতা তৈরি করা সম্ভব হবে যার পচনশীলতাও থাকবে কম। ফলে সেই সুতা থেকে উন্নতমানের কাপড় তৈরি করা যাবে। তাতে সব মিলিয়ে পাটের ব্যবহার বহুগুণে বেড়ে যাবে।

আসলে পাটের জেনোম বা জিন-নকশা আবিষ্কার-সফলতার মূলকথাই হল এইসব সম্ভাবনা ।

হালখাতা

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের পাটচাষ ও পাটশিল্প সম্পর্কে বলুন ।

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর আদমজী গ্রুপ, ইস্পাহানী গ্রুপ, দাউদ গ্রুপ ও বাওয়ানি গ্রুপ পূর্ব পাকিস্তানের পাটব্যবসার নেতৃত্ব দেয় । এসব গ্রুপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের । তখনই আমাদের পাটচাষ ও পাটজাত পণ্যের প্রসার ঘটে । তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫১ সালে প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয় নারায়ণগঞ্জে যা ঐ বছরের ১২ ডিসেম্বর উৎপাদন শুরু করে, এর মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের এবং সেই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল বাওয়ান গ্রুপ । ১৯৫১ সালের ১২ ডিসেম্বর ৩০০ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল ‘আদমজী’ । যার মালিক ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের আদমজী পরিবারের তিন ভাই; এরা হলেন ওয়াহেদ আদমজী, জাকারিয়া আদমজী, ও গুল মোহাম্মদ আদমজী । তখন প্রতিদিন আদমজীতে গড় উৎপাদন ছিল ১৮৮ টন এবং সে সময়ের মুদ্রায় বছরে গড়ে বৈদেশিক আয় হত প্রায় ৬০ কোটি টাকা ।

১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশে ৭৭টি পাটকল স্থাপিত হয় । এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানে পাটশিল্পের বিকাশ ঘটে, যদিও এসব পাটকলের বেশিরভাগের কর্তৃত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে । ষাটের দশকে বেশ কয়েকজন বাঙালি ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তা দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি পাটকল স্থাপন করেন । এটা ঠিক যে আমাদের এখানকার লোকজনের কর্মসংস্থান ঘটেছিল বাঙালি অবাঙালি মালিকানায় সব পাটকলে, কিন্তু যেহেতু উৎপাদনশক্তির বেশিরভাগ ছিল অবাঙালি মালিকানার পাটকলগুলোতে, তাই এই খাতের লাভের অধিকাংশ চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে । অপরদিকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশ তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হত । তাই পূর্ব পাকিস্তানের পাটের টাকায় ইসলামাবাদ গড়ে উঠেছিল ।

হালখাতা

পাটশিল্প জাতীয়করণের প্রেক্ষাপট নিয়ে বলুন...

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

মনে করা হয়ে থাকে, পূর্ব পাকিস্তানের পাটশিল্প থেকে অর্জিত আয়ের যেহেতু অধিকটাই ব্যয় হত পশ্চিম পাকিস্তানে, তাই সে-অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যেই পাটশিল্প-কে জাতীয়করণের পক্ষে এখানকার সকলের মধ্যে দাবিটি তখন দানা বেঁধেছিল। সে কারণেই ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনি কর্মসূচিতে অন্যান্য বড়-বড় শিল্পের পাশাপাশি পাটশিল্পও জাতীয়করণের দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সেই দাবি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ দীর্ঘকাল বহন করেছিল মনের মধ্যে। ফলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৬ দফারও অন্যতম প্রেরণা হয়ে উঠেছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পখাতের বৈষম্য। আমি বলব, শুধু আওয়ামী লীগ নয় বরং পাটশিল্পের মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শোষণের বিষয়টি ছিল তখনকার বাঙালি প্রতিটি মানুষের মনের কথা, মুখের কথা। বলা যায়, সেই চিন্তারই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার পর “বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার, ১৯৭২ (পিও ২৭)”-এর আওতায় ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের পাটশিল্প জাতীয়করণ করা হয়। তবে অবাঙালি ও বাঙালি মালিকানার সব পাটকলই তখন জাতীয়করণ করা হয়েছিল। কাজেই এই জাতীয়করণের পেছনে শিল্পে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি চিন্তাও ছিল বলে ধরা যায়। এক্ষেত্রে সংবিধানে জাতির আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের একটি স্তম্ভ হিসেবে ‘সমাজতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠা অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি স্মরণ করা যায়। যদিও পরবর্তী সময়ে পুরো বিষয়টি এই শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

হালখাতা

আমরা তো জানি, ৭৫-পরবর্তী সময়ে পাটশিল্প উন্নয়নে তেমন সরকারি আনুকূল্য না থাকলেও আশির দশকের শুরুতে পাট-কারখানাগুলোর উৎপাদন পাকিস্তান আমলের সর্বোচ্চ-রেকর্ড উৎপাদনের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল— জানতে চাচ্ছি, সেটি কিভাবে সম্ভব হয়েছিল?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে ১৯৭৩-’৭৪ মেয়াদে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে পাঁচসালা পরিকল্পনায় না গিয়ে ১৯৭৯-’৮০ মেয়াদে একটি দুইসালা পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পাটশিল্পের পুনর্জাগরণ নিশ্চিত করার কথা

ঐ পরিকল্পনাগুলোতে ছিল। তবে দুঃখজনক হল '৭৫-পরবর্তী সরকারগুলো ১৯৭৯-'৮০ মেয়াদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মোটেও আন্তরিক ছিল না। বরং বেসরকারি খাতকে প্রাধান্য দেয়ার পালা শুরু করা হয় জোরেশোরে। ১৯৭৯-'৮০ মেয়াদি দুইসালা পরিকল্পনায় 'বিএমআরই' (balancing, modernization, and rehabilitation) কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হল না। এই উপেক্ষারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮২-'৮৩ অর্থবছরের রপ্তানি নীতিতে পোশাক, চা, চিংড়ি, চামড়া প্রভৃতি শিল্পের 'বিএমআরই'র জন্য প্ল্যান্ট ও মেশিনারি আমদানির ব্যবস্থা রাখা হলেও পাটকলগুলোর জন্য সেই ব্যবস্থা রাখা হল না। এই ধরনের বাস্তবতা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা উচু মাত্রার থাকায় পাটশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রচেষ্টায় আশির দশকের শুরুতে পাট-কারখানাগুলোর উৎপাদন পাকিস্তান আমলের সর্বোচ্চ-রেকর্ড উৎপাদনের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

হালখাতা

বোঝাই যাচ্ছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত পাট ও পাটশিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি ও সহায়ক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে আমাদের পাটশিল্প উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করত- এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

আগেই বলেছি '৭৫-পরবর্তী সরকারগুলোর এ বিষয়ে সদিচ্ছার ঘাটতি ছিল- যদি সেই ঘাটতি না থাকত, যদি পাট-খাত সংক্রান্ত আরও প্রয়োজনীয় নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সার্বিক অর্থে দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রমূলক বিষয়কে মোকাবেলা করা সম্ভব হত, তাহলে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের পাটশিল্প আরও শক্ত অবস্থানে থাকত। পরিবেশসম্মত হওয়ায় যথাযথ বাজারজাত ও প্রমোশনের মাধ্যমে পাটের চাহিদাও বাড়ানো যেত।

হালখাতা

প্রাসঙ্গিক কারণে প্রশ্ন এসে যায়, তাহলে পাটখাত যে তার ঐশ্বর্য নিয়ে পুরনো ঐতিহ্যে বহাল থাকল না- পাটখাত ধ্বংসের সে-সব কারণসমূহ কী- খানিকটা বিস্তৃত পরিসরে জানতে চাই...

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

১৯৮০'র দশকের শুরুর কিছুটা পরের দিকে বাংলাদেশের পাটখাতে আক্ষরিক অর্থেই ধ্বংস-প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। ১৯৮২-'৮৫'র মধ্যে বিশ্বব্যাংকের Structural

Adjustment Programme (SAP) বা কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি'র আওতায় রাষ্ট্রীয় ৩৪টি পাটকল বিরাস্ত্রীয়করণ করে বাংলাদেশী অনভিজ্ঞ মালিকদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। ১৯৮৩-’৮৪’র মধ্যেই রাষ্ট্রীয়ত্ত ও ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকলের উৎপাদন ও রপ্তানি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নিচের দিকে নেমে আসে। এছাড়া, ঐ সময়ে পাটের বিকল্প সিহুেটিকের প্রসার ঘটতে থাকে। এর ফলে আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের পাটপণ্যের বাজারও পড়ে যেতে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারের এই নিম্নগতি একসময় চরম আকার ধারণ করে— এর ফলে চাকরি হারিয়ে দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ।

নিজেদের যে-সব ব্যর্থতার কারণে পাটখাতে বিপর্যয় নেমে আসে, সেই ব্যর্থতা ঢাকতে ১৯৯৩ সালে তৎকালীন সরকার বিশ্ববাজারের মন্দা ভাবকে কারণ দেখিয়ে আরেক দফা পাটকল বন্ধের চেষ্টা চালায়, যার পরামর্শক ও সহায়ক শক্তি হিসেবে এগিয়ে এসেছিল বিশ্বব্যাংক। Jute Sector Adjustment Programme (JSAP) নামক আরেক কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৩-’৯৪ থেকে শুরু করে তিন বছর মেয়াদি Jute Sector Reform নামে একটি Programme ঘোষণা করা হয়— যার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালে Jute Sector Adjustment Credit-এর আওতায় বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের চুক্তি হয়। এই চুক্তির আওতায় আরও বেশকিছু পাটকল বন্ধ, চালু পাটকল থেকে শ্রমিকছাঁটাই, মজুরিহাস ইত্যাদি কার্যাদি সম্পন্ন হয়। এভাবে বেশ অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের পাটখাতে একটা কঠিন বিপর্যয় নেমে এল। হঠাৎ করেই একদিন বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি বন্ধ করে দেয়া হল।

আসলে আমি মনে করি, বিশ্বব্যাংক-এর একটা কিছু পেলেই নির্বিচারে গ্রহণ করতে হবে— এমনটি সঠিক নয়। বরং বিচার-বিবেচনা করে দেশের মানুষের জন্য কল্যাণকর এমন বিষয়কেই গ্রহণ করা উচিত। আমাদের পাটখাতে ঐ সময় বিশ্বব্যাংকের সবকিছুই ঢালাওভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, যার নেতিবাচক ফলই আজ ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান।

হালখাতা

‘আদমজী’ পাটকল ছিল বিজেএমসি’র প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই পাটকল আদমজী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে কী-কী কারণ ছিল বলে আপনি মনে করেন?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

এত বড় পরিসরের একটা মিল বন্ধ হওয়ার আগে যে-ধরনের প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়া গ্রহণ করা দরকার ছিল, সেটা আদমজী বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে করা হয়নি। দেখা গেল, হঠাৎ করেই মিলটি বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্য অনেকদিন ধরেই বেশ কিছু তীব্র সংকট আদমজীতে বিরাজ করছিল— যেমন, এখানকার যন্ত্রপাতি-মেশিনপত্র বেশ পুরনো হয়ে গিয়েছিল, অনেকগুলো ট্রেড ইউনিয়ন ছিল যেগুলো প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের পক্ষে কাজ না-করে অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি করে কাজের পরিবেশ নষ্ট করে দিয়েছিল, স্থূল রাজনৈতিক স্বার্থে শ্রমিকদের ব্যবহার করা হত, এছাড়া পাটক্রয়ে অনিয়ম, মেশিনারি অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অপচয়, পাটপণ্য বিক্রয়ে আমলাতান্ত্রিকতাসহ দীর্ঘদিন ধরে আরও বহুরকম অবহেলা-ভুল নীতির কারণে আদমজীর উৎপাদন ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল। ১৯৭২-’৭৩-এ উল্লেখযোগ্য লোকসান ছিল এবং সেটি বেড়ে ১৯৮১-’৮২-তে এসে প্রায় ৩২৬ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিল। এই লোকসান আশান্বিতরূপে কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। এসব কারণে বিশ্বব্যাংক এবং আরও কিছু দেশ বারবার চাপ দিচ্ছিল মিলটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কোনোরকম পর্যালোচনা ছাড়াই আদমজী বন্ধ করে দেয়। সরকার ভাবল না, বিশ্বের এই সর্ববৃহৎ পাটকলের প্রত্যক্ষ লোকসানের তুলনায় এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যৌথ লাভালাভ বহুগুণে বেশি। প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের বাইরেও লক্ষ লক্ষ মানুষ আদমজী’র ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করত— তারা এই মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর জীবিকা হারিয়ে বেকার-অসহায় ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। আদমজীতে কর্মরতদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার অতুলনীয় ক্ষতি হয়। আমি মনে করি, শুধু আদমজী কেন অন্য যে-কোনো মিল বন্ধ হওয়ার আগে পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা হওয়া দরকার, যা আদমজী’র ক্ষেত্রে আরও বেশি জরুরি ছিল।

হালখাতা

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করছেন বাংলাদেশে আবারও পাটের সেই হারানো সুদিন ফিরে আসছে। এবিষয়ে আপনি কী ভাবছেন...

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

আমাদের বিজ্ঞানীরা পাটের জেনোম আবিষ্কার করেছেন— এতে করে পাটের গুণগত ও পরিমাণগত উৎকর্ষ ঘটানো সম্ভব হবে। এটি আমাদের সামনে এক বিশাল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। তাছাড়া আজকাল পরিবেশবান্ধব হিসেবে পাটপণ্য ব্যবহারের পক্ষে এক ধরনের ইতিবাচক মত তৈরি হয়েছে। এই দুই

কারণেই বাংলাদেশে পাটের একটি ভালো ধরনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে, পাট উৎপাদন থেকে শুরু করে এর প্রচলিত ও নতুন ব্যবহার সম্প্রসারণে দেশের অভ্যন্তরে এবং বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে অনেক কাজ করতে হবে।

হালখাতা

এই জেনোম আবিষ্কারের সংবাদ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে মানুষ তখন জেনেছিল কিন্তু তারপরে এতবড় আবিষ্কারের আর কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না- আপনি কি বলবেন, জেনোম আবিষ্কারের পরে বর্তমানে সেটা কোন্ ধাপে রয়েছে?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

যতদূর জানি, জেনম আবিষ্কারের পর এটি পেটেন্ট করবার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এবং এর প্রায়োগিক নানা দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। যে-কোনো আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই কিছু সতর্কতা, কিছু গোপনীয়তাও অবলম্বন করতে হয়- সে কারণেই হয়তো পাটের জেনোম আবিষ্কারের পরবর্তী ধাপ সম্পর্কে মিডিয়ায় সংবাদ তেমন আসছে না। নির্দিষ্ট সময়কাল বাদে নিশ্চয়ই মিডিয়ায় এর সংবাদ পাওয়া যাবে।

হালখাতা

মনে হচ্ছে, বর্তমান সরকার পাট-খাতের প্রতি খানিকটা আন্তরিক, সেদিক থেকে বাংলাদেশের পাটশিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

সরকারের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল বন্ধ পাটকলগুলো চালু করার এবং বেসরকারি-খাতে লিজ দেয়া পাটকলগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনার। সেই প্রতিশ্রুতির কিছুটা পূরণ করা হয়েছে। যেমন, খালিশপুর জুট মিলস (সাবেক পিপল্‌স জুট মিলস) কাজী ফার্মস-এর কাছে লিজ দেয়া ছিল- সেই লিজ বাতিল করে ফেরত নেয়া হয়েছে। জাতীয় জুট মিল্‌স (সাবেক কওয়ামী জুট মিল্‌স) নতুনভাবে নতুন নামে চালু করা হয়েছে। নেচার ব্যাগ গ্রুপ-এর কাছে চট্টগ্রামের এম.এম. ও আর.আর. এবং সাদমুসা গ্রুপের কাছে কর্ণফুলী ও ফোরাত-কর্ণফুলী, দৌলতপুর পাটকলসহ আরও কিছু মিল বেসরকারি মালিকানার লিজ বাতিল করে সরকারি মালিকানায় নেয়া হয়েছে। এছাড়াও বন্ধ-থাকা আরও কয়েকটি মিল চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে পাটশিল্পে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে

পরিবেশের জন্য হুমকিমূলক ব্যবহার্য দ্রব্যাদির বিপরীতে পাটজাত দ্রব্যের প্রতি মানুষের ইতিবাচক মত তৈরি হচ্ছে। ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাটের তৈরি জিনিসের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেদিক থেকে বলা যায়, বাংলাদেশেও আইন রয়েছে— তবে তার বাস্তবায়নে অগ্রগতি এখনও পর্যন্ত সামান্যই। সারা বিশ্বে সিস্তেটিকের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হচ্ছে; সুতরাং পাটের ব্যবহার নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আবার আসতে পারে এমন স্বপ্ন দেখা অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। তবে পাটচাষ থেকে শুরু করে পাটের বাজারজাতকরণ, পাটজাত দ্রব্যের মানসম্পন্ন উৎপাদন এবং এগুলোর আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ, পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ- ইত্যাদি বিষয়ে আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া দেশে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধিও একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

হালখাতা

পাট তো আমাদের কেবল অর্থনীতি নয়, সংস্কৃতিরও বড় অংশ— এ বিষয়ে কিছু বলুন...

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

পাট আমাদের জীবন-যাপনের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে। এর এমন কোনো দিক নেই যা আমাদের কাজে আসে না। পাটের আঁশ, পাটশাক ও পাটখড়ি— এসবই আমাদের গ্রামীণ জীবনের প্রতিদিনের ব্যবহার্য জিনিস। সবুজ পাটক্ষেতের সৌন্দর্য কার না মনে আনন্দ দেয়! পাটের নানা অনুষ্ঙ্গ ও সৌন্দর্য নিয়ে রচিত হয়েছে বহু গান ও কবিতা। আর অর্থনীতি তো সংস্কৃতির বাইরের কিছু নয়— আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি এখনো অনেকটাই পাটনির্ভর। পাট বিক্রির অর্থেই পাটচাষিরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ত্রয় করে, ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেয়, ধর্মীয় উৎসব করে। পাটচাষ থেকে পাটের বাজারজাতকরণ, পাটের দ্রব্যাদি তৈরি ও বিক্রি এবং পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রফতানি ইত্যাদি পর্যায়ে অসংখ্য লোক কাজে নিয়োজিত। পাটকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবনযাপনের অধিকটা আবর্তিত হয়। সুতরাং বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে পাটের যে নিবিড় সম্পর্ক সেটা অনুধাবন করে এই ‘পাট’ বিষয়টিকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে, এবং সে কাজটি করতে হবে প্রধানত সরকারকেই যদিও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদেরও যথেষ্ট দায়দায়িত্ব রয়েছে।

হালখাতা

আপনার ব্যস্ততম সময়ের মধ্যেও ‘হালখাতা’-কে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ।

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

‘হালখাতা’র উদ্যোক্তাদেরকেও আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ, বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট-এর ওপর একটি বিশেষ সংখ্যা করার জন্য । আমার ধারণা, শ্রমলব্ধ এই সংখ্যাটি থেকে লেখক-পাঠক-গবেষক অনেকেই উপকৃত হবেন ।

প্রবন্ধ

পাটশিল্প, পাটচাষ ও পাটবাণিজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার পথে

বদরুদ্দীন উমর

পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলাকে শ্মশান করার পাকিস্তানি চক্রান্তের অংশ হিসেবে এই অঞ্চলের পাটশিল্প ও পাটবাণিজ্য থেকে বিপুল মুনাফা পশ্চিম-পাকিস্তানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে আওয়ামী লীগ ‘পূর্ববাংলা শ্মশান কেন?’ নামে একটি পোস্টার ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল । কিন্তু তারা নিজেরা ১৯৭২ সালে ক্ষমতায় বসার পর থেকে যেভাবে লুটপাটের মাধ্যমে পাটশিল্প ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই বাংলাদেশের পাটশিল্প ও সেইসঙ্গে পাটচাষ ও পাটবাণিজ্য আজ এসে দাঁড়িয়েছে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি । যেসব কারণে এভাবে পাটশিল্প, পাটচাষ ও পাটবাণিজ্যের এই পরিণতি হতে চলেছে সে কারণগুলো খুব সচেতনভাবেই ১৯৭২-৭৩ সাল থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছিল ।

জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য সমাজতন্ত্রের ধূয়া তুলে সব শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ করে আওয়ামী লীগের নেতারা তাদের আত্মীয়-স্বজন ও দলীয় সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে যে লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন তার বিবরণ খুব পরিচিত। এই লুটপাটের ফলে একদিকে যেমন তারা পাহাড়সমান ভূসম্পদের মালিক হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে, তারা খুব সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের ‘অকার্যকারিতা’ প্রমাণ করতেও সক্ষম হয়েছিল। এই দুর্বৃত্তগিরির পরিণতিতেই শেখ মুজিবের সুযোগ্য উত্তরসূরি জিয়াউর রহমানের আমলে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কলকারখানাগুলো ব্যক্তিগত খাতে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হয়। পানির দামে এবং সহজতম শর্তে এগুলো কিনে নেয় সদ্য ধনী হওয়া দুর্নীতিবাজরা। তাদের এভাবে কলকারখানা কেনার উদ্দেশ্যে শিল্প গঠন ছিল না। এ ক্ষেত্রেও ছিল লুটপাটের সেই একই প্রক্রিয়া। মিলকারখানার জমি এবং অন্যান্য সম্পদ বিক্রি করে দিয়ে, শ্রমিকদের পাওনা টাকাকড়ি না দিয়ে তাদের পথে বসিয়ে, শেষ পর্যন্ত তারা একের পর এক কারখানা বন্ধ করে পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলায় যে শিল্প গঠিত হয়েছিল সেগুলো ধ্বংস করার অপকর্ম সহজেই সাধন করে। ১৯৭২ সাল থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত একের পর এক ‘দেশপ্রেমিক’ ও ‘জাতীয় স্বার্থ রক্ষাকারী’ সরকার অভিন্ন নীতির ওপর দাঁড়িয়ে শিল্পক্ষেত্রে যে পরিণতি ডেকে এনেছে পাটশিল্প তার সব থেকে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। পাকিস্তান আমলে ৭৭টি পাটকল থাকলেও এবং তাদের প্রত্যেকটি নিয়মিতভাবে মুনাফা করে যাওয়া সত্ত্বেও দ্রুত সেগুলো বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশনের অধীনে পাটকলের সংখ্যা এখন ২২। এছাড়া ব্যক্তিগত খাতে যে ৩৮টি পাটকল আছে তার মধ্যে মাত্র ৫/৬টি ছাড়া বাকি সবগুলোর অস্তিত্ব নামমাত্র। ৭৭টির মধ্যে আদমজি পাটকলসহ অন্য পাটকলগুলো সবই ধ্বংস হয়ে গেছে।

১৯ জুন পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের একটি বৈঠকে অন্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয় যে, পাটশিল্প কারখানাগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ পাটের মৌসুমে সময়মতো কারখানাগুলোকে পাট কেনার জন্য টাকা না দেয়া। জুলাই মাস থেকে পাট কেনার মৌসুম শুরু হলেও নভেম্বরের আগে এই বাবদ টাকা দেয়া হয় না। তার ফলে পাটের অভাবে মিল পূর্ণমাত্রায় কাজ করতে পারে না এবং মিলগুলোকে পরে অনেক বেশি দাম দিয়ে পাট কিনতে হওয়ায় উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধি হয়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই মিলগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এজন্য তাদের বৈঠকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে ৬০০ কোটি টাকা যথাশিগগির বরাদ্দের দাবি জানানো হয়, যাতে মিলগুলো সময়মতো পাট কিনতে পারে এবং শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা, যা এখন দাঁড়িয়েছে মোট ১১৩ কোটি টাকার মতো, পরিশোধের ব্যবস্থা হতে পারে (নিউ এজ, ২০.০৬.২০০৭)।

এখানে পাটের মৌসুমে সময়মতো পাট কেনার জন্য পাটকলগুলোকে টাকা না দেয়ার যে কথা বলা হয়েছে, এটা নতুন কোনো কথা নয়। ১৯৭২-৭৩ সাল থেকেই এর শুরু। এ ব্যাপারে ১৯৭৩ সালে জুট কর্পোরেশনের একটি সার্কুলারের উল্লেখ করে আমি সে সময়ে লিখেছিলাম। সরকার যে তখন পাটকলগুলোকে পাটের মৌসুমে পাট কেনার জন্য টাকা দেয়নি তাই নয়, তাদের হাতে যে টাকা ছিল সেটা দিয়েও পাট কিনতে এই সার্কুলারের মাধ্যমে নিষেধ করা হয়েছিল। এর ফলে পাটকলগুলো পাটের মৌসুমেই পুরোমাত্রায় কাজ করতে পারেনি। পাটের অভাবে প্রায় অচল অবস্থা সৃষ্টি হলে শেষপর্যন্ত পাট কেনার অনুমতি ও তার জন্য কিছু টাকা দেয়া হয়। কিন্তু পাটের দাম তখন দাঁড়িয়েছে দ্বিগুণের বেশি। এই পাট কারখানাগুলোকে কিনতে হয়েছিল বিভিন্ন ফড়িয়া পাটব্যবসায়ীদের থেকে। এক্ষেত্রে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার যা করেছিল তা হল এক মারাত্মক ক্রিমিনাল কাজ। তারা সরকারি পাটকলগুলোকে মৌসুমের শুরুতে নিজেদের সারা বছরের প্রয়োজনমতো পাট কিনতে সার্কুলার দিয়ে নিষেধ করলেও একইসঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক থেকে ফড়িয়া ব্যবসায়ীদের ঋণ দিয়েছিল মৌসুমের শুরুতে পাট কেনার জন্য। এই পাটব্যবসায়ীরা ছিল প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের লোক অথবা তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এরা অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে চড়া দামে পাটকলগুলোতে পাট বিক্রি করে বিশাল অঙ্কের মুনাফা করেছিল। এভাবে সবরকম শিল্পসহ পাটশিল্প ধ্বংস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৭২ সাল থেকে শুরু হয়েছিল, সেটা এখনো অব্যাহত আছে। বিভিন্ন সরকার এ ভাবে নীতিগতভাবে ও নিয়মিতভাবে পাটশিল্প ধ্বংসের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাওয়া সত্ত্বেও এরা সবাই পাটশিল্পের ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ হিসেবে শ্রমিকদের দায়ী করে এসেছে। আদমজি কারখানা বন্ধের সময়েও তারা

একই কথা বলেছিল। অথচ এই শ্রমিকরা পুরো মজুরি না পেয়ে এবং সময়মতো মজুরি না পেয়েও বরাবরই কলকারখানায় নিজেদের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গেই করে এসেছেন।

পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের উপরোক্ত বৈঠকের পর এই মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, পাটশিল্পের রূপগণতা আলোচনার সময় দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো কারণের উল্লেখ করা হয় না। তিনি বলেন, এর অন্য কারণগুলো হল টাকা না দেয়া এবং বিদ্যুৎঘাটতি (নিউ এজ, ২০.০৬.২০০৭)।

এর মধ্যে চক্রান্তমূলকভাবে সময়মতো কারখানাগুলোকে টাকা না দেয়া পাটশিল্পকে কিভাবে ও কত বড় আকারে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেটা আগেই বলা হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে দলবাজি অর্থাৎ ইউনিয়ন নেতাদের সুবিধামতো ব্যবহার যে সরকারি দলগুলোই ক্ষমতায় থাকার সময়ে সব থেকে বেশি করে থাকে এটা এক

অখণ্ডযোগ্য সত্য। আর বিদ্যুৎঘাটতির দায়দায়িত্ব যে সম্পূর্ণভাবে সরকারের এ নিয়ে তো বিতর্কের কিছু নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারই ধারাবাহিকভাবে পাটসহ সব শিল্প ধ্বংস করার এক চক্রান্ত ১৯৭২ সাল থেকে নিয়মিতভাবে কার্যকর করে আসছে। শিল্প জাতীয়করণ এবং শিল্প বিরোধীকরণ দুই অবস্থাতেই শিল্প ধ্বংসের এক এবং অভিন্ন চক্রান্ত লুটপাটকারীদের স্বার্থেই কার্যকর করে আনা হয়েছে। পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের উপরোক্ত বৈঠকের পর তারা বলেছেন, তাঁদের মন্ত্রণালয়কে ৬০০ কোটি টাকা দিলে আগামী ৪ বছরের মধ্যে এ দেশের পাটশিল্পকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে লাভজনক করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমান অর্থ উপদেষ্টা ইতিমধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় খাতে পাটশিল্পকে সচল ও লাভজনক করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, যারা এই শিল্পকে রাষ্ট্রীয় খাতে রাখার পক্ষে তাদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। তাহলে এখন উপায় কী? পাটশিল্পকে কি ব্যক্তিগত খাতে পুরোপুরি ছেড়ে দেয়া হবে? এভাবে ছেড়ে দিলে তার পরিণতি কী হয় এটা কি তাদের জানা নেই? ৭৭টি পাটকলের মধ্যে ২২টি বাদে সবই তো ব্যক্তিগত খাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেগুলোর কী অবস্থা? সেগুলো কি সচল আছে? তাদের দ্বারা পাটশিল্প চাঙ্গা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে? এটা যে নেই একথা যে কোনো সৎ ব্যক্তিই স্বীকার করতে বাধ্য, অন্তত বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে এ বিষয়ে দ্বিতীয় চিন্তা একেবারেই অর্থহীন। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে কি বাংলাদেশে পাটশিল্প বলে আর কিছু থাকার প্রয়োজন নেই? এর থেকে বিপজ্জনক চিন্তা বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে আর কী হতে পারে?

এক্ষেত্রে সরকারের আর এক অদ্ভুত বক্তব্য হল, পাট কৃষিভিত্তিক নয়। ব্রিটিশ আমলে তো পাটের ওপর ভিত্তি করেই পাটশিল্প কারখানাগুলো কলকাতার আশপাশে গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া পাটই তো হল পাটশিল্পের প্রধান কাঁচামাল, বলা চলে একমাত্র কাঁচামাল। এ ক্ষেত্রে এই শিল্পকে কৃষিভিত্তিক না বলার উদ্দেশ্য সরল বুদ্ধিতে বোঝা মুশকিল। পাটশিল্প সম্পর্কে এ কথা বলা হলে চিনিশিল্পের ক্ষেত্রেও সরকারের নিশ্চয়ই এই একই বক্তব্য।

বাংলাদেশের পাটের গুণগত মান বিশ্বের যে কোনো দেশে উৎপাদিত পাটের থেকে অনেক উন্নত। কোটি কোটি লোক এই পাট উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত। পাটকল ধ্বংস হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে তারাও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছেন। এখন পাটশিল্পকে যদি কৃষিভিত্তিক শিল্প না বলে উড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হয় তাহলে কৃষকদের অবস্থা কী দাঁড়াবে এটা বোঝার কি কোনো অসুবিধা আছে? বাংলাদেশে বেসরকারি গার্মেন্টস শিল্প-কারখানা সহ অন্য শিল্পমালিকরাই যে শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে,

মাসের পর মাস মজুরি না দিয়ে, শ্রমিকদের জীবন অতিষ্ঠ করছে তাই নয়। এ কাজ সরকার নিজেও করছে। কাজেই সরকারি ও বেসরকারি মালিকদের আক্রমণের মুখে আজ বাংলাদেশের শ্রমিকদের জীবন বিপর্যস্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা শিল্প-কারখানাগুলোকে সচল রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে গার্মেন্টস কারখানাগুলোর মতো পাটকলগুলোতেও শ্রমিক বিক্ষোভ, শ্রমিক ধর্মঘট হচ্ছে। সম্প্রতি খুলনার শ্রমিক অঞ্চলে এটা বেশ বড় আকারেই দেখা গেছে। পাট মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ীই ২২টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কারখানাতে শ্রমিকদের পাওনা হয়েছে ৬৫ কোটি টাকা, অথচ এ বছরের বিশাল বাজেটে শ্রমিকদের এই চলতি পাওনা ছাড়াও অন্যান্য বাবদ ২২টি পাটকল শ্রমিকদের আরো যে পাওনা আছে তার পরিমাণ হল ১১৩ কোটি টাকা। সরকার যদি এসব পরিশোধের জন্য কোনো বরাদ্দ বাজেটে না রাখে, তাহলে ব্যক্তিগত খাতের দুর্নীতিবাজ ও প্রতারক অনেক মালিকের মতো সরকারও কি শ্রমিকদের এই ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার চিন্তা করছে?

ব্যক্তিগত খাতে পাটকলগুলো হস্তান্তর করলে কি তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে? এই প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, কিছু লোক নামমাত্র দামে এই শিল্পকারখানাগুলো কেনার জন্য তৈরি আছে এবং তাদের উদ্দেশ্য হল এই কারখানাগুলোর বিপুল পরিমাণ জমি দখল করা। কাজেই তাদের ব্যবস্থাপনায় কারখানাগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা নেই। এই সম্ভাব্য ক্রেতারা যে চরম ও বিপজ্জনক দুর্নীতিবাজ এ বিষয়ে সন্দেহের কি কোনো সুযোগ আছে?

উৎস: প্রথম প্রকাশ: দৈনিক আমার দেশ, ২৩ জুলাই, ২০০৭ এবং দ্বিতীয় প্রকাশ: অমিতা চক্রবর্তী, ফারজানা শম্পা, নাসরিন সিরাজ ও আনু মুহাম্মদ সম্পাদিত 'পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ও বিবৃতি সংকলন ২০০৭'।

[লেখক: সমাজবাদী রাজনীতিক ও চিন্তাবিদ।]

পাটশিল্প বিনাশের দায় কার?

আ নু মু হা ম্ম দ

তখন খুলনায় পিপলস জুট মিলে সম্ভবত শেষ সাইরেন বাজা শুরু হয়েছে (৩১ জুলাই ২০০৭ রাত ১২ টা)। এই সাইরেন একঘণ্টা ধরে বেজে সবাইকে জানান দেবে, কয়েক দশকের এই কারখানা মৃত্যুবরণ করল। এই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, কয়েক দশকের সরকারি নীতিমালা পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝব, চিকিৎসার নামে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। একই দিনে বন্ধ হল চট্টগ্রামের কর্ণফুলী জুট মিল। খুলনার আরো তিনটি মিল ছাড়াও বহুদিন ধরে একইভাবে মৃত্যুঘোষণার অপেক্ষায় ছিল আরেকটি বৃহৎ পাটকল। সিরাজগঞ্জের কওমী জুট মিল। শুনলাম প্রশাসনের লোকজন কোনো সাড়াশব্দ না করে সেখানেও নোটিশ লাগিয়ে দিয়ে গেছে। সিরাজগঞ্জে এখন বন্যা। শহরেও এখন নৌকা চলছে। মানুষের জন্য এই কঠিন সময়টাই মিল বন্ধ করার জন্য প্রশাসন নিরাপদ হিসেবে বিবেচনা করেছে। বন্যার পানি যাদের তছনছ জীবন আরো বিপর্যস্ত করে তুলেছে তারা এখন মূক ও বধির। বলার আর কী থাকতে পারে? অন্যান্য পাটকলের মতো কওমী জুট মিলও শহর ঘিরে বহুদূর পর্যন্ত জীবন-জীবিকা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, লেখাপড়া ইত্যাদির প্রাণ। যত মানুষ এসব মিলে কাজ করেন তার কয়েক গুণ বেশি মানুষ মিলকে ঘিরে নানা কর্মকণ্ঠপরতাপয় যুক্ত। এর বিস্তৃতি গ্রামের লাখ লাখ পাট উৎপাদক আর নানা পেশাজীবী পর্যন্ত ছড়ানো। লেখাপড়া-চিকিৎসাও এর সঙ্গে জড়িত। পাটশিল্পের ওপর আক্রমণের মধ্য দিয়ে কত লাখ শিশু কিশোর-কিশোরীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল, জীবনের সব সম্ভাবনা চুরমার হয়ে গেল তার হিসাব আমার কাছে নেই।

যাদের শরীর-মন পাটকলে নানা যন্ত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য তাদের যন্ত্রণা বোঝার কী সাধ্য উৎপাদন থেকে বহুদূর অবস্থানকারী আয়েশি জীবনের দায়বোধহীন নীতিনির্ধারকদের? যারা উৎপাদন করেন সেটা শিল্পে হোক কিংবা হোক কৃষিতে তাদের যন্ত্রণা কেবল বুঝতে পারবেন সৃজনশীল মানুষ। এটা সৃষ্টি, এটা নতুন নির্মাণ। সেজন্য পাটকল থেকে যে দক্ষ শ্রমিকদের ছুড়ে ফেলা হচ্ছে তাদের কষ্ট শুধু জীবিকা হারানোর নয়, এই কষ্ট তার যে সৃজনশীল জগৎ তা থেকে তাকে ছুড়ে

ফেলার কষ্ট । বিশ্বাস না হলে যে কেউ গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলুন দেখবেন তারা তাদের উৎপাদনের সময়ের, মেশিনের কিংবা পাট নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কী রকম উচ্ছল হয়ে ওঠেন । যতটা না নিজের আর্থিক কষ্ট তার চেয়ে প্রাণের কষ্ট অনেক বেশি । যতটা না দারিদ্র্যের ভয় তার থেকে বেশি এই স্বজন হারানোর অসম্ভব মানসিক চাপ । আদমজী থেকে পিপলস, পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিকের যে কান্না তার মধ্যে এই সবকিছু মিলে-মিশে থাকে । আর থাকে অক্ষমের ক্রোধ । ক্রোধ কান্না হয়ে গলে গলে পড়ে । নীতিনির্ধারকরা বলবেন, কিন্তু তাতে আমরা কী করব? আমরা তো লোকসান দিয়ে তাদের সৃষ্টির আনন্দ ভোগের আয়োজন করতে পারি না । কান্না দেখে তা আমরা ‘র্যাশনাল’ সিদ্ধান্ত থেকে সরে যেতে পারি না । নিশ্চয়ই । কিন্তু প্রচলিত যান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রের চোখ দিয়েও যদি দেখি, এই যাদের কলকারখানা থেকে ছুড়ে ছুড়ে রাস্তায় ফেলা হচ্ছে তারা এক এক জন বাহুল্য ব্যক্তি নন, তারা প্রত্যেক দক্ষ জনশক্তি হিসেবে এক একটি ক্যাপিটাল, দীর্ঘদিনে জনগণের অর্থসম্পদ দিয়ে তাদের তৈরি করা হয়েছে । তাদের দক্ষতা, মেধা চট করে প্রতিস্থাপন করা যায় না । এ রকম সম্পদ তারাই নির্মম অবহেলায় ছুড়ে ফেলতে পারে যারা বিশ্বাস করে কিংবা আকাজক্ষা করে এদেশ পাটশিল্পের জায়গা নয়, এদেশ উৎপাদনের জায়গা নয় । তাদের কাছে পাটশিল্প এখানে বাহুল্য বোঝা, এর যত শিগগির বিনাশ হয় তত মঙ্গল । আর যে ‘র্যাশনাল’ সিদ্ধান্ত নিয়ে পাটকলগুলো বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে তার যাত্রাপথ দেখলে আমরা বুঝব কীভাবে তা উন্নয়নের নামে ধ্বংসের রোডম্যাপ!

এদেশে পাটশিল্প গড়ে উঠেছিল তার তুলনামূলক সুবিধার কথা বিবেচনা করেই । বর্তমানে বিশ্ববাজার ও পরিবেশ-অনুকূল শিল্পায়নের তাগিদ বিবেচনা করলে বলতে হবে পাটশিল্পের তুলনামূলক সুবিধা বাংলাদেশে অনেক বেড়েছে । সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের পাট এখানেই উৎপাদন হয় । ৫০ দশকে এই পাট কেন্দ্র করেই এই পাটশিল্প গড়ে উঠেছিল । তার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি । গড়ে ওঠে দক্ষ জনশক্তি । এই শিল্প রাষ্ট্রীয় যেসব আনুকূল্য পেয়ে আসছিল, ১৯৭২-এ রাষ্ট্রীয়ত্ত করার পর থেকে তা ক্রমে কমতে থাকে । এক পর্যায়ে এই রাষ্ট্রীয়ত্ত করার পর থেকে তা ক্রমে কমতে থাকে । এক পর্যায়ে এই রাষ্ট্রীয়ত্ত শিল্প রাষ্ট্রীয় বৈরিতা ও লুপ্তনপ্রক্রিয়ার শিকারে পরিণত হয় । এর কারণে এই শিল্প যখন নানা সংকটে ঝুঁকছে তখনই ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক ১৫০০ কোটি টাকার ঋণ নিয়ে এগিয়ে আসে এই খাতের উন্নয়নের জন্য । সেটাই এই খাতের মৃত্যুঘণ্টা বাজায় । বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী কোনো খাতে সাহায্য করেছে আর সেই খাতের টেকসই উৎপাদনশীল বিকাশ হয়েছে এর কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন ।

এই ঋণের টাকা দেয়া হয় পাটশিল্পে সংকট দূর করার নামে। এই ঋণের টাকার বহু দেশি-বিদেশি কনসালট্যান্টের পকেট ভারি হয়, বহু নেতার বিদেশ সফর হয়, বহু প্রকল্প তৈরি হয় কিন্তু কর্মসংস্থান সবই কমতে থাকে। কিন্তু লোকসানও বাড়তে থাকে। নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে বলি। ১৯৮০-৮১ সালে কর্মযোগ্য লুমের সংখ্যা ছিল ২৫৭৯১, এর মধ্যে চালু লুমের সংখ্যা ছিল ২৩৭৫৯। বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে চুক্তির সময়ে এগুলো ছিল যথাক্রমে ২৬০৪৭ ও ১৯৬৯১। চুক্তি অনুযায়ী বেসরকারিকরণ, মিল বন্ধ আর শ্রমিক ছাঁটাই হয় এই যুক্তিতে যে এতে উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা আর কর্মসংস্থান বাড়বে। চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার ২০০৫ সাল নাগাদ দেখা যায় কর্মযোগ্য লুমের সংখ্যা কমে হয়েছে ২১৩৩২ আর চালু লুমের প্রায় সংখ্যা হয়ে গেছে অর্ধেক, ৮৯১৫। এর মধ্যে কর্মসংস্থানও অর্ধেক হয়ে গেছে। এই সময়কালে ভারতে পাটশিল্পের নবজাগরণ এসেছে, সেখানে আগামী ২০১০ সালের মধ্যে তারা রফতানি ৫ গুণ বাড়াতে যাচ্ছে। আর বাংলাদেশে ওই চুক্তিকালে জিডিপির শতকরা ৯.৮ ভাগ ছিল পাটজাত দ্রব্যের রফতানি, সেখানে ২০০৬ সালে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪ ভাগের একটু বেশি। এটা তো পরিষ্কার দেখাচ্ছে যে, কীভাবে আটঘাট বেঁধে পাটকলগুলোর প্রাণশক্তির বিনাশ ঘটানো হল। এই উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাবক আর বাস্তবায়নকারীদের এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে না?

পাটকলগুলোতে লোকসানের কথা বলা বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী ও বিভিন্ন সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একটি প্রিয় বিষয়। এর জন্য তারা দায়ী করেন শ্রমিকদের এবং তা দিয়ে শ্রমিকছাঁটাই যুক্তিযুক্ত করেন। সহজ বুদ্ধিতে আমরা জানি এরচেয়ে বড় ভ্রান্তি আর কিছু নেই। পাট মন্ত্রণালয়ের সমীক্ষাও ভিন্ন কথা বলে। এই সমীক্ষায় দেখা যায়, পাটশিল্পে লোকসানের একক বৃহত্তম কারণ পাট কেনায় বিলম্বিত বরাদ্দ। বছরের পর বছর এই কাজটি করে মন্ত্রণালয় আর বিজেএমসির কর্মকর্তারা সুবিধা নিয়েছেন। সরকার পরিবর্তন হয়েছে এই ধারার পরিবর্তন হয়নি। এর পর আছে বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি। এই ঘাটতি মোকাবেলার জন্য জেনারেটরের কোনো ব্যবস্থাও করা হয়নি। ফলে উৎপাদন নষ্ট হয়েছে। শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে লোকসান এখানে দেখানো হয়েছে শতকরা ৭ ভাগ। বাকি পুরোটাই দায় নীতিনির্ধারকদের, ক্ষমতাবানদের। আরো আছে। মেশিন নবায়ন করা হয়নি, রফতানি বাজার অনুসন্ধানে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি, ভারতের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাটজাতদ্রব্য ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়নি, পাটের যে আরো বহুমাত্রিক ব্যবহারের সম্ভাবনা তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। সেগুলো যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করত তা না হওয়ার দায়ও নীতিনির্ধারকদের। পাটশিল্পের লোকসান দিয়ে স্ফীত হয়েছে যারা সেই মন্ত্রী,

আমলা, কতিপয় শ্রমিক নেতা, কনসালট্যান্ট এবং বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী তাদের লাভ গুছিয়ে নিরাপদে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। পাটশিল্পের লোকসানের জন্য কোনো মন্ত্রীর বা আমলার চাকরি যায় নাই। বিশ্বব্যাংকেও জবাবদিহিতা করতে হয় নাই। উল্টো এই লোকসান প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ওপরই বারবার হামলা হয়েছে। বর্তমান সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানও এদের হিসেবে নেয়নি, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পুরো শক্তির ব্যবহার হয়েছে শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা উচ্ছেদের কাজে। পুরো দায় শ্রমিকদের এবং শিল্পের ওপর ফেলে গুঁড়িয়ে দেয়া হচ্ছে সেই খাতকে যার ওপর বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম।

এই পাটশিল্প বাংলাদেশের শুধু শিল্প নয়, এটি কৃষির সঙ্গে যুক্ত, এটি বাংলাদেশের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই শিল্প বিশাল কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র। এই শিল্প বিকশিত হওয়াটাই বাংলাদেশের জন্য স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটাই রুদ্ধ করা হয়েছে নানা উন্নয়ন কর্মসূচির আড়ালে। সারা দুনিয়ায় কৃত্রিম আঁশের থেকে সরে আসছে মানুষ, বাড়ছে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা। সে কারণে জাতিসংঘ ২০০৯ সালকে আন্তর্জাতিক পাটবর্ষ ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশে পাটশিল্প নিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সরকার যে ভূমিকা নিয়েছে তা অব্যাহত থাকলে এর আগেই পাটশিল্প যে সমূলে উৎপাটিত হবে এটা নিশ্চিত বলা যায়।

শিল্প উপদেষ্টা এই শিল্প বিনাশ প্রক্রিয়াকেই জেহাদ বলে ঘোষণা করেছেন। এই জেহাদ তার একার নয়, বিশ্বব্যাংক বৈশ্বিক পরিকল্পনার অংশ। আগের সরকারগুলোর মতো তারাও নিছক এর বাস্তবায়নকারী। তাই এই পাটশিল্প রক্ষা ও বিকাশের জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার ছিল তার থেকে বেশি অর্থ বরাদ্দ দিয়ে এগুলো বন্ধ করা হচ্ছে। সুতরাং সম্পদের অভাবে সম্পদ সৃজনকারী খাত শেষ করে দেয়ার যুক্তি সত্য গোপন ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। সম্পদের ঘাটতি নয়, প্রচলিত শিল্পবৈরী উন্নয়ন দর্শনই পাটশিল্পকে বিনাশ করেছে। এর দায় তাদের সবাইকেই নিতে হবে।

পাট, পাটশিল্প ও পাটভূমি :

নির্মিত সংকট

২০০২ সালে এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী বন্ধের বছরে ঘোষিত হয় বাংলাদেশের পাটনীতি। এই পাটনীতি গুরুই হয়েছে এই বলে যে, “বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ‘সোনালি আঁশ’ আজ গভীর সংকটে নিপতিত। একদিকে বিশ্ববাজারে পাট ও পাটপণ্যের চাহিদা ও মূল্যহ্রাস, অপরদিকে পাট ও পাটপণ্যের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনব্যয়ের প্রভাবে পাট ও পাটশিল্পের অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। পাটশিল্পে লোকসানের পরিমাণ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের সার্বিক অর্থনীতির

ওপর এক বিরূপ প্রভাব ফেলছে। অথচ পাটের সঙ্গে সম্পৃক্ত কৃষক-শ্রমিকসহ এক বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থে পাটখাতের এ অবস্থার উদ্ভরণ একান্ত আবশ্যিক।” এতে আরো স্বীকার করা হয়েছে যে, ‘বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও রফতানি আয়ের ক্ষেত্রে পাট খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট চাষে ৩০-৩৫ লাখ কৃষক, পাটশিল্পে দুই থেকে আড়াই লাখ শ্রমিক-কর্মচারী, পাট বাণিজ্যে প্রায় এক লাখ ব্যবসায়ী এবং পরিবহন ও অন্যান্য সেবার কাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক নিয়োজিত রয়েছে। পূর্বে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বৃহত্তম অংশ অর্জিত হত পাট খাত থেকে।’ পাটনীতিতেই বলা হয়েছে, ‘এখন পর্যন্ত বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সহায়তায় যেসব পণ্য উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

ক) নিম্নমানের পাট ও কাঁচাপাট ব্যবহার করে কাগজ তৈরির পাম্প।

খ) পাটের কম্বল।

গ) কাপড় তৈরির লক্ষ্যে তুলা ও পাটের সংমিশ্রণে মিহি সুতা।

ঘ) ঘরের দরজা-জানালায় ফ্রেম তৈরির লক্ষ্যে কাঠের বিকল্প সামগ্রী।

ঙ) ঘরের ছাদের ব্যবহারের জন্য সি আই শিট-এর বিকল্প হিসেবে পাট মিশ্রিত করোগেটেড শিট।

চ) ঘরের অন্যান্য দ্রব্যসহ আসবাবপত্র তৈরির জন্য জুটো-প্লাস্টিক সামগ্রী।

ছ) মোটর গাড়ির বডি ও অভ্যন্তরের বিভিন্ন অংশ।

জ) নদী ও রাস্তার ভাঙন রোধকল্পে জুট জিও-টেক্সটাইল।

ঝ) রেফ্রিজারেটরের বডি।

ঞ) বিভিন্ন প্রকার ডেকোরেটিভ সামগ্রী।

ট) পাটের তৈরি বিভিন্ন প্রকারের কাপড়।’

সোনালি আঁশ পাট আর পাটশিল্পের এই যখন গুরুত্ব, এত বিশাল যখন তার সম্ভাবনা, তখন এর সংকট কীভাবে এত গভীর হয়? এর কারণ কোথায়? এটা কি পাট বা পাটশিল্পের নিয়তি? উন্নয়নের অপরিহার্য বলি? উন্নয়নের যাত্রায় অসঙ্গতিপূর্ণ প্রাচীন ঐতিহ্য? আমার মত হচ্ছে, না। পাটনীতি ঘোষণার পর কী কী উদ্যোগ নেয়া হল? ফলাফল কী? বিশ্লেষণে আমরা অবাধ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখব কীভাবে এরকম এক বিশাল সম্ভাবনার খাতকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ কেন পাটভূমি ও এখানে পাটশিল্পের তুলনামূলক সুবিধা? পাট ও পাটশিল্পে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধার ক্ষেত্র বহুবিধ। আবার এর গুরুত্ব এই

দেশের একটি শক্ত মাজা দাঁড় করানোর জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশের জন্য এই শিল্পের তুলনামূলক সুবিধার দিকগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপে বলা যায় :

উৎকৃষ্ট মানের পাট উৎপাদনের উপযোগী মাটি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ;

পাঁচ দশকে গড়ে ওঠা অভিজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমশক্তি;

আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাতদ্রব্যের প্রতি আগ্রহ, পাটজাতদ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি। অভ্যন্তরীণ বাজারেও এর বিস্তারের অসীম সম্ভাবনা;

পরিবেশ অনুকূল হওয়ার বর্তমান বিশ্বে এর বিকাশের সামাজিক ব্যয়, পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি শূন্য;

পাট রফতানি করে আয় করা বিদেশি মুদ্রার শতকরা ১০০ ভাগই দেশে থেকে যায়, যেখানে গার্মেন্টসে তা ৩০ ভাগ; অন্যদিকে চিংড়ি চাষে পরিবেশ ও সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির তুলনামূলক হার অত্যন্ত বেশি;

পাট একসঙ্গে কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকায় দুই খাতের বিকাশও এর ওপর নির্ভরশীল;

পাট ও পাটজাতদ্রব্য দু'ক্ষেত্রেই বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ;

পাট বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয় ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

এতগুলো অনুকূল উপাদান থাকবার পরও এই শিল্প যে এখন 'গভীর সংকটে পতিত' এবং বিলুপ্তির পথে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে রাষ্ট্রীয় নীতির ব্যাকরণ দেখতে হবে।

কীভাবে গড়ে উঠল এই শিল্প?

বর্তমান বিশ্বে প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ বাংলাদেশ, ভারত, চীন, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার। বাংলাদেশ এখনো উৎকৃষ্ট পাট উৎপাদনের ভূমি এবং বৃহত্তম কাঁচাপাট রফতানিকারক। হাতে বোনা পাটতন্তুজাত পণ্য বাংলা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি হত অষ্টাদশ শতাব্দীতেই। ব্রিটেনে ডাভিকে কেন্দ্র করে পাটশিল্প গড়ে উঠতে শুরু করে ১৮৩৩ সাল থেকে। প্রথম ভারতীয় পাটকল নির্মিত হয় ১৮৫৫ সালে, কলকাতায়। ১৯০০ সালের মধ্যে কলকাতাকেন্দ্রিক পাটশিল্প ইউরোপীয় পাটশিল্পকে ছাড়িয়ে যায়। সে সময় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল প্রধান পাট ব্যবসায়ী কোম্পানি। একচেটিয়াভাবেই তারা তখন ব্যবসা করে।

১৯৪৭-এ ভারতে প্রতিষ্ঠিত পাটশিল্প ব্রিটিশদের হাত থেকে মাড়োয়ারীদের হাতে আসে। পূর্ববাংলা থেকে তখন কাঁচাপাট যেত। একপর্যায়ে তা বন্ধ হয়ে গেলে ভারতে পাট উৎপাদন শুরু হয়। ভারত এখন বৃহত্তম পাট উৎপাদক। ভারতের বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান-টাটা-বিড়লার ব্যবসাও শুরু হয় পাট দিয়ে। মিতাল গ্রুপেরও পাট ব্যবসা ছিল। ১৯৫০ দশকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয়

উদ্যোগ ও সমর্থনে পাটশিল্প প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। আদমজী-বাওয়ানিসহ বিভিন্ন বৃহৎ ব্যবসায়িক গ্রুপ অল্প ইকুয়িটি দিয়ে ক্রমে এসব শিল্পের মালিকানা লাভ করে। এরপরও এসব মিলকারখানা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সুবিধা ও তর্তুকি পাওয়ার কারণেই অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকে ও বিকশিত হয়। ৬০ দশকে বাংলাদেশের পাট ছিল বৈষম্য ও নিপীড়নবিরোধী রাজনীতির কেন্দ্রীয় বিষয়। কেননা পুরো পাকিস্তানের রফতানি আয়ের প্রধান উৎস ছিল পাট কিন্তু এই বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশ ব্যয় হত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে। সে কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম স্বপ্ন ছিল এই পাটকে ঘিরে যে, এরপর এই পাট বাংলাদেশের মানুষেরই কাজে লাগবে। কিন্তু তা যে হয়নি তা আজকের নিশ্চিহ্ন বা বিধবস্ত পাটকল এলাকা আর ততোধিক বিধবস্ত মানুষদের দেখলে বুঝতে কারো সময় লাগে না।

যখন পাটশিল্প আরো বিকশিত হওয়ার কথা

বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভের ২৬ মার্চ ১৯৭২ এক অধ্যাদেশ বলে পরিত্যক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয়ভুক্ত করা হয়। পাটকলগুলোর সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের জন্য গঠন করা হয় বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা। সে সময় এর অধীনে ৭৭টি জুট মিল ছিল। ১৯৮২-৮৩ থেকে বিরাষ্ট্রীয়করণ শুরু হয়, প্রথম দফায় ৩৫টি জুট মিল তাদের আগের মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়। পরেও দেয়া হয়, কিন্তু ব্যক্তিমালিকানায় দিয়ে দেয়ার পর অনেকগুলো আর কার্যকর নেই। বেসরকারি খাতও নানা সংকটে জর্জরিত। সম্প্রতি চারটি বন্ধ করে দেওয়ার ফলে এই মুহূর্তে সরকারের হাতে আছে মাত্র ১৮টি পাটকল। এই হল যাত্রাপথের ক্রমাবনতিশীল রেখা।

১৯৭২ সালে পাটকলসহ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয়ভুক্তকরণ খুব সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ছিল না। ব্যবস্থাপনা ছিল দুর্বল। রাষ্ট্রীয়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমে নতুন ধনিক শ্রেণি গড়ে ওঠার একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে পাটশিল্প সম্পর্কে সরকারি চরম অবহেলা, কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করা, সরকারি দলের প্রভাববলয় সৃষ্টির কাজে পাটশ্রমিকদের ব্যবহার, মিলগুলোতে ট্রেড ইউনিয়নের নামে সরকারি মাস্তান বাহিনী তৈরির মধ্যে।

পাটকলে লোকসানের কারণ

‘পাট খাতের সমস্যা’ হিসেবে পাটনীতিতে যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

‘বিশ্ববাজারে কৃত্রিম আঁশ ও পণ্যের সঙ্গে পাট ও পাটপণ্যের তীব্র প্রতিযোগিতা এবং বাব্ব হ্যাভেলিং বিশ্ববাজারে প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমশই পাট ও পাটপণ্যের চাহিদা ও মূল্যহ্রাস;

বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও ঘাটতিজনিত কারণে প্রায় ১০ শতাংশ উৎপাদন ক্ষতি; পুরনো মেশিন ও যন্ত্রাংশ পরিবর্তন না করায় উৎপাদনশীলতাহ্রাস;

সরকারি পাটকলগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত শ্রমিক-কর্মচারী থাকায় এবং শ্রমিকরা কাজে অনুপস্থিত থাকায়, অবহেলা ও ফাঁকি দেয়ায় এবং শ্রমিক-কর্মচারী/কর্মকর্তাদের সময় সময় মজুরি/বেতন বৃদ্ধি করা;

ব্যংকঙ্কণের সুদের হার বৃদ্ধি করায় পাটপণ্যের উৎপাদন ব্যয় ক্রমেই বৃদ্ধি। পাটকলগুলোর লোকসান দিনদিন বৃদ্ধি প্রাপ্তি।’

লক্ষণীয় যে, এখানে শ্রমিকদের ওপর দায় চাপানোর আগ্রহটা বেশ বোঝা যায়, যার সমর্থনে কোথাও কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই। এটা নতুন নয়। এগুলো ক্রমান্বয়ে বলে বলে লোকসানের বা সংকটের আসল দায়দায়িত্ব যাদের সেই নীতিনির্ধারকদের রক্ষা করার চেষ্টা আমরা বরাবর দেখি। অথচ পাট মন্ত্রণালয়েরই সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যায়, এক বছরের লোকসান ৪২১ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৩০ কোটি টাকা শ্রমিক আন্দোলন থেকে সৃষ্টি। সবচেয়ে বেশি হচ্ছে পাটক্রয়ে বরাদ্দ বিলম্বে পাওয়ার কারণে, যার পরিমাণ ১৪০ কোটি টাকা। এছাড়া বিদ্যুৎ ও অনুৎপাদন খাতে ব্যয়বাবদ লোকসান ১৩০ কোটি টাকা।

স্বাধীনতার পর থেকে পাটকলে যে লোকসান ও সংকট বাড়তেই থাকে তার পেছনে তাই কয়েকটি কারণ সুনির্দিষ্ট করা যায়:

- পাকিস্তান আমলে পাটশিল্পের জন্য যেসব সুবিধা ও ভর্তুকি ছিল সেগুলো অব্যাহত না রাখা।
- যথাসময়ে পাট ক্রয়ের বরাদ্দ না দেয়ায় বিলম্বে দুই বা তিনগুণ বেশি দামে পাট ক্রয়।
- মেশিনপত্র কোনোরকম নবায়ন না করা।
- বিদ্যুতের সংকট সমাধানে এমনকি বিকল্প জেনারেটর ব্যবহারেও উদ্যোগ না নেয়া।
- দেশের মধ্যে পাটজাতদ্রব্য ব্যবহার বৃদ্ধির কোনো উদ্যোগ না নেয়া।
- আন্তর্জাতিকভাবে পাটজাত দ্রব্যের নতুন চাহিদা তৈরির চেষ্টা না করা, বিদ্যমান চাহিদার বাজার ধরার উদ্যোগ না নেয়া।

- ব্যাংকঋণ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের চাপ বৃদ্ধি ।
- সরকারি দলের কাজে শ্রমিকদের কর্মসময় ব্যবহার করা ।
- সরকারি দলের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক নেতার নামে সন্ত্রাসীদের লালন-পালন ।
- মন্ত্রণালয় থেকে বিজেএমসি ও মিল ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতিবাজদের অবস্থান । স্বাধীনতার পর থেকে এরমধ্যে আমরা অনেকরকম সরকার দেখেছি, তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে তুমুল বিরোধ থাকলেও যেসব বিষয়ে তাদের ভূমিকা অভিন্ন ছিল তার মধ্যে এসব নীতিমালা অন্যতম । ক্রমবর্ধমান লোকসানের এই কারণগুলোর কোনো পরিবর্তন কোনো সরকারের আমলেই হয়নি । এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ না নিয়ে লোকসানের অপরাধে পুরো শিল্পখাতের ওপর নতুনভাবে আক্রমণ শুরু হয় ৮০ দশকের প্রথম থেকে । সেসময়ই আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ও বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত কর্মসূচির জোরদার বাস্তবায়ন শুরু হয় । পাটখাতকে রাহুর হাত থেকে রক্ষার জন্য তাই ওপরের বিষয়গুলোতে কোনো উদ্যোগ না নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর বৈশ্বিক কৌশলের শিকারে পরিণত করা হয় পুরো খাতকে ।

উন্নয়নের নামে ধ্বংসের কর্মসূচি

৯০ দশকের শুরুতে যখন দুর্নীতি, লুণ্ঠন আর সরকারের বৈরী নীতির কারণে পাটশিল্পের জীর্ণদশা তখন বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী আনুষ্ঠানিকভাবে মাঠে প্রবেশ করে যথারীতি ত্রাতা হিসেবে । পাটখাতে সংস্কার কর্মসূচির প্রয়োজনের কথা বলে প্রথমে দুটো সমীক্ষা চালানো হয় । ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টেম্বর পরিচালিত এই সমীক্ষা দুটির একটি হল 'ইইসি'র অর্থসংস্থানে 'দ্য জুট ম্যানুফ্যাকচারিং স্টাডি' এবং আরেকটি হল বিশ্বব্যাংকের আইডিএ'র অর্থসংস্থানে সমীক্ষা 'বাংলাদেশ রিস্ট্রাকচারিং অপশনস ফর দ্য জুট ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি' । নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে নয়, এসব সমীক্ষা সুপারিশে সরকারকে নিছক বাস্তবায়নের সংস্থা হিসেবে দেখা হয়েছে । এই পুরো সমীক্ষায় বেসরকারি খাত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল । বলা দরকার যে, এরকম সমীক্ষা করে নিজেদের পছন্দসই পথ ও পদ্ধতিতে বৈধতা দেয়া যে কোনো খাতে এই গোষ্ঠীর রাহুগ্রাসের চেনাজানা পথ । তাই এসব পরীক্ষার ধারাবাহিকতাতেই ১৯৯৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জুট সেক্টর এডজাস্টমেন্ট ক্রেডিটের আওতায় বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি হয় । এতে ঋণ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় ২৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । এর সময়কালেই প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড গঠিত হয় । এর মধ্য দিয়েই শুরু হল পাটখাতের ওপর সংগঠিত আক্রমণ ।

চুক্তিতে যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেগুলো হল:

- ১। নয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব মিল বন্ধ ও দুটো সংকুচিত করে পুরো শিল্প সংকোচন করা;
- ২। ২০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করে জনবল 'র্যাশনলাইজ' করা;
- ৩। ১৯টি মিল বেসরকারিকরণ করা; এবং
- ৪। মজুরি বাড়ানো বন্ধ রাখা এবং মজুরির অনুপাত কমানো।

১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে বিশ্বব্যাংক অবিলম্বে ৫টি মিল বন্ধ, একটি সংকুচিত করা এবং ২৭০০ লুম বন্ধ করার জন্য জোর দেয়। বলা হয় ১৯৯৬-এর শরতের মধ্যে অবশ্যই ৩টি মিল বন্ধ করতে হবে।

বিভিন্ন কিস্তি পরিশোধের সময় পাটকল বন্ধ এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের নতুন নতুন সীমা দেয়া হয়। প্রথম কিস্তি চারটি মিল বন্ধ, ১২ হাজার ছাঁটাই। দ্বিতীয় কিস্তি পাঁচটি মিল বন্ধ, নয়টি মিল বেসরকারিকরণ, ৮ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই, তৃতীয় কিস্তি নয়টি মিল বেসরকারিকরণ।

এই ধারাতেই ক্রমে আদমজী বন্ধ হয়েছে। পাটশিল্পে লোকসানের সব কারণগুলো অব্যাহত রেখে রুগ্ণ অবস্থা বাড়ানো হয়েছে। একপর্যায়ে মজুরি দেয়া বন্ধ, লে-অফ ঘোষণা, হুমকি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একের পর এক পাটকলগুলোর বন্ধ করা হচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের সেই সংস্কার কর্মসূচিতে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, সংস্কার শেষ হতে হতেই পুরো খাত ব্যক্তিমালিকানাধীনে চলে যাবে। বলা হয়েছিল, এসবের মধ্য দিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়বে এবং এই খাতের উন্নয়ন ঘটবে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনশীলতা কমেছে, কর্মসংস্থান অর্ধেক থেকেও কমে গেছে আর প্রসারের বদলে সংকোচন ঘটেছে। নিচের ছকে এর একটি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে।

স্থাপিত ও ব্যবহৃত তাঁত রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানানী

সময়কাল	স্থাপিত	ব্যবহৃত
১৯৮০-৮১	২৫৭৯১	২৩৭৫৯
১৯৯৩-৯৪	২৬০৪৭	১৭৬৯১
২০০৪-০৫	২১৩৩২	৮৯১৫
প্রতিষ্ঠান		
রাষ্ট্রায়ত্ত্ব	১০৭৩৪	৫৯৪৩
ব্যক্তিমালিকানাধীন	১০৫৯৮	২৯৭২

পাটনীতির বক্ষ্যা কর্মসূচি

পাটনীতি করে কী কী কর্মসূচি নিল বাংলাদেশ সরকার? পাটনীতিতে সে সময় বলা হল, ‘বর্তমানে রফতানি আয়ের ক্ষেত্রে পাট ও পাটপণ্য তৃতীয় বৃহত্তম অবস্থানে রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাট ও পাটপণ্য রফতানি করে দেশের মোট রফতানি আয়ের ৮-১২% অর্জিত হচ্ছে।’ এই নীতি ঘোষণার কয়েক বছরের মধ্যে এই অনুপাত শতকরা ৪-এ নেমে আসে।

পাটনীতি ঘোষণাকালে মোট ১২৯টি পাটকল ছিল। এর মধ্যে সরকারি খাতে ৩৫টি এবং বেসরকারি খাতে ৯৪টি পাটকল (স্পিনিং মিলসহ) ছিল। পাটনীতিতে বলা হচ্ছে, ‘সরকারি খাতের মিলগুলোর মধ্যে ৫টি ও বেসরকারি খাতের মিলগুলোতে স্থাপিত তাঁতের মধ্যে ৭১% তাঁত চালু রয়েছে এবং বেসরকারি খাতের কম্পোজিট মিলগুলোর মধ্যে মাত্র ২৮% তাঁত চালু রয়েছে। বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশনের আওতাধীন মিলগুলোর স্থাপিত স্পিন্ডেলের ৬৯% চালু রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের কম্পোজিট মিলগুলোর উৎপাদনশীলতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এরপর অবস্থার অবনতি ছাড়া কোনো উন্নতি আর হয়নি।

পাটনীতিতে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে, ‘বিশ্বের অন্যান্য পাটপণ্য উৎপাদনকারী দেশগুলোর তুলনায় এদেশের পাটকলগুলোর উৎপাদনশীলতা অনেক কম, কারণ অন্যান্য পাটপণ্য উৎপাদনকারী দেশ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে এদেশের পাটশিল্প পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে স্থাপিত মেশিনারি দ্বারা উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হলেও পাটকলগুলোর যন্ত্রপাতি সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ ও প্রতিস্থাপনের জন্য এ পর্যন্ত কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়নি। ফলে পাটকলগুলোর উৎপাদন-ক্ষমতা সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এতে উৎপাদন-ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থার উন্নতিকল্পে পাটশিল্পের যন্ত্রপাতির সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ ও প্রতিস্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে।’ এরপর এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

পাটনীতিতে স্বীকার করা হয়েছে, ‘দেশে সিমেন্ট প্যাকিংয়ের জন্য পিপি ব্যাগ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে এবং এ ধরনের ব্যাগ দেশেই উৎপাদন করা হচ্ছে। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এ ধরনের ব্যাগের স্থানীয় উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করে তার পরিবর্তে পাটের ব্যাগ ব্যবহার করা গেলে এক লাখ মেট্রিক টনেরও বেশি পাটপণ্য ব্যবহৃত হতে পারে’ এ ব্যাপারেও কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

কর্মসূচি হিসেবে বলা হয়েছে, ‘সমীক্ষার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটজাতদ্রব্যের চাহিদা নিরূপণ করে পাটজাতদ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি প্রচেষ্টা গ্রহণ করা

হবে। সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি দফতর ও সংস্থাগুলোর পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। পাটজাতদ্রব্য/পণ্যের বিকল্প কৃত্রিম পণ্য উৎপাদনের জন্য নতুন শিল্প স্থাপন নিষিদ্ধ করতে সরকারকে উৎসাহিত করা হবে। পাটজাত দ্রব্যের বিকল্প কৃত্রিম পণ্য আমদানি/ব্যবহার হ্রাসে জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হবে। বলাবাহুল্য করা হয়নি।

‘পাট ও পাটজাতদ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদেশে প্রতিনিধিদল প্রেরণ, আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ, সভা-সেমিনারের আয়োজন করা এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করা।’ বিদেশ সফর হয়তো হয়েছে কিন্তু কোনো কাজ হয়নি।

‘সরকার কর্তৃক ঘোষিত আমদানি নীতি, রফতানি নীতি ও শিল্পনীতিতে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় পাট ও পাটশিল্পের ক্ষেত্রেও যাতে অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা সমভাবে প্রযোজ্য হয় সে লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।’ করা হয়নি।

‘বর্তমানের পাটকলগুলোতে স্থাপিত তাঁতের সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার। তন্মধ্যে বর্তমানে চালু রয়েছে ১৪ হাজারের কিছু বেশি।’ এরপর তা কমে হয়েছে ৮ হাজার।

‘পাটকলগুলোতে বিদ্যুৎ ঘাটতি ও বিভ্রাটের ফলে ২০০০-২০০১ সালে প্রায় ০.২৭ লাখ মেট্রিক টন উৎপাদন-ক্ষতি হয়, যার জন্য ওই বছর সংস্থাটির অতিরিক্ত লোকসান হয়েছে ৪৩.৬৫ কোটি টাকা। এ পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি পাটকলগুলোতে নিজস্ব জেনারেটর স্থাপনের উদ্যোগ উৎসাহিত করা’ হয়নি। বস্তুত নানা কর্মসূচির কথা বলা হলেও তার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো উদ্যোগ বা বরাদ্দ দেখা যায়নি। নিচের একটি ক্ষেত্রে শুধু ব্যতিক্রম-

বলা হয়েছে, ‘দেশে উৎপাদিত মোট প্রচলিত পাটপণ্যের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই উৎপন্ন করে থাকে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন। সংস্থাটি উহার উৎপাদিত পণ্যের প্রায় ৮০-৮৫% রফতানি করে থাকে। বাংলাদেশে উৎপাদিত কাঁচাপাটের প্রায় ৩০% বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের অধীনস্থ মিলগুলো ক্রয় করে থাকে।’ নীতিতে একইসঙ্গে বলা হচ্ছে, ‘বাংলাদেশে পাটশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে বেসরকারি খাতের কোনো বিকল্প নেই।’ বলা হয়েছে, ‘সরকার শ্রমিকস্বার্থ সংরক্ষণ করে পাটকলগুলো বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ দায়িত্ব প্রাইভেটাইজেশন কমিশনকে দেয়া হয়েছে।’ শ্রমিকস্বার্থকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে শুধু নয় তাদের ওপর দায় চাপিয়ে আর এখানেই সরকারের কার্যকর ভূমিকা দেখা যায়। আরো বলা হয়, ‘যে পাটকলগুলো কোনোক্রমেই বিক্রি করা সম্ভব হবে না, ঐসকল পাটকলের ক্ষেত্রে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।’ এর অর্থ হতে পারে একটাই সেটা হল বন্ধ ঘোষণা করা।

সেটা ব্যাপকভাবেই হচ্ছে। এই একটি জায়গাতেই সব সরকারকে ধারবাহিকভাবে সক্রিয় দেখা গেছে। বর্তমান সরকারের কথিত ‘দুর্নীতিবিরোধী’ অভিযানেও পাটশিল্পের দুর্নীতি দূর করার কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে এর শিকার শ্রমিকদের ওপরই আক্রমণ জোরদার করা হয়েছে।

ভারতে পাটশিল্প

যখন বাংলাদেশের পাটশিল্পে ধস তখন ভারতে পাটশিল্পে নবজাগরণ। এর জন্য দেশ ও বিদেশে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতে দুর্বল পাটকলগুলোকে চাঙ্গা করার জন্য দ্য জুট কোম্পানিজ (ন্যাশনালাইজেশন) অ্যান্ড, ১৯৮০ প্রবর্তন করা হয়। ভারতে শুধু পাটশিল্প নয়, শিল্প রক্ষা ও বিকাশের জন্য এখানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই নীতিতেই ভারতের জাতীয় পাটনীতি ঘোষিত হয় ২০০৫ সালের শেষে। এই নীতিতে ৩৫ বছরের ভারতীয় পাট সংস্থার পুনর্বিদ্যায়ন করা হয়। একই সালে সমগ্র বকেয়া ঋণ (১৯৫.৬৮ কোটি রুপি), সুদ (৩১৭.৯৭ কোটি রুপি) মওকুফ করা হয়। ভর্তুকি ৩০১.৮৮ কোটি রুপি অব্যাহত থাকে।

২০০২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশে আদমজী পাটকল বন্ধের মধ্য দিয়ে পাটশিল্পের ধস পরিষ্কার হয়। অন্যদিকে তার ৮ দিন পর ভারতীয় পাটশিল্পে আধুনিকীকরণের নতুন যাত্রা শুরু হয়। এই দিন থেকে নতুনভাবে কর্মসূচি নেয়া হয় পাটকলগুলো মেশিনপত্র নবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি পাবে।

২০০৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতের বস্ত্র মন্ত্রণালয় খাদ্যশস্য ও চিনির বস্ত্র হিসেবে যথাক্রমে শতকরা ১০০ ও ৯০ ভাগ পাটব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৮৭ সালে পাটজাত বস্ত্র ব্যবহার কমানোর সিদ্ধান্ত পুরোপুরি পাল্টে এভাবেই নতুন জীবন লাভ করে পাটশিল্প। ভারতের পূর্বাঞ্চলে এর গুরুত্ব বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এখানে ২.৭৬ লাখ পাটশ্রমিক (১ লাখ স্থায়ী), ৪০ লাখ কৃষক এবং এ সম্পর্কিত তৎপরতায় আরো ১.৪ লাখ মানুষ যুক্ত, সেই বিবেচনায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভারতে যখন ৭৮টি পাটকল, এর মধ্যে ৬১টি পশ্চিমবঙ্গে।

বিহার ও উত্তর প্রদেশে তিনটি করে, অন্ধ্র প্রদেশে ৭টি এবং আসাম, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও মধ্যপ্রদেশে একটি করে।

২০০৫-এর পাটনীতি পাট গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তি, অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন নির্দিষ্ট করেছে। লক্ষ্য হচ্ছে, রফতানি বর্তমানের ১০০০ কোটি রুপি থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ৫০০০ কোটি রুপিতে নিয়ে যাওয়া এবং রফতানি অনুপাত ৮২:১৮ থেকে ৬৫:৩৫-এ উন্নয়ন করা। একটা খোকবরাদ্দ দেয়া হচ্ছে রফতানি থেকে শুল্ক ও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতায় সহায়তা দেয়ার জন্য। উৎপাদন বৈচিত্র্যকরণের বিষয়েও দৃষ্টি দেয়া হবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে বিকশিত করাটাই মূল উদ্দেশ্য। ভারত ২০১০ সালে পাট রফতানি ৫ গুণ করবে। অন্যদিকে কয়েক বছর আগে বাংলাদেশে মোট রফতানি আয়ের শতকরা ৯.৮ ভাগ ছিল পাট ও পাটজাত দ্রব্য। ২০০৫-০৬ সালে তা কমে হয়েছে ৪.৭। এটি আরো কমবে বলে ধারণা করা যায়। অথচ পাটনীতিই স্বীকার করেছে, বাংলাদেশে পাট থেকে ১ ডলার আয় গার্মেন্টস থেকে ৪ ডলার আয়ের সমান।

কী দরকার?

অতএব, বিচ্ছিন্ন করে দেখা ঠিক নয়, গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে ধরনের সংস্কার চলেছে তার একটি বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে পাটশিল্পের ধস। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার প্রাস্তস্ব দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপক, আইএমএফ ও এডিবি'র মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর চারণক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হতে পেরেছে, এদেশের লুটেরা, সামাজিক দায়হীন, মতাদর্শিকভাবে দেউলিয়া, দুর্নীতিগ্রস্ত, অতি অল্প পয়সায় বিক্রিযোগ্য রাজনীতিবিদ, আমলা, কনসালট্যান্টদের আধিপত্যের কারণে। বিশ্বপুঁজির প্রতিনিধি, নির্দিষ্টভাবে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর লবিস্ট বিশ্বব্যাপক, আইএমএফ ও এডিবি'র আঞ্চলিক কৌশল, মতাদর্শিক অবস্থান আর অন্যদিকে দেশীয় লুটেরাদের স্বার্থ একসঙ্গে এই শিল্পবিরোধী কর্মসূচি জোরদার করেছে।

বাংলাদেশে পাট ও পাটশিল্পের অমিত সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনা বাস্তবায়নের সঙ্গে যোগ আছে বাংলাদেশে শিল্পায়নের দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণের, বিশাল কর্মসংস্থান সৃষ্টির, পরিবেশ-অনুকূল কর্মতৎপরতায় সুস্থ জীবন লাভ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে শক্ত অংশগ্রহণের। এর উপলব্ধি ও সে অনুযায়ী নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব যখন জাতীয় সক্ষমতার বিকাশ প্রশ্নটি উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তার দায় অবশ্যই এদেশের জনগণের, আমাদের।

বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর উন্নয়ন রাস্তা

দুর্নীতি, লুণ্ঠন আর কাসাক অনুরাগী সরকারের বৈরী নীতির কারণে পাটশিল্পের যখন জীর্ণদশা তখনই বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী আনুষ্ঠানিকভাবে এই খাতের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে মাঠে প্রবেশ করে। প্রথমে দুটো সমীক্ষা চালানো হয়। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টেম্বরে পরিচালিত এই সমীক্ষা দুটির একটি হল 'ইইসি'র অর্থসংস্থানে 'দ্য জুট ম্যানুফ্যাকচারিং স্টাডি' এবং আরেকটি হল বিশ্বব্যাংকের আইডিএ'র অর্থসংস্থানে সমীক্ষা 'বাংলাদেশ-রিস্ট্র্যাকচারিং অপশনস ফর দ্য জুট ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি'। এই সমীক্ষাগুলোর ধারাবাহিকতাতেই ১৯৯৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জুট সেক্টর এডজাস্টমেন্ট ক্রেডিটের আওতায় বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি হয়। এতে ঋণ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় ২৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই ঋণের টাকায় দেশ-বিদেশের বহু কনসালট্যান্স ফার্মের ব্যবসা জমে ওঠে এবং শুরু হয় পাটখাতের ওপর সংগঠিত আক্রমণ।

২৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী ১৭০০ কোটি টাকা দিয়ে যেসব কাজ করার চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকার আবদ্ধ হয় সেগুলোর মধ্যে পাটশিল্প নবায়ন, বৈচিত্র্যকরণ বা সম্প্রসারণের কোনো কর্মসূচিই ছিল না। যা ছিল তা নিম্নরূপ:

- ১। নয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব মিল বন্ধ ও দুটো সংকুচিত করে পুরো শিল্প সংকোচন করা;
- ২। ২০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করে 'র্যাশনলাইজ' করা;
- ৩। ১৯টি মিল বেসরকারিকরণ করা; এবং
- ৪। মজুরি বাড়ানো বন্ধ রাখা এবং মজুরির অনুপাত কমানো।

বিভিন্ন কিস্তি পরিশোধের সময় কারখানা বন্ধ আর শ্রমিকছাঁটাইয়ের নতুন নতুন সীমা দেয়া হয়। প্রথম কিস্তি চারটি মিল বন্ধ, ১২ হাজার ছাঁটাই। দ্বিতীয় কিস্তি পাঁচটি মিল বন্ধ, নয়টি মিল বেসরকারিকরণ, ৮ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই, তৃতীয় কিস্তি নয়টি মিল বেসরকারিকরণ।

এই ধারাতেই ক্রমে আদমজী বন্ধ হয়েছে। পাটশিল্পে লোকসানের সব কারণ অব্যাহত রেখে রুগ্ণ অবস্থা বাড়ানো হয়েছে। একপর্যায়ে মজুরি দেয়া বন্ধ, লে-অফ ঘোষণা, হুমকি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একের পর এক পাটকলগুলো বন্ধ করা হচ্ছে। শুরুতে যে চিত্র পেয়েছি এগুলো তাই একটা ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই সৃষ্ট।

আর সব খাতের মতো পাটখাতে এসব কাজ করার বিশ্বব্যাপ্তকীয় যুক্তি ছিল এসবের মধ্য দিয়ে পুরো পাটখাতে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়বে এবং এই খাতের সার্বিক প্রসার ঘটবে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, চুক্তি স্বাক্ষরের পর গত ১৩ বছরে পাটশিল্পে উৎপাদনশীলতা কমেছে, কর্মসংস্থান অর্ধেক থেকেও কমে গেছে আর প্রসারের বদলে সামগ্রিক পাটশিল্পের সংকোচন ঘটেছে। নিচের ছকে এর একটি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে।

স্থাপিত ও ব্যবহৃত তাঁত রাস্ত্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন

সময়কাল	স্থাপিত	ব্যবহৃত
১৯৮০-৮১	২৫৭৯১	২৩৭৫৯
১৯৯৩-৯৪	২৬০৪৭	১৭৬৯১
২০০৪-০৫	২১৩৩২	৮৯১৫
প্রতিষ্ঠান		
রাস্ত্রীয়ত	১০৭৩৪	৫৯৪৩
ব্যক্তিমালিকানাধীন	১০৫৯৮	২৯৭২

সূত্র: বিজেএমসি

পাটশিল্পের ওঠানামা : ভিন্নচিত্র

কিন্তু পাটশিল্পের এই দৃশ্যপট তো সর্বত্র নয়। ভারতে আমরা একই সময়ে দেখছি সর্বাত্মক উদ্যোগের মাধ্যমে পাটশিল্পের নতুন যাত্রা।

পাটশিল্পের ভিন্নযাত্রা

বিষয়	বাংলাদেশ	ভারত
মেশিনপত্র	একবারও নবায়ন করা হয়নি	নবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে
ব্যাংকঋণ	বহু বছরের পুরনো ব্যাংকঋণ সুদে-আসলে বাড়ছে। ঋণখেলাপিদের নানা সুবিধা দেয়া হলেও পাটশিল্প কোনো ছাড় নেই।	নতুন করে ব্যাংকঋণ ও সুদ মওকুফ
অভ্যন্তরীণ বাজার	পাটজাতদ্রব্য ব্যবহারে কোনো বাধ্যবাধকতা বা প্রচারণা নেই।	খাদ্যশস্য ও চিনির বস্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা আরোপ
আন্তর্জাতিক বাজার	বিভিন্ন ব্যয়বহুল অফিস খোলা হলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেই।	আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমান্বয়ে আধিপত্য বিস্তার
কর্মসংস্থান	কমছে	বাড়ছে
উৎপাদনশীলতা	কমছে	বাড়ছে
রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি	পাটশিল্পের প্রতি বৈরী	পাটশিল্পের প্রতি বিশেষ মনোযোগী
বিশ্বব্যাংকগোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্মসূচি	দেশীয় শিল্পের প্রতি বৈরী	শিল্প-সহযোগী

বাংলাদেশে পাটশিল্প খাতে যেভাবে সংকোচন নীতি বাস্তবায়ন হচ্ছে তা যদি চলতেই থাকে তাহলে এই প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, বাংলাদেশ কি আবার কাঁচাপাট রফতানিকারকের পুরনো অবস্থানে ফিরে যাচ্ছে? বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর আঞ্চলিক উন্নয়ন কৌশলে বাংলাদেশের অবস্থান কাঁচামাল রফতানিকারক হিসেবে। তাদের ইচ্ছা বাংলাদেশ গ্যাস, কয়লা, কাঁচাপাট রফতানি করুক আর এগুলো দিয়ে শিল্প গড়ে উঠুক ভারতে কিংবা এসব কাঁচামাল তাদের বৃহৎ পুঁজির

কর্তৃত্বে নিশ্চিত হোক। কয়েক দশকে পাটশিল্পের উদ্ভব ও সংকোচনের নিচের চিত্র এই আশঙ্কাই তুলে ধরছে।

পাটশিল্প : বিনাশ বৃত্ত?

৫০ দশকের পূর্বে	কাঁচাপাট উৎপাদন ও কলকাতাকেন্দ্রিক শিল্পে জোগান
৫০ দশকে	: উৎকৃষ্ট মানের পাটের প্রাপ্যতার কারণে রাষ্ট্রীয় সমর্থন ও ভর্তুকিতে পাটশিল্প প্রতিষ্ঠা : কোরীয় যুদ্ধের কারণে পাটজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি ও বাজার প্রাপ্তি
৬০ দশকে	: রাষ্ট্রীয় সমর্থন ও ভর্তুকিতে শিল্পের প্রসার। : বোনাস ভাউচার স্কিমের কার্যকর ভূমিকা। : পাট ও পাটজাতদ্রব্য রফতানি পাকিস্তানের। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠা।
৭০ দশকে	: পরিত্যক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচির অধীনে পাটকলও রাষ্ট্রীয়করণ। বিজেএমসি প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনা ও মনোযোগের অভাব, দুর্বল ব্যবস্থাপনা। দুর্নীতির মাধ্যমে নব্য ধনিক শ্রেণির গঠনকাল, শিকার-রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাত। : রাষ্ট্রীয় সমর্থন ও ভর্তুকির পুরনো নিয়ম প্রত্যাহার
৮০ দশকে	: নতুন মাত্রায় লোকসান শুরু। : বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি। পরিকল্পিতভাবে বিরাজিতকরণ শুরু। : পাটকল শ্রমিকদের সরকারি দলের জমায়েতে ব্যবহার। : শ্রমিকনেতা নামে সরকারি দলের সন্ত্রাসীদের আধিপত্য। : পাটক্রয়ে সময়মতো বরাদ্দ না দেয়ার রীতি শুরু। : লোকসান বৃদ্ধি।
৯০ দশকে	: পাটখাত উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের ১৭০০ কোটি টাকা ঋণ। : শর্ত অনুযায়ী পাটকল বন্ধ, বিরাজিতকরণ, তাঁতের সংখ্যা হ্রাস, শ্রমিকছাঁটাই শুরু। : বিদ্যুৎসমস্যা, পাটকল ক্রয়ে বরাদ্দ না দেয়া অব্যাহত। : রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পাটশিল্প অধিকতর সংকোচন। : লোকসান বৃদ্ধি।
২০০০- পরবর্তী সময়ে	: সরকার কর্তৃক বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল বন্ধ ঘোষণা (২০০২)। বিশ্বব্যাংক, মার্কিন দূতাবাস ও বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর অভিনন্দন। : পাটনীতি ঘোষণা (২০০২) : সময়মতো পাটক্রয় বরাদ্দে অর্থ প্রদান না করা অব্যাহত।

	<p>: পাটজাত দ্রব্যের রফতানি অনুপাত হ্রাস ।</p> <p>: দিনমজুরিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করে বেসরকারি পাটকল প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও শিল্পের অভূতপূর্ব সংকোচন ।</p> <p>: ভারতে পাটনীতি (২০০৫) । পাটশিল্পের নতুন বিকাশ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ।</p> <p>: শ্রমিকছাঁটাই ও পাটকল বন্ধের নতুন কর্মসূচি শুরু (২০০৭) ।</p>
২০০৭- পরবর্তী সময়ে	কাঁচাপাট উৎপাদন ও ভারতকেন্দ্রিক পাটশিল্পে কাঁচাপাট জোগানের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন?

বিশ্বব্যাকগোষ্ঠীর উন্নয়ন দর্শন: ‘না’ বলতে হবে

বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে যে উন্নয়ন দর্শন অনুসরণ করা হয়েছে তাতে বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে কয়েক হাজার চোরাই কোটিপতি । অন্যদিকে স্থায়ী কর্মসংস্থান কমেছে, দারিদ্র্য আরো টেকসই হয়েছে, সম্পদ ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিরাপত্তাহীনতা ও অধিকতর নাজুকতায় আক্রান্ত হয়েছে । বন, জলাভূমি, নদীনালা, খালবিল, রাষ্ট্রীয় সম্পদের দখলদার দুর্বৃত্তদের আধিপত্য বেড়েছে । বিদেশি বিনিয়োগের নামে তেল-গ্যাস-কয়লা নিয়ে জাতীয় স্বার্থবিরোধী বহু ধ্বংসাত্মক চুক্তি করা হয়েছে । গত বছর এই মাসেই দিনাজপুরের ফুলবাড়ী অঞ্চলের মানুষ জীবন দিয়ে এরকম এক ভয়াবহ বিনিয়োগ প্রকল্প ঠেকিয়েছেন ।

যখন সরকার পাটশিল্প নবায়নের জন্য ৩০০ কোটি বরাদ্দ করতে অনিচ্ছুক, যখন বাপেক্সসহ জাতীয় সংস্থাকে সম্পদের অভাবের কথা বলে পঙ্গু করা হচ্ছে তখন প্রতি বছর বিশ্বব্যাক গোষ্ঠীর পছন্দের জ্বালানি বা বিদ্যুৎচুক্তি করে বছরে জনগণের অর্থ থেকে ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা । আইএমএফ আর বিশ্বব্যাক কিংবা এডিবি এসব সংস্থা উন্নয়নের নামে এই অর্থনীতির টেকসই ভিত্তি তৈরি বাধাগ্রস্ত করেছে, আমদানিমুখী অর্থনীতি হিসেবে নাজুক অবস্থায় ফেলেছে পুরো অর্থনীতিকে । বন্যায় বিপর্যস্ত কৃষকদের ঋণের সুদ বাড়তে চাপ দিচ্ছে তারা, সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিসহ বিনিয়োগ ব্যয়বহুল করার নানা কর্মসূচি নিয়ে তারা মাঠে নেমেছে । এদের জন্য বঙ্গশিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে, এদের উন্নয়ন দর্শন দিয়েই বিনাশের পথে এখন পাটশিল্প । এদের এসব কর্মসূচির জুনিয়র পার্টনার হিসেবে এদেশের নানা শাসকগোষ্ঠী কনসালট্যান্ট ছিটেফোঁটা পেয়ে থেকে দেশকে পরিণত করেছে দেশি ও বিদেশি লুটেরাদের চারণক্ষেত্রে ।

এ অবস্থা থেকে আমাদের বেরণেই হবে । এটা আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন । এর জন্য দরকার জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি, আর তার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে ভুল বা ক্ষতিকর বা জাতীয় স্বার্থবিরোধী প্রস্তাবনা সে যত শক্তিশালী মহল থেকেই আসুক না কেন তা প্রত্যাখ্যানের শক্তি অর্জন করা । ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয় তার ‘না’

বলার শক্তির মধ্য দিয়ে, একটি জনগোষ্ঠীর শক্তিও স্পষ্ট হয় সে দখলদার, দুর্বৃত্ত আধিপত্যকামী অপশক্তিকে প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা অর্জন করেছে কিনা তার ওপর।

অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশের পাট ও পাটশিল্প বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনার পথ দেখাতে পারে; বাংলাদেশের সীমিত তেল-গ্যাস, কয়লা-খনিজ-সম্পদ নিজেদের কর্তৃত্বে থাকলে তা এদেশের চেহারা পাল্টে দিতে পারে; সবার জন্য শিক্ষা-চিকিৎসা ও বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করা সম্ভব যদি বিদ্যমান বাজারমুখী মুনাফামুখী নীতি পাল্টানো যায়; মানুষ, মাটি ও পানির সার্থক সমন্বয়ে এদেশে নতুন যাত্রা শুরু করতে পারে। এসবই সম্ভব বাংলাদেশের জনগণের জীবন ও সম্পদের ওপর জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে। আর তা সম্ভব করার প্রথম শর্ত বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এডিবি'র মতো সংস্থাগুলোকে 'না' বলা, তাদের প্রত্যাখ্যান করার শক্তি অর্জন করা।

এই 'না' খুবই ইতিবাচক উচ্চারণ। কারণ এর মধ্যই দিয়েই কেবল সম্ভব নিজেদের মেধা, যোগ্যতা ও সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি ফেরানো এবং সম্ভব মানুষ ও পরিবেশকে কেন্দ্রে রেখে প্রকৃত উন্নয়ন পথ নির্মাণ। সম্ভব যে পাটশিল্প বাংলাদেশকে একটি শক্ত ভিত্তি দিতে পারে, পরিবেশ-অনুকূল যে শিল্প কৃষি, জীবন-জীবিকা সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে নতুন আবহাওয়া আনতে পারে তাকে রাখমুক্তকরা।

বিশ্বের বহু দেশ এখন এভাবেই নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করেছে। পাট, পাটশিল্পসহ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রক্ষার আর কোনো সহজ পথ নেই। জনগণ যদি এদের প্রত্যাখ্যান করতে পারে তাহলে এদেশে তার দেশি ভাগীদারদেরও জায়গা হবে না।

[লেখক: প্রাবন্ধিক, সমাজবাদী রাজনীতিক। অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।]

আদমজী পাটকলের বিলুপ্তি এবং বাংলাদেশে শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ^১

আবুল বারকাত

[প্রায় ১৪ বছর আগে রচিত হলেও সম্পাদকীয় বিবেচনায় চিন্তা ও বিশ্লেষণগত কারণে রচনাটির উপযোগিতা বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক। ফলে সময়-কাল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তবাবস্থার তথ্য-উপাত্ত পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও এটি ‘হালখাতা’র ‘বাংলাদেশে পাটের ভবিষ্যৎ’ সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে ঢাকার পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি মিলনায়তনে ‘সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র’ আয়োজিত ‘আদমজী পাটকল বিলুপ্তি এবং বাংলাদেশে শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক জাতীয় সংলাপে রচনাটি প্রথম উপস্থাপিত হয়েছিল। – প্রধান সম্পাদক]

সারকথা

বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী পাটকল বিলুপ্ত করা হয়েছে। এ ঘটনা শিল্পায়ন বিরোধিতার এক সিমবল। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের আওতায় একরৈখিক, একচেটিয়া পুঁজির নিয়ামক ভূমিকা আর সেইসঙ্গে বাংলাদেশের দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতির প্রভাবের মধ্যে কৃষি-শিল্প-সমৃদ্ধ উৎপাদনশীল অর্থনীতির ভিত্তি বিনির্মাণ অসম্ভব ও দুঃসাধ্য। অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন সমাজ, রাজনীতি আর রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেও দুর্বৃত্তায়িত করেছে। পুরো কাঠামোর এ দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া রোধ করা ছাড়া জনকল্যাণ ও শিল্পায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বিষয়টি সামাজিক-রাজনৈতিক রূপান্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এখানে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গভীর মানবিক গুণাবলিসমৃদ্ধ সাহসী নেতৃত্বের বিকল্প নেই। বিকল্প নেই নির্মোহ সত্যানুসন্ধানের প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়নের। বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনীতি ক্রমাগতভাবে অধিক হারে দুর্বৃত্তায়নের শিকার। অর্থনীতির এ দুর্বৃত্তায়ন রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদকে করছে আরও শক্তিশালী। সমগ্র শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যবস্থা এখন আর্থ-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বেষ্টিত। আর্থ-রাজনৈতিক-

সামাজিক এ দুর্বৃত্তায়নরোধে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নসহ জনকল্যাণমুখী উত্তরণে রাজনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি। রাজনৈতিক এ পরিবর্তনে উষ্ণহৃদয় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গভীর মানবিক গুণাবলীসমৃদ্ধ সাহসী দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বিলম্ব অধিকতর বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে বিধায় কাঠামোগত এ পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য মুক্তি-স্বাধীনতার পক্ষ শক্তির জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয় এমন এক কার্যকরী ন্যূনতম জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: মূল প্রবন্ধ রচনাকালে প্রবন্ধকার বিষয়বস্তুর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন। প্রত্যেকেই নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন নিজের মতো করে। তাঁদের সবার প্রতি নিবন্ধকার কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা উদ্রেককারী প্রশ্ন উত্থাপন করে যাঁরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ড. সায়েদুল হক খান, অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. শফিক-উজ-জামান, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. অভিজিৎ পোদ্দার, জনমিতি গবেষক; ড. জামাল উদ্দিন, হিসাব বিজ্ঞানী ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য; জনাব আয়ুব আলি, শ্রমিকনেতা; ডা. এ কে এম মুনির, সচেতন চিকিৎসক; ড. শশাঙ্ক দাস গুপ্ত ও জনাব এ কে এম মাকসুদ, সমাজ বিজ্ঞানী; জনাব নূর আহমেদ, প্রাক্তন ছাত্রনেতা; জনাব মাহমুদ জামাল কাদেরী, উপদেষ্টা, সম্মিলিত রিকসা-ভ্যান চালক-মালিক পরিষদ, এবং ড. সাইফুল হক, সমাজ-সচেতন ব্যবসায়ী। সম্পাদনায় সহযোগিতার জন্য বিশিষ্ট সাংবাদিক অরুণাভ সরকারের প্রতি প্রবন্ধকার সবিশেষ কৃতজ্ঞ। স্বল্পসময়ে অতিদ্রুত সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি কয়েকদফা টাইপ করার জন্য মানব উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জনাব মোজাম্মেল হক ও মুদ্রণে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য কাশেম-নাহার প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার ট্রাস্টের ইঞ্জিনিয়ার আবুল হাসেম, ড. আবুল হুসসাম ও নুরুল আজমের কাছে প্রবন্ধকার চিরঋণী। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে প্রবন্ধ রচনায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্রের প্রধান ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আর বিশেষ করে তাগাদা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ড. জাহেদা আহমেদ, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ড. আকমল হোসেন, অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ঋণ অপরিশোধ্য।]

আদমজী পাটকলের বিলুপ্তি: যা বলা হয়েছে আর যা বলা হয়নি

আদমজী পাটকলের তাঁতসংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৩০০। এটিই ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল। ২০০২ সালে কলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনা আমাদের অর্থনীতির সাধারণ কোনো ঘটনা নয়। এ নিয়ে যা কিছু বলা হয়েছে আর যা বলা হয়নি, তা সবই বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয়ের ইঙ্গিত দেয়। বিষয়গুলো হচ্ছে :

এক. তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ জনগণের কল্যাণসংশ্লিষ্ট জরুরি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ সব তথ্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব (উন্নয়নের পূর্বশর্ত যে ‘স্বচ্ছতার গ্যারান্টি,’ এক্ষেত্রে তা ভঙ্গ করা হচ্ছে)।

দুই. বিশ্বায়নের যুগে একচেটিয়া পুঁজির নিঃশর্ত বিকাশে তৃতীয় বিশ্বের শিল্পায়ন-সম্ভাবনা রুদ্ধ করতে হবে (অর্থাৎ সমগ্র বাজার-ব্যবস্থা রাখতে হবে কেন্দ্রের অধীন; এক্ষেত্রে ১নং শর্তের উপস্থিতি জরুরি)।

তিন. তৃতীয় বিশ্বের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া রুদ্ধ করতে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফসহ বিভিন্ন সংস্থা খুবই তৎপর (অর্থাৎ ২ নং শর্ত বাস্তবায়নে কার্যকর মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান থাকতেই হবে)।

চার. তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তস্থ সমাজ-অর্থনীতিকে কেন্দ্রস্থ একচেটিয়া পুঁজির অধীন রাখার স্বার্থে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ শক্তিশালী করাটাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা (অর্থাৎ ২ নং শর্ত কার্যকরী করতে তৃতীয় বিশ্বে নিকৃষ্ট পুঁজির বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে)।

পাঁচ. তৃতীয় বিশ্বে স্ব-চালিত কল্যাণমুখী আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি বিনির্মাণ দুঃসাধ্য (১,২,৩ ও ৪ নং শর্ত কার্যকর হলে)।

ছয়. প্রান্তস্থ তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশে উন্নয়নের একই পদ্ধতি কার্যকর নয়; সুদূর প্রান্তস্থ অর্থনীতিতে শিল্প-বিকাশ রুদ্ধ করতে প্রান্তের কোনো কোনো অর্থনীতিকে এজেন্সি-পুঁজির বিকাশে ছাড় দিতে হবে (যেমন ভারতের পুঁজির বিকাশের স্বার্থে এখানে যখন পাটকল বন্ধ হবে তখন ভারতে চালু হবে নতুন পাটকল। আমাদের

পাটকল বন্ধ করা ও ভারতে পাটকল প্রতিষ্ঠা করা, উভয় ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে মধ্যস্থতাকারী বিশ্বব্যাংক) ।

পাকিস্তানি এক পুঁজিপতি ১৯৫১ সালে তার পারিবারিক নামে আদমজী পাটকল স্থাপন করে । এদেশে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধিতে পাটকলটি ভূমিকা রেখেছিল । অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল পাটকলটি । পাটের রপ্তানি আয়ের উপর ৩৫% বোনাস ভাউচার (ভর্তুকি) পেয়ে পাটশিল্প লাভজনক শিল্পে রূপান্তরিত হয় । আদমজীর অনুপ্রেরণায় অন্যান্য পাট ও সুতাবস্ত্রকল স্থাপনের মাধ্যমে এদেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া অনুপ্রেরণা পেয়েছিল । সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ আর জাতীয় পুঁজির বিকাশের ধারা । ১৯৭১-এর আগে এসব শিল্পকারখানা যথেষ্ট লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় । স্বাধীনতার পরে পশ্চিম-পাকিস্তানি মালিকদের ফেলে যাওয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কলকারখানা বাংলাদেশ সরকার অধিগ্রহণ করে রাষ্ট্রীয়ত্ত খাত সৃষ্টি করে । রাষ্ট্রীয়ত্ত খাত প্রকৃতপক্ষে কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুণ্ঠনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র হিসেবে দেখা দেয় । সরকারি আমলা, মন্ত্রী-এমপি, নেতা-কর্মী, মিলের দুর্নীতিবাজ ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সিবিএ নেতা, ব্যবসায়ী এদের সকলেরই কালো কারবারের চারণক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয় রাষ্ট্রীয়ত্ত খাত । মিল পরিচালন, পরিকল্পনা, ক্রয়-বিক্রয় কোনো কিছুতেই শ্রমিকদের কোনো ধরনের অংশগ্রহণ কখনও ছিল না । এ ধরনের রাষ্ট্রীয়ত্ত খাত আর যাই হোক সমাজতন্ত্রের সমর্থক নয় । নব্বইয়ের দশকে মিলের উৎপাদন সংকোচন নীতি গ্রহণ করা হয় । কিন্তু আমলাতান্ত্রিক ব্যয়সহ বিভিন্ন ধরনের অনুৎপাদনশীল ব্যয় বৃদ্ধি রাখা হয় অব্যাহত । বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে এসব উল্লেখ করা হয় না । বলা হয়, আদমজীর এক হাজার ২০০ কোটি টাকা লোকসান বা দেনার কথা । তারা তাদের জুট সেকটর রিস্ট্রীকচার প্রোগ্রাম (জুট সেকটর এ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট)-এর আওতায় আদমজীসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয়ত্ত মিল-কলকারখানা বন্ধ এবং/অথবা ব্যক্তিখাতে হস্তান্তর করাটা আমাদের দেশের জন্য উন্নয়ন সহায়ক বলে মন্তব্য করে^২ । অর্থাৎ চূড়ান্ত বিচারে যা সৃষ্টির সামর্থ্য নেই তা ধ্বংস করাটাই অতীষ্ট ।

বলা হয়েছে, ৩ হাজার ৩০০ তাঁত সজ্জিত আদমজী পাটকল গত তিন দশকে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে । এ লোকসান দূর করতে পারলে বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের লোকসান এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পাবে (বিশ্বব্যাংকের বক্তব্য)* । লোকসানের এ হিসাব কিভাবে করা হ'ল, তা কখনও প্রকাশ করা হয়নি । সামাজিক কস্ট-দুর্নীতি বেনিফিট প্রসঙ্গ বাদই দিলাম । এমনকি আর্থিক কস্ট-বেনিফিট-এর হিসাবও বিচার-বিশ্লেষণের জন্য জনগণের নির্বাচিত

প্রতিনিধিদের কাছে কখনও পেশ করা হয়নি। এসব হিসাবপত্রের পদ্ধতি সম্পর্কেও আমরা জানতে পারলাম না। প্রকৃতপক্ষে আদমজী পাটকল আদৌ লোকসানি প্রতিষ্ঠান কিনা এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ লাভ-ক্ষতির সাধারণ পাটিগণিতিক হিসাব তা নির্দেশ করে না। আর আদমজীতে প্রত্যক্ষ এবং আদমজীকেন্দ্রিক পরোক্ষ কর্মসংস্থান, কৃষি-অর্থনীতিতে পাটের গুরুত্ব এবং বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক তত্ত্বের প্রকৃত চাহিদা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনায় 'লোকসান' নেহায়েত অজুহাত মাত্র। আসলে পূর্বে উল্লিখিত গভীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ কার্যকরী করতেই আদমজীকে লোকসানি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখানো জরুরি হয়েছিল।

আদমজী পাটকল বিলুপ্ত হয়েছে ৩০ জুন (২০০২)। পূর্ববর্তী ৩১ বছরে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকার লোকসানের ওজুহাত দেখানো হয়েছে। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণে সহায়ক হতে পারে এমন অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য (যতটুকু জানা গেছে) দেওয়া হয়নি। গোপন করা হয়েছে। তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত আমাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। বলা হয়নি অনেক কিছু যা বললে আদমজী বন্ধের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো সম্ভব হত না। সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ যেসব কথা বলা হয়নি, তার মধ্যে অন্যতম হল :

এক. বলা হয়নি, গত তিন দশকে আদমজী আয় করেছে ৩ হাজার ৭০৪ কোটি টাকা (অথচ বলা হয়েছে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা লোকসানের কথা); এর মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা রয়েছে দুই হাজার ২৩৮ কোটি টাকার সমপরিমাণ।

দুই. গত তিন দশকে আদমজী বিভিন্ন কর বাবদ সরকারকে পরিশোধ করেছে ৯০০ কোটি টাকা; ব্যাংকের সুদ বাবদ পরিশোধ করেছে প্রায় ৩৭০ কোটি টাকা আর বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেছে ২০০ কোটি টাকা।

তিন. বলা হয়নি, আদমজীর প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক বেকার আর মিলের আশে-পাশে কর্মরত ৩০ হাজার মানুষ কর্মহীন হলে তাদের পরিবার পরিজনসহ পাঁচ লাখ নির্ভরশীল মানুষের কী হবে?

চার. চিন্তা করা হয়নি, এলাকার পাঁচটি স্কুলের ছয় হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার কী ব্যবস্থা হবে?

পাঁচ. সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা একটুকুও ভাবেননি যে, আদমজীর পাট-চাহিদা-নির্ভর এক কোটি কৃষক পরিবারের কী হবে?

হয়. বিশ্বব্যাংকের ২৫ কোটি ডলার 'জুট সেকটর অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিটের' আওতায় বাংলাদেশে যখন পাটশিল্প বিলুপ্ত হচ্ছে ঠিক তখনই একই বিশ্বব্যাংক ২৫ কোটি ডলার সাহায্য দিচ্ছে ভারতের পাটশিল্প বিকাশে। ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক অন্যান্য সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ পাটকল ধীরে ধীরে বন্ধ করার কথা বলেছে। বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন হল, পাটকল ডাউন সাইজ করে উৎপাদন ক্ষমতা কমাও, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পাটকল বেসরকারি খাতে ছেড়ে দাও, কিছু কল বন্ধ কর (যুক্তি যা-ই হোক না কেন)। উল্লেখ্য যে, ঠিক আদমজী বন্ধ করার সময়ই ভারতের পশ্চিম বাংলায় নতুন ৪টি পাটশিল্প স্থাপন করে ১০ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। কেন? অর্থনীতি শাস্ত্রের কোন তুলনামূলক সুবিধের (comparative advantage) কারণে এমনটি হচ্ছে? নাকি রাজনীতি ও জাতীয় পুঁজির বিকাশ এসব সিদ্ধান্তে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে?

সাত. আদমজী জুট মিলের ৩০০ একর জমি ও কয়েক হাজার কোটি টাকার অস্থাবর সম্পদের কী হবে? এসব কি পূর্বপরিকল্পিত? আমরা এসবের কিছুই জানি না কেন? কে-কিভাবে-কতটুকু লুটপাট করবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

আট. সরকার ও দাতাগোষ্ঠী উভয়েই বলেছে, আদমজীতে বড় ধরনের দুর্নীতি হয়েছে। কে-কখন-কিভাবে দুর্নীতি করেছে গোপন রাখা হয়েছে এসব কথা। কাঁচাপাট ক্রয়, পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কী পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে, এ বিষয়ে কখনও কোনো তদন্ত করা হয়নি। তবে একথা সত্য যে, গত তিন দশকে যারা এসবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তারা আনুমানিক ১২ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ দুর্নীতি করেছেন। অথচ সরকারিভাবে লোকসানের পরিমাণ বলা হয়েছে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ আসলে আদমজীর কমপক্ষে ১০ হাজার ৮০০ কোটি টাকা লাভ হয়েছে। এসব তথ্য সত্য হলে আদমজী পাটকল লোকসানি হয় কিভাবে?

নয়. মাত্র ১৭০ কোটি টাকা খরচে আদমজী আধুনিকীকরণ ও বহুমাত্রিকীকরণ (BMRI) সম্ভব ছিল; কিন্তু তা না করে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হল কেন? বিশ্বব্যাপী যখন প্লাস্টিক ও পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন এ ধরনের সিদ্ধান্ত কেন? কার স্বার্থে?

দশ. সত্তরের দশকেও বাংলাদেশে ৮০ লাখ বেল পাট উৎপাদিত হত আর ভারতে উৎপাদিত হত ৫০ লাখ বেল। এখন ভারতে উৎপাদিত হচ্ছে বছরে গড়ে ৮০ লাখ বেল আর বাংলাদেশে তার অর্ধেক ৪০ লাখ বেল। অর্থাৎ আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের উৎপাদন কমছে অথচ ভারতে তা বাড়ছে আর সেখানকার পাটশিল্প বিকশিত হচ্ছে। এসবের অন্তর্নিহিত কারণ কী? কেন এদেশের শিল্প-কৃষি ধ্বংস করার এ মহোৎসব?

এগার. বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি খাতে ছোট-মাঝারি-বড় যে ৭০টি পাটকল আছে, পাটের অভাবে অনেক সময় সেগুলোর উৎপাদন ব্যাহত হয়। পাটসংকটের এ কারণ দুর্বোধ্য। কারণ এদেশে এখন বছরে ৪০ লাখ বেল পাট উৎপাদন হয়, আর পাটকলের চাহিদা প্রায় ৩০ লাখ বেল। উদ্বৃত্ত পাটের পরিমাণ ১০ লাখ বেল অথচ রপ্তানি হয় প্রায় ১৭ লাখ বেল। রপ্তানিযোগ্যতা ১৭ লাখ বেল হলে প্রায় ৫০ লাখ বেল উৎপাদন হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে না। কেন? এ প্রশ্নের সরকারি উত্তরটা কী? তা ছাড়া সরকারিভাবে নির্ধারিত মূল্য পাটের মান ভেদে মণপ্রতি ৩৩০ টাকা থেকে ৬৮০ টাকা। অথচ কৃষককে দেওয়া হয় ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে (অন্তত (২০০২) এ বছর তা-ই হয়েছে)। এ হিসেবে বাংলাদেশের পাটচাষি এ বছর ১০০ কোটি টাকার উর্ধ্ব লোকসান দেবেন। আর পাটের প্রকৃত উৎপাদনমূল্য বিচার করলে লোকসান ২০০ কোটি টাকার উর্ধ্ব হতে পারে। কৃষকের জন্য পাটের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত না করার কারণ হচ্ছে চোরাচালান উৎসাহিত করা, যে চোরাচালান বাংলাদেশের উৎপাদিত পাট ভারতের পাটকলগুলোর কাঁচামালের উৎস-বাহক হিসেবে কাজ করে। অতএব সমগ্র মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যব্যবস্থাপনার বিষয়টি একদিকে যেমন দেশজ পাট শিল্প ধ্বংসের কারণ, তেমনি অন্যদিকে চোরাচালান-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীসমূহকে উৎসাহিত করে এ দেশে কালো অর্থনীতির প্রসার ও ভারতের পাটশিল্পকে পরিপুষ্ট করার মাধ্যম।

বার. স্পষ্ট করে বলা না হলেও শোনা যাচ্ছে যে, পাটজাত পণ্য উৎপাদন নয়, ভারতে কাঁচামাল হিসেবে পাট রপ্তানি করাকেই শ্রেয় মনে করা হচ্ছে। অন্তত বিজিএমএ সূত্র বলছে যে, অতীতের তুলনায় ভবিষ্যতে ভারতে আমাদের কাঁচামাল রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে (১৯৯৯-২০০০ সালে পাট রপ্তানি হয়েছে প্রায় ১৪৮ কোটি টাকার সমপরিমাণ)। ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে প্রাপ্তস্থ অর্থনীতিকে কেন্দ্রের কাঁচামাল সরবরাহকারী ও কেন্দ্র উৎপাদিত ফিনিশড গুডস্-এর ব্যবহারকারী হিসেবে দেখা হত। আমরা কি পাট কেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক আমলের অর্থনীতিতে

ফিরে যাচ্ছি? আমরা কি এমন এক অবস্থার দিকে ধাবিত যখন ভারত, থাইল্যান্ড আর চীন থেকে পাটের বস্তা ও পাটজাত দ্রব্য কেনা ছাড়া আর উপায় থাকবে না?

তের. অর্থনীতির কোনো সূত্রই বলে না, মূল্য সংযোজনের (value addition) তুলনায় কাঁচামাল রপ্তানি শ্রেয়। পাটের ক্ষেত্রে এটা আরও সত্য কারণ পাট প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে আমাদের ৫০ বছরের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা আছে। আর সেইসঙ্গে পলিথিনসহ বিভিন্ন কৃত্রিম তন্তুর উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় পৃথিবীব্যাপী প্রাকৃতিক তন্তুর চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

চৌদ্দ. আদমজী পাটকল চালু থাকার সময়, এমনকি গত ২০০১ সালেও পাটের বাজার দর মণপ্রতি ৩৫০ টাকা থেকে ৫৫০ টাকার মধ্যে ছিল। অথচ এখন তা ১২০ টাকা থেকে ১৭০ টাকার মধ্যে (এলাকা, মান ও সময়ভেদে) উঠানামা করছে। জমির মূল্য হিসাবে ধরলে পাটের মণপ্রতি উৎপাদন ব্যয় হয় ৬০০ টাকা থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত, আর জমির দাম বাদ দিলে ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকার মধ্যে। সুতরাং পাট বিক্রি করে কৃষক এখন আর উৎপাদন খরচও পোষাতে পারছে না। পাটকল বন্ধ হলে পাটচাষির অবস্থার আরও অবনতি হবে, ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্প ধ্বংস হবে এবং ‘সোনালি আঁশ গলার ফাঁস, কৃষকের এখন হাঁসফাঁস’ অবস্থা হবে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী একথা না বলে বলেছেন, ‘পাট হবে নতুন সহস্রাব্দের তন্তু’। এসব বৈপরীত্য কেন?

অকথিত তথ্য আর পাট কেন্দ্রিক বিভিন্ন বৈপরীত্যের তালিকা আর না বাড়িয়ে যা বলা হয়েছে ও যা বলা হয়নি এ দু’টো মিলিয়ে দেখলে এটুকু দুর্বোধ্য নয় যে, পাটসহ সব ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের উন্নয়নবিরোধী একটি রাজনৈতিক-অর্থনীতি যথেষ্ট সক্রিয়, যেখানে বিশ্বপুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষার্থে দাতা-গোষ্ঠীর সম্ভৃষ্টি ও পাট-প্রতিযোগী অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দেশসমূহের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ সংরক্ষণই মূল লক্ষ্য।

শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ: অতীত ও বর্তমানের নিরিখে

মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের তোড়ে এদেশে ইতোমধ্যে সৃষ্ট অনুৎপাদনশীল খাত এবং নিকৃষ্ট পুঁজির বিকাশশর্ত পরিপুষ্ট হচ্ছে। এ কারণেই শিল্পায়নের সম্ভাবনা কাঠামোগতভাবে রুদ্ধ। লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে এদেশ ছিল প্রকৃতই কৃষিপ্রধান মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬০ ভাগ তথা দেশের ৮০ ভাগ মানুষ ছিল কৃষিনির্ভর। তিন দশক পর এখন কৃষির অবদান জাতীয় উৎপাদনের ২৫ ভাগ আর

কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা ৫০ ভাগ। অর্থাৎ গত তিন দশকে গ্রামীণ মানুষের আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ অকৃষি-কর্মকাণ্ড নির্ভর হয়েছে। অর্থনীতিবিদদের অনেকেই এটাকে উন্নয়নের মাপকাঠি বলে মনে করছেন। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, গত তিন দশকে জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের অবদান আদৌ বাড়ে নি বললেই চলে (৮ থেকে ১০%)। আর শিল্পখাতের যেসব অংশে অপেক্ষাকৃত বেশি প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, সেগুলো প্রকৃত শিল্পখাত কি না (প্রশ্নটি জোসেফ কেনেথ অ্যারো উত্থাপন করেছেন^১), তা তলিয়ে দেখতে হবে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মৌলিক শিল্প (বা mother industry, যেমন জয়দেবপুরের মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি অথবা চট্টগ্রামের ইস্পাত কারখানা ও জি এম প্লান্ট) সহ দেশজ কাঁচামালনির্ভর শিল্প (পাটকল) বিলুপ্ত হচ্ছে, অথচ বিদেশি কাঁচামালনির্ভর হালকা শিল্প (যেমন দর্জিশিল্প, বা তৈরি পোশাকশিল্প অথবা জানালা দরজার হিল বানানোর কারখানা অথবা প্রযুক্তি হস্তান্তরের নামে গছানো পরিবেশ বিপর্যয়কারী শিল্প), যেখানে মূল্য সংযোজন ও সামাজিক উপযোগ অত্যন্ত কম, বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং সামগ্রিক কাঠামোটিই এমন যেখানে এমন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না যা সুদৃঢ় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভিত্তির নির্দেশক। শিল্পবিকাশের বিপরীতে যা দ্রুতগতিতে বেড়েছে ও বাড়ছে তা হল সেবা খাত। যেখানে জমি-সম্পত্তি ক্রয়, নির্মাণকাজ, রিয়াল এস্টেটসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা মিলে একক বৃহত্তম এই খাত মোট জাতীয় উৎপাদনে ৫০ ভাগ অবদান রাখছে। এতে দাঁড়ালটা কী? কৃষি ও শিল্প উৎপাদনশীল খাতদুটো পিছে পড়ল, আর জায়গা দখল করল অপেক্ষাকৃত অনুৎপাদনশীল সেবা খাত। সম্পদবানরা কেন যেন উৎপাদনশীল কৃষি-শিল্পে বিনিয়োগের পরিবর্তে জমিজমা কেনা আর বাড়িঘর নির্মাণ ও ব্যবসাপাতিতে মনোনিবেশ করলেন। অর্থাৎ বিকশিত হল এক ধরনের নিকৃষ্ট পুঁজি যেখানে বিনিয়োগ বাড়বে কিন্তু উৎপাদনশীল বিনিয়োগ স্থবির হয়ে যাবে এবং এর সঙ্গে নিবিড় সহসম্পর্ক থাকবে বিদেশি সাহায্যনির্ভরতা, কালোটাকার দাপট এবং এসবের সহায়ক রাজনৈতিক কাঠামোর।

কৃষিকে শিল্পায়নের ভিত্তি বলা হয়। অথচ শিল্পায়নের ভিত্তি হিসেবে কৃষিকে কখনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার পরে কৃষি উৎপাদন নিয়ে বাগাড়ম্বর হয়েছে অনেক। কৃষিতে মোট উৎপাদন (ধানের) বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ; তবে মাথাপিছু উৎপাদন স্থবির। ১৯৭৩-৭৪ সালে মাথাপিছু চালের উৎপাদন ছিল ১৪০ কেজি, ৩০ বছর পরে এখন তা ১৩৮ কেজি। আমন ও আউশের জমি কমেছে, বেড়েছে বোরো চাষ। উৎপাদনশীলতা যে হারে বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হারে বেড়েছে সারের ব্যবহার (৮ গুণ) ও সারের দাম (১৪ গুণ)। উৎপাদন ব্যয় যা বেড়েছে তাতে হিসাব কষে বোঝা দুষ্কর যে, কৃষক এখনও কেন কৃষিকাজ

করছেন। কৃষিপণ্যের বাজারমূল্য প্রকৃত উৎপাদনব্যয় মেটায় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সম্ভবত অন্য কোনও বিকল্প থাকলে এদেশের কৃষক কৃষিকাজ ছেড়ে দিতেন। এখানে ভর্তুকি উচ্ছেদের বিতর্কে না জড়িয়েও শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, যারা ভর্তুকি উচ্ছেদ করতে পরামর্শ দিচ্ছেন তারা কিন্তু নিজেদের দেশে কৃষিভর্তুকির প্রধান প্রবক্তা : যুক্তরাষ্ট্রে বছরে কৃষিভর্তুকির পরিমাণ ২০ বিলিয়ন ডলার আর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে মোট কৃষিভর্তুকির পরিমাণ সমগ্র সাব-সাহারান আফ্রিকার সকল দেশের সম্মিলিত মোট জাতীয় আয়েরও বেশি।

যে ‘সবুজ বিপ্লব’ কৃষিতে অধিক ফলন নিশ্চিত করেছে, সে বিপ্লবই কিন্তু অবলুপ্তি ঘটিয়েছে অনেক প্রজাতির ধানের, হ্রাস করেছে প্রাকৃতিক উর্বরতা, বিনষ্ট করেছে অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদ (পৃথিবীর চতুর্থ শীর্ষ স্থান থেকে এখন ৮৫তম স্থানে), আমদানি করেছে নতুন নতুন পোকামাকড়, প্রাণবৈচিত্র্য ও জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট করেছে। আর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রযুক্তিগত বিষয়ে অনেক কিছু বলা হলেও কৃষিসংস্কারের (agrarian reform অর্থে) বিষয়টিকে সব সময় অবহেলা অথবা ভয় করা হয়েছে। অথচ এ দেশে, অন্যকিছু বাদ দিলেও, ৩৩ লাখ একর যে খাস কৃষিজমি ও জলাশয় আছে, যা দরিদ্র মানুষেরই ন্যায্য প্রাপ্য, সে বিষয়ে কোনও সরকারই কখনও আন্তরিক ছিলেন না। একদিকে কৃষিজমির মালিকানার পুঞ্জিকরণ আর অন্যদিকে খাস জমির জবরদখল এ নিয়ে ক্ষমতাবানরা গ্রামীণ ক্ষমতাকাঠামোতে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। গত ৩০ বছরে গ্রামীণ ক্ষমতাবান ও শহুরে ক্ষমতাবানদের মধ্যে শক্তিশালী আঁতাতও সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সূত্রে। এ আঁতাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে স্থানীয় সরকারের আসন্ন নির্বাচনে। নিকৃষ্ট পুঁজির বিকাশে এটাও আরেকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাংলাদেশী সংস্করণ।

গত তিন দশকে ধানের উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত হয়নি। গুটিকয়েক মানুষের হাতে কৃষিসম্পদের পুঞ্জিভবন, গ্রামীণ অর্থনীতিতে লুটেরা-টাউট শ্রেণির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতার কারণে কৃষি-নির্ভর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ভিক্ষুকায়ন ও নিঃস্বায়ন (pauperization) প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। নিঃস্বায়িত কৃষক বাধ্য হয়ে অভিবাসিত হয়েছেন এসেছেন শহরে, প্রথমে একা, আস্তে আস্তে এনেছেন পরিবার-পরিজন। এদিকে শহরে গড়ে ওঠেনি শিল্প কলকারখানা। অতএব গ্রাম থেকে শহরে আসা নিঃস্ব কৃষককে কাজের সন্ধানে ইনফর্মাল সেক্টরে নিম্নমজুরির কাজে যোগ দিতে হয়েছে, আর বাসের জন্য বেছে নিতে হয়েছে বস্তি। সুতরাং তথাকথিত নগরায়ন আসলে কিছুই নয়, এটা আক্ষরিক অর্থেই বস্তিয়ায়ন (slumization, not urbanization⁴)। উল্লেখ্য যে, গ্রামীণ ভিক্ষুকায়ন ও নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি এমনটি থাকলে ২০২০ সালে বাংলাদেশে শহুরে

জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯ কোটি, যা আমাদের ১৯৮১ সালের মোট জনসংখ্যার সমান। আর এই ঢাকা শহরেই ২০১০ সালে জনসংখ্যা হবে প্রায় দুই কোটি (বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী), যার মধ্যে এক কোটি বাস করবে বস্তিতে। দুর্ভাগ্যবশত ফাঁদে পড়া লুটেরা অর্থনীতিতে নিকৃষ্ট পুঁজি বিকাশের এটাও একটি প্রতিফল। এখানে অনেক কিছুই ঘটবে কিন্তু দেশজ অর্থনীতির ভিত্তি মজবুতকরণ-উদ্দিষ্ট-শিল্পায়ন ঘটবে না।

এদেশের শিল্পের ইতিহাস পুরনো নয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রণে যে শিল্পখাত গড়ে ওঠে তা তাদের জন্য লাভজনক ছিল। জাতীয়করণ করার ফলে ৭টি সংস্থার অধীনে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতই (অনেকেই এটাকে সমাজতন্ত্রের সমার্থক বলে মনে করেন) হয়ে দাঁড়াল শিল্পের মূল ধারা। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের মূল ধারা বিভিন্ন কারণে বিকাশ লাভ করেনি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি খাতে মূলধন গঠন প্রক্রিয়ার সকল বাধা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়। গত চারটি শিল্পনীতিতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের প্রাধান্য নিম্ন পর্যায়ে আনতে হবে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের সকল বাধা দূরীভূত করতে হবে এবং সরকারিভাবে সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধে নিশ্চিত করা হবে। আর সেইসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত অ্যাডজাস্টমেন্ট নীতিমালাসহ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাত সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের ফর্দ এসব নিশর্তকরণে জোর সুপারিশ করেছে। এসব সুপারিশের মর্মবস্তু হল জাতীয় পুঁজির বিকাশ রুদ্ধ করতে প্রথমে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প বন্ধ হবে অথবা বিরাস্ত্রীয়করণ হবে, তারপর বিরাস্ত্রীয়কৃত শিল্প বন্ধ হবে; আর এর মাঝে জাতীয় সম্পদ লুটপাট হয়ে যাবে। অথচ বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ প্রধান এখনও বলছেন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাত নানা ধরনের অর্থনৈতিক বিকৃতি (economic distortions) সৃষ্টি করে যা বেসরকারি খাতনির্ভর প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে।^৫

প্রকৃত অর্থে গত তিন দশকে শিল্পবিকাশে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ: রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাত অর্থই লুটপাট, ক্ষমতার অপব্যবহার, ভর্তুকিনির্ভরতা, নিম্নউৎপাদনশীলতা, অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। বিভিন্ন সময় সরকার আর (বিশেষ করে ক্ষমতা গ্রহণের আগে এবং পরপর) দাতাগোষ্ঠী এসব বললেও এসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমলা-ব্যবস্থাপক উচ্ছিষ্টভোগী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের চিহ্নিত করা ও শাস্তির প্রয়োজনীয়তা কেউই বোধ করেননি।

বেসরকারি খাতের বিকাশ মানেই যতটা না নতুন বেসরকারি খাতের উদ্ভব তার চেয়ে বেশি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের বিরাস্ত্রীয়করণ, যেখানে বেসরকারি মালিকদের (আমলা-রাজনীতিবিদের যোগসাজশে) মূল উদ্দিষ্ট হল হাজার হাজার কোটি টাকার

রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট করা, শিল্পের বিকাশ নয়। বিষয়টির সর্বশেষ সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী বন্ধ করে কমপক্ষে এক কোটি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থহানি ঘটানো হয়েছে। রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিরাস্ট্রীয়করণ সম্পর্কিত অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সাম্প্রতিক গবেষণা ফলাফল স্পষ্টভাবেই দেখায় যে, এদেশে সরকার প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে রাষ্ট্রীয় খাতের কোনও ধনাত্মক ভূমিকাই স্বীকার করে না। এ অস্বীকৃতি ভবিষ্যতের শিল্পবিকাশে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে; সামষ্টিক অর্থনীতিতে বিরাস্ট্রীয়করণের ধনাত্মক তেমন অভিঘাত নেই; রাষ্ট্রীয় শিল্পের বিরাস্ট্রীয়করণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা হ্রাস করেনি; রাষ্ট্রীয় খাত সবসময় সরকারি সম্পদ বিনষ্ট করে এ কথা সত্য নয়; বিরাস্ট্রীয়করণ পরবর্তী কর্পোরেশনসমূহে আর্থিক লোকসান বৃদ্ধি পেয়েছে; বিরাস্ট্রীয়করণের ফলে শিল্পের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির পরিবর্তে কারখানা বন্ধ হয়েছে ও কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে; শিল্পবিকাশে রাষ্ট্র ও সরকারের ভূমিকা, অঙ্গীকার ও ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পের বিকাশ কেন্দ্রিক যে বিপরীতধর্মী ও অস্বচ্ছ নীতি নির্দেশনা দেখা যাচ্ছে তা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে মারাত্মক ঋণাত্মক প্রভাব ফেলবে। অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বিশেষ গুরুত্ববহ মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হল:

The available evidence on the experience with privatisation suggests that enterprise closure, disemployment, possible accumulation of liabilities with the banks and possible revenue loss may have to be taken into account as part of the price we pay to improve profitability and reduce claims on the public exchequer..... However, the positive macro-economic impact of privatisation appears to be far from evident. Reports on the profit and loss accounts of the Sector Corporations from which SOEs are being divested, indicate that in the four years, 1979/80-1982/83, prior to the great wave of privatisation under President Ershad, total profits for 6 sector corporations added up to Tk. 1.5 billion and net profits were earned by the SOEs in three out of these 4 years (World Bank, 1985). In 1982/83, the last year prior to the big privatisations, SOE profits amounted to Tk. 912 million. This does not suggest that SOEs in Bangladesh were always a net drain on the public purse. In 1995/96, at the end of the BNP regime and the privatisation of 131 enterprises with a selling value of 1.8 billion, corporation losses increased to Tk. 3.2 billion (IRBD 1996). This suggests that a central argument for SOE privatisation, the reduction of macro-economic imbalances, appears to be invalid, at least in the context of Bangladesh.

During this period of divestiture, the volume of bank defaults to the commercial banks has also increased. This suggest that reduction of the size of the state sector and expansion of the private sector have brought no relief to the banking system just as it has brought no relief to the exchequer.

With a few exceptions, privatised units have not significantly improved performance but have contributed to enterprise closures and disemployment. Private sector default to the banks has increased exponentially whilst private banks have been characterised by more adverse loan portfolios than the NCBs and have been maledicted to large scale insider trading.....

The declared philosophy of the newly constituted Privatisation Board is to get SOEs from the public domain as fast as possible. This approach indicates some indifference as to whether such units, once privatised, are closed down these units will have to account for their accumulated liabilities to the banking system.

Such an approach to privatisation implies a certain innocence of vision in charting Bangladesh's future development landscape and the industrial strategy to be located within this design. In the prevailing policy vacuum, the current approach to privatisation thus appears to have introduced an entirely new logic to the divestiture process.....

A further hazard to Bangladesh's development prospects arises from the implications of a policy which envisages no future role for public enterprise in the manufacturing sector.....

By the time of the expiry of the Multi Fibre Agreement (MFA) in 2005, Bangladesh will have to establish backward linkages with a modernised textile industry which can produce the yarn and fabric needed to service Bangladesh's RMG sector. Unless Bangladesh can convert its RMG sector from a two-stage processing industry to a three-stage enterprise, after 2005, the rules of origin clause in the WTO could deny Bangladesh's RMG exports entry to a large part of their traditional markets in Europe and North America. This involves putting in place, within Bangladesh, a domestic manufacturing capacity to produce 2 billion metres of fabric. This involves setting up around 375 new weaving mills and 290 new spinning mills, involving an investment of around US\$ 5 billion. On all counts, making of most optimistic assumptions, Bangladesh's private entrepreneurs expect to mobilise only a fraction of such resources for

which they will need to assume the risk taking burden for realising such a volume of investment. In such circumstances should the state remain idle and make no attempt to put any productive capacity in place, even if this means a loss of RMG markets to India and China who already preside over large integrated textile industries and are planning major investments for the post-MFA era? The failure to address this dilemma provides the source of the present contradictions inherent in Bangladesh's privatisation policy. This could have potentially fatal implications for Bangladesh's future development" (Rehman Sobhan, Privatisation in Bangladesh: An Agenda in Search of a Policy, CPD Occasional Paper Series, August 2002: 16-19).

* শিল্পখাতে সরকারি ভূমিকা ও সামগ্রিক পরিবেশ কখনও শিল্পসহায়ক ছিল না। আশির দশকে যখন বলা হল যে, বাণিজ্য ও সেবা খাতে বিনিয়োগের তুলনায় বেসরকারি শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে ৪ গুণ, তখন বাস্তবে ঘটল ঠিক উল্টোটি। বিকশিত হল বাণিজ্য ও সেবা খাত; আর শিল্পখাতের মধ্যে রফতানিমুখী হালকা প্রযুক্তিনির্ভর শ্রমঘন ঠিকাদারি গোছের দোকানদারি শিল্প। নিকৃষ্ট পুঁজিবিকাশের এ আর এক নমুনা।

* বিকাশের ধারাটি আমাদের এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, এখন শিল্পের চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য লাভজনক, আর ব্যবসার চেয়ে চোরাচালান লাভজনক। সুতরাং পুঁজির গতিমুখ চোরাচালানমুখী- শিল্পায়নমুখী নয়।

* শিল্পখাতে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ শিল্পমুখী কিনা সে কথাও প্রশ্নসাপেক্ষ। বিদেশি পুঁজির বড়জোর ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ হচ্ছে শিল্পখাতে, আর কমপক্ষে ৭০ শতাংশ ব্যবসায়ে। সেইসঙ্গে মারপ্যাচের বিষয় হল বিদেশি পুঁজি বিদেশাগত কি না (নাকি পূর্বে বিনিয়োজিত পুঁজির আয়), মূলধনি দ্রব্যাদির আমদানি কতটুকু ইত্যাদি। প্রশ্নগুলো উত্থাপন করা জরুরি অন্তত এজন্য যে, ভবিষ্যতে তেল-গ্যাস খাতে যে বিদেশি বিনিয়োগ হতে পারে তার ৮০-৯০ ভাগ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে এ নিশ্চয়তা কোথায়? বৈদেশিক পুঁজির সরাসরি বিনিয়োগ বছরে প্রায় ১৬ কোটি ডলার (দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন নেপাল ছাড়া) অথচ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১৮৮ কোটি ডলার। আশাব্যাঞ্জক ঘটনা, কিন্তু হুন্ডিসহ বিভিন্ন মুদ্রাপাচার সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের শক্ত ভিত্তি- এ ক্ষেত্রেও দুর্বৃত্তায়ন বৃদ্ধি করেছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্ভাবনাও ক্ষীণ।^৬ পাশাপাশি একথাও

নির্দিধায় বলা যায় যে, নিজস্ব অর্থনীতির ভিত্তি (শিল্পায়ন যার অন্যতম প্রধান মানদণ্ড) দুর্বল হলে বৈদেশিক বিনিয়োগও অলাভজনক হতে পারে ।

* শিল্পবিকাশে সরকারি অবহেলার সবচে' উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল ক্ষুদ্রশিল্প যা এ দেশের নিজস্ব, সৃজনশীল, গতিশীল । এসব শিল্প পারিবারিক শ্রমভিত্তিক এবং স্থানীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম । অথচ এরা সব ধরনের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত । অবাধ আমদানি যেমন এসব ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য ক্ষতিকর, তেমনি মুদ্রা-অবমূল্যায়নের ফলে যে রফতানি হয়, সেক্ষেত্রেও এদের ক্ষতি । বিশ্বায়নের তোড়ে দেশজ এসব ক্ষুদ্র পারিবারিক সৃজনশীল শিল্প চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার আশঙ্কা আছে সেক্ষেত্রে এখন থেকে ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিপর্যয় অনিবার্য ।

* আমাদের দেশে শিল্পখাতে গঠনগত পরিবর্তনের ফলে রপ্তানিবাণিজ্যে পরিবর্তন ঘটেছে । রপ্তানি কমেছে প্রাথমিক পণ্যের, আর বৃদ্ধি পেয়েছে সংকীর্ণ ভিত্তির প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্যের । রপ্তানি আয়ের উৎসগত দিক থেকে পাট, পাটজাতদ্রব্য ও চা-এর বিলুপ্তি ঘটেছে বলা চলে; আর বৃদ্ধি পেয়েছে তৈরি পোশাক (যেখানে আবার মূল্য সংযোজন সর্বনিম্ন) খাতে । অর্থাৎ তৈরি পোশাকশিল্পকে (টেইলারিং শপ) শিল্প খাতে না ধরলে রপ্তানি আয়ে শিল্পের অবদান হ্রাস পাবে । শুষ্ক ও কোটামুক্ত বিশ্বায়নে অগ্র-পশ্চাদ্ সংযোগ শিল্পের অনুপস্থিতিতে আমাদের তৈরি পোশাকশিল্প ভিত্তিক রফতানিবাণিজ্যে যে বড় ধরনের ধস নামতে পারে (২০০৪-এর পরে), এ বিষয়ে ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ আছে । গত তিন দশকে আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে বেসরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় এবং সরকার আমদানি-রফতানির বিভিন্ন বিধিনিষেধ শিথিল বা প্রত্যাহার করায় একদিকে দেশজ শিল্পের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অন্যদিকে চোরাচালান আর ভোগ্যপণ্য নির্ভর আমদানি উৎসাহিত হয়েছে । ফলে কৃষির বিকাশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিষয়গুলো গুরুত্বসহ ভাবতে হবে । কারণ বিশ্বায়নের যুগে একদিকে যেমন স্ব-স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাণিজ্যের লড়াইটা সমাসন্ন তেমনি অন্যদিকে ঋণ-সাহায্য প্রবাহ ক্রমহ্রাসমান (জিডিপি-র অনুপাতে) ।

বিকাশমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোটিই মানবকল্যাণবিমুখ এবং শিল্পায়নবিরোধী

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ক্ষয় হয়েছে, কিন্তু চিরাচরিত পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক বিকশিত হয়নি; বিকশিত হয়েছে সবধরনের নিকৃষ্ট পুঁজি

যা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ভূমিকা রাখে না। একচেটিয়া পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের মুক্তবাজার এদেশে জাতীয় পুঁজিভিত্তিক শিল্পায়নপ্রক্রিয়া ত্বরান্বয়ে প্রতিবন্ধক। গত তিন দশকে এদেশে জাতীয় আয় (মোট ও মাথাপিছু) বৃদ্ধি পেয়েছে; সরকারি হিসাবে দারিদ্র্যের আপাতন কমেছে; বেড়েছে শিক্ষার হার; হ্রাস পেয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার; শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে শিশুদের টিকা দান; পরিবার পরিকল্পনা ব্যবহারকারী বেড়েছে; মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সচলতা (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে) বৃদ্ধি পেয়েছে; জীবনের আয়ুষ্কাল বেড়েছে— এসব বিষয়ে আমার দ্বিমত নেই, দ্বিমত আছে এসব নিয়ে গুণকীর্তনে। কারণ এগুলোর অধিকাংশের সঙ্গে সরকারি সচেতন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই; এগুলোর অধিকাংশই সময়ের ব্যাপ্তিতে অতি সাধারণ প্রক্রিয়া মাত্র; আর এগুলোর কোনোটিই কার্যকারণগতভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের মূল প্রবণতাসূচক নয়।

কাঠামোগত রূপান্তরের নিরিখে গত তিন দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি যা দিয়ে বলা যাবে যে, মানবকল্যাণমুখী স্বাধীনতার চেতনা বাস্তবায়িত হয়েছে। সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ ভেদ-হীন মানুষ সৃষ্টিই ছিল স্বাধীনতার মূল আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার দূরত্ব ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান। আমাদের সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব ‘মৌলিক চাহিদা’ পদ্ধতিতে হিসাব করলে দারিদ্র্য বিমোচনে জাতীয় ক্ষেত্রে সময় লাগবে ৩১০ বছর, আর গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে সময় লাগবে ৯০৯ বছর। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ভেতর আর যাই থাক, গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে ১০০০ বছরের কর্মসূচির কথা ছিল না। প্রশ্নাতীত প্রশ্ন সমস্যাটি কোথায়? নিশ্চয়ই স্বাধীনতার গত ৩০ বছরে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বড় মাপের এমন কোনো গলদ ছিল যা এদেশে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে দেয়নি। নিশ্চিত করেনি কৃষির উন্নয়ন ও দ্রুত শিল্পায়নের ভিত্তি। সম্ভবত কাঠামোগত রূপান্তর যা ঘটেছে তা মানবকল্যাণবিমুখ ও শিল্পায়নমুখী নয়।

দুই অর্থনীতির বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে এ কথা সত্য। তবে গত তিন দশকে বিকাশের ধারা ১৪ কোটি মানুষের আমাদের দেশকে সম্ভবত সুস্পষ্টভাবে দু’ভাগে বিভাজিত করেছে :

* প্রথম ভাগে আছেন সংখ্যালঘু ক্ষমতাধর মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে বড়জোর ১০ লাখ; আর

* দ্বিতীয় ভাগে আছেন সংখ্যাগুরু ক্ষমতাহীন মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে ১৩ কোটি ৯০ লাখ।

সুতরাং রাজনৈতিক-অর্থনীতির মারপ্যাঁচে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক অবস্থা যেখানে ১০ লাখ ক্ষমতাধরের বিপরীতে আছেন ১৩ কোটি ৯০ লাখ ক্ষমতাহীন, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত বঞ্চিত মানুষ। প্রকৃত অর্থে এই বিশাল ক্ষমতাহীন মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি অথবা ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতায়ন অথবা inclusion of the excluded— এ বিষয়ে অন্তত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে সচেতন কোনো প্রয়াস কখনও নেওয়া হয়নি (পরিকল্পনা দলিল দস্তাবেজে যাই থাক না কেন)। উল্টো, ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা বৃদ্ধির বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল ও আছে এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, তা আরও বহুদিন বহাল থাকবে। সামগ্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণ তা-ই নির্দেশ করে।

সরকারে নির্বাচিত ও অনির্বাচিত নির্বিশেষে যারাই ছিলেন, সকলেই প্রমাণ করতে সচেষ্ট যে, উন্নয়নই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য, তারা দারিদ্র্য বিমোচন করেছেন আগের তুলনায় অধিক। দাবিটি মিথ্যা, যথেষ্ট প্রতারণামূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ‘উন্নয়ন’ হয়েছে, তবে তা সংখ্যাগরিষ্ঠের নয়, ঐ ১০ লাখ ক্ষমতাধরের। অর্থাৎ যে ‘উন্নয়ন’ হয়েছে তা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। Excludd-রা সব সময় excluded-ই রয়ে গেছেন। আর excluded-দের উন্নয়নের ধারায় include করার প্রয়াস ক্ষমতাধরদের আর্থ-সামাজিক স্বার্থসংশ্লিষ্টতার কারণেই বৈরী অন্তর্ভুক্তিকরণ (adverse inclusion)-এ রূপান্তরিত হয়েছে। তা-ই যদি না হবে তাহলে প্রায় ১৪ কোটি মানুষের এদেশে—

* আয়ের অথবা খাদ্য গ্রহণের নিরিখে ৬-৭ কোটি মানুষ এখনও দরিদ্র কেন? (মৌলিক চাহিদার মূল্যমানের নিরিখে দারিদ্র্যের নিম্নরেখার মাপকাঠিতে সংখ্যাটি আরো ২-৩ কোটি বেশি)

* প্রায় ৮ কোটি মানুষ এখনও কার্যত নিরক্ষর এবং প্রকৃত শিক্ষা-সুযোগ বঞ্চিত— কেন? (যদিও এ অধিকার সম্পর্কে সংবিধান সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা দেয়)

* প্রায় ৯ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য-সেবার সুযোগ বঞ্চিত— কেন?

* প্রতিবছর যে ৬ লাখ মানুষ এদেশে মৃত্যুবরণ করেন তার অর্ধেকই ৫ বছরের শিশু কেন? আরও লজ্জাজনক কথা, ৫০% ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ দারিদ্র্য- উদ্ভূত ব্যাধি নিউমোনিয়া (যার চিকিৎসাব্যয় মাত্র ১৩ টাকা), ডায়ারিয়া (১৭ টাকা), হাম

(১২ টাকা), ও যক্ষ্মা (৯০০ টাকা)। উল্লেখ্য, যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান চতুর্থ শীর্ষে।

* প্রায় তিন কোটি স্বাক্ষর-নিরক্ষর মানুষ (যাদের অধিকাংশই যুবক) এখনও বেকার কেন?

* প্রায় ১১ কোটি মানুষ এখনও বিদ্যুৎসুবিধাবঞ্চিত কেন?

* সীমিত আয়ের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ প্রকৃত অর্থেই দুর্দশাগ্রস্ত কেন?

* দেশের অধিকাংশ নারী, শিশু ও প্রবীণ নিশ্চিতভাবেই বঞ্চিত কেন?

* ব্যাপক জনগোষ্ঠী নিশ্চিতভাবেই উত্তরোত্তর অধিক হারে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছেন কেন?

* ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা চিরস্থায়ী হচ্ছে কেন? (শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাঁচে ইতোমধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৫০ লাখ মানুষের ২০ লাখ একর ভূ-সম্পত্তি জবরদখল হয়েছে যার বর্তমান বাজারমূল্য ১৯০ হাজার কোটি টাকা। এই জোর-দখলকারীরা আমাদের মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৪ শতাংশ (ক্ষমতাবান/ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীভুক্ত)। আর ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসীরা কি অর্থনীতি, কি শিক্ষা, কি স্বাস্থ্য সবদিক থেকেই প্রান্তস্থ)।

এসব বঞ্চনা-মুক্তির নামই যদি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তি হয়, সেক্ষেত্রে গত তিন দশকে অর্থনৈতিক ইতিহাসকে মানবকল্যাণে ব্যর্থতার ইতিহাস হিসেবে অভিহিত করলে বিশেষ ভুল হবে না। এ ব্যর্থতা শিল্পায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। এ ব্যর্থতা শিল্পায়নবিরোধী। এ হেন অবস্থায় সুন্দর-সুস্থ ভবিষ্যৎ সকলেরই কাম্য; কিন্তু সম্ভবত বিজ্ঞানসম্মত কোনো প্রক্ষেপণই সেদিকে সায় দেয় না।

গত তিন দশকে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাহীন মানুষ আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার সূচক-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান যা-ই বলুক না কেন জীবন পরিচালনে অতিশয় কষ্টক্লেশ করেছেন, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু একই সময়ে কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি, কি শিক্ষা সংস্কৃতি সর্বত্র এক আত্মঘাতী লুণ্ঠন সংস্কৃতি (culture of plundering) জেঁকে বসেছে। এই লুণ্ঠন সংস্কৃতির চরিত্র-নিয়ামক হল কালোটাকা, সন্ত্রাস, পেশিশক্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, কুশাসন-

অপশাসন, দমন-নিপীড়ন ইত্যাদি। আমরা জানি, লুণ্ঠন পুঁজিবাদ বিকাশে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে; কিন্তু এ-দেশে আত্মঘাতী লুণ্ঠনপ্রক্রিয়া জাতীয় পুঁজিবিকাশে ব্যর্থ হয়েছে। তা না হলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি বন্ধ হবে কেন? কেন বন্ধ হবে দেশজ ব্যক্তিখাতের কল-কারখানা? কেন ব্যক্তিখাতের শিল্পপ্রতিষ্ঠান অনুৎসাহিত হবে?

সামাজিক-রাজনৈতিক গণমুখী রূপান্তর বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণে আশাবাদ ব্যক্ত করা কঠিন, তা স্বাধীনতাগোর অর্থনীতির হরিলুট সংস্কৃতির কয়েকটি দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলেই সহজে বোঝা সম্ভব। বাংলাদেশের অর্থনীতি আসলে এক গভীর ‘দুর্ভ্রায়নের ফাঁদে’ (criminalization trap) পড়েছে। দুর্ভ্রায়নের এ কাঠামোতে দেশজ শিল্পায়ন সম্ভাবনা যে নেই বললেই চলে, তা দুর্ভ্রায়নের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই সহজে অনুমান করা যায়:

* অর্থনীতির দুর্ভ্রায়ন (criminalization of economy) জিইয়ে রাখতে ও অর্থনীতিকে অধিকতর দুর্ভ্রায়িত করার স্বার্থে রাজনীতির দুর্ভ্রায়ন (criminalization of politics) হয়েছে। অর্থনৈতিক দুর্ভ্রায়ন ফাঁদ রাজনৈতিক দুর্ভ্রায়নের কার্যকরী চাহিদা (effective demand) বৃদ্ধি করেছে; আর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দুর্ভ্রায়ন অর্থনৈতিক দুর্ভ্রায়নের ফাঁদকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করছে। দুর্ভ্রায়নের এ ফাঁদ শিল্প-বিকাশ সহায়ক নয়।

* গত তিন দশকে বছরে সরকারিভাবে যে ১৮০ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য এসেছে, তার ৭৫% লুণ্ঠন করেছেন অর্থনীতি-রাজনীতির দুর্ভ্রায় গোষ্ঠী। ফলে ক্ষমতাধররা অধিকতর ক্ষমতাবান হয়েছেন আর ক্ষমতাহীনদের অক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষমতাহীনরা শিল্পবিকাশ চাইতে পারেন, কিন্তু ক্ষমতাবানরা যে নিকৃষ্ট পুঁজির বাহক সে পুঁজি শিল্পায়নবিরোধী।

* ক্ষমতাবানেরা এক ধরনের নিকৃষ্ট পুঁজির (ব্রিফকেস পুঁজি বা কমিশন/দালাল পুঁজি) মালিক হয়েছেন, যে পুঁজি অনুৎপাদনশীল, উৎপাদনশীল বিনিয়োগে যার কোনোই ভূমিকা নেই। সুতরাং শিল্পায়ন প্রায় অসম্ভব।

* ক্ষমতাবানেরা এখন কালো অর্থনীতির একটা বলয় সৃষ্টি করেছেন, যে দুশ্চক্রের বছরে ৬০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালোটাকার সৃষ্টি হয়, যা জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ। এ বলয়ে যাদের অবস্থান তারাই আবার ৩০ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি (লুণ্ঠনসংস্কৃতিতে যুক্ত হয়েছে ঋণখেলাপি সংস্কৃতি)। এরাই

বছরে ১১ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতিতে জড়িত; এরাই বছরে কমপক্ষে ২০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ মুদ্রা পাচার (money laundering) করছেন। এরাই বিরাস্থীয়কৃত শিল্পের মালিক হতে আগ্রহী, তবে তা শিল্পবিকাশে আগ্রহের কারণে নয়; এরাই অর্থনীতির স্থবিরতার জন্য দায়ী। এরাই আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে এবং/অথবা তাকে ব্যবহার করে সরকারকেও ঋণখেলাপিতে রূপান্তরিত করেছেন। এরাই রাষ্ট্রক্ষমতা ও সরকারকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক বিকৃতি সৃষ্টি করেন যা অপচয় বৃদ্ধিতে সহায়ক। এসব কালো অর্থনীতির কর্মকাণ্ড শিল্পায়নবিরোধী।

* দুর্বৃত্ত-বেষ্টিত সরকার তার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে যত না মানুষকে গুরুত্ব দেয় তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় লুণ্ঠনের খাতসমূহকে। যেমন যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগ করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগ মুক্ত করা সম্ভব তা দিয়ে কেনা হয় যুদ্ধবিমান। বাজেট ঘাটতি হবে, অথচ অনুৎপাদনশীল ব্যয় উদ্বৃত্ত হবে। এ সব কোন্ ধরনের মানব-হিতৈষী বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত? এ ধরনের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত শিল্পায়নবিরোধী।

* ক্ষমতাবান দুর্বৃত্তদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে যা সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিরোধী এবং সে কারণেই জাতীয় পুঁজির শিল্পায়ন-মুখী বিকাশবিরোধী।

- যেখানে জীবনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিনিয়ত লঙ্ঘিত হচ্ছে,
- যেখানে নির্বাচন মানেই কালোটাকার প্রতিযোগিতা (গত জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট ব্যয় প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা),
- যেখানে সন্ত্রাস-সহিংসতা অনিবার্য ও নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়,
- যেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবমাননা সাধারণ নিয়ম,
- যেখানে সরকারি গণমাধ্যম মানেই স্তুতি প্রচারের যন্ত্র,
- যেখানে গণমাধ্যমসহ মানব-মুখী সকল মাধ্যম দ্রুত বন্ধ করতে হয়,
- যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়টি নেহায়েতই টোকেনইজম (শ্লোগান),
- যেখানে সুশাসন বিষয়টি অতিমাত্রায় উচ্চারিত কিন্তু প্রকৃতই মূল্যহীন,
- যেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেহায়েতই কাগুজে,
- যেখানে মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনা কেন্দ্রিক ব্যবসা সবচে' লাভজনক,

- যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিচালকেরা স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্র পর্যন্ত সম্ভ্রাসে মদত দিতে বাধ্য,
- যেখানে প্রয়োজনে ক্ষমতাধরদের গণতন্ত্র, অথবা গণতন্ত্র ও বাহিনী শাসনের সংমিশ্রণ, অথবা স্বৈরতন্ত্র যে-কোনোটিই চলতে পারে ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠীর রায় থাকুক বা না থাকুক, ইত্যাদি ।

এহেন অর্থনৈতিক বিকাশ প্রবণতার নিট ফল দাঁড়িয়েছে এমন যে, বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে হয় সুস্থ কোনও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রক্ষেপণ এ মুহূর্তে অসম্ভব অথবা আমরা সম্ভবত একটি বড় রকমের সামাজিক-রাজনৈতিক সংঘাতের সকল শর্ত পূরণ করেছি । ক্ষমতাহীন ১৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষ ১০ লাখ ক্ষমতাধর মানুষকে অবিশ্বাস করেন; সম্ভবত ঘৃণাও করেন । ক্ষমতাহীন মানুষরা রাষ্ট্র, সরকার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি- প্রতিষ্ঠানের প্রতি সম্ভবত আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন- তাদের ক্ষোভ গুমরাছে কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে না । ক্ষমতাহীন মানুষরা একধরনের 'তাতে কিছুই যায়-আসে না' (indifferent) মানুষে রূপান্তরিত হয়েছেন বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ।

গত তিন দশকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে যেখানে গুটিকয়েক ক্ষমতাধর মানুষ সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকে দুর্বৃত্তায়িত করেছেন । তারা সর্বশক্তিমান । তারা উল্টো পথের নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন । গণদারিদ্র্য তাদের জন্য আশীর্বাদ । অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ (ক্ষমতাহীন) মানুষ তিন দশক ধরে জীবনজীবিকা পরিচালনে যেভাবে নিরন্তর অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন সেজন্য তাদের সাহস, ধৈর্য, নিষ্ঠা, সৃজনক্ষমতা, ও সততায় মুগ্ধ হতেই হয় । প্রশ্ন হল স্বাধীনতা চেতনার সঙ্গে সাযুজ্যহীন অথবা বিপরীতধর্মী এই সমীকরণ কি চিরস্থায়ী হতে পারে? তিন দশকে বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এই বিশ্বাস জাগে যে, বিকাশ প্রবণতার চাকাটি এখন যে পথে ঘুরছে তা উল্টোদিকে ঘুরবে সেটাই অনিবার্য । সমাজ রূপান্তরের এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে বড় মাপের রাজনৈতিক পরিবর্তনসংশ্লিষ্ট । তা কবে, কখন, কিভাবে ঘটবে তাই দেখার বিষয় । সম্ভবত সামনে আরও একটা সংগ্রাম প্রক্রিয়া যা নিশ্চিত করবে জনকল্যাণমুখী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, যেটা ছিল স্বাধীনতার মূল আকাঙ্ক্ষার মর্মবস্তু । অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন-এর ফাঁদ থেকে উত্তরণ ব্যতীত মহাবিপর্ষয় রোধের বিকল্প নেই । বিলম্ব অধিকতর বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে । জনকল্যাণমুখী এই উত্তরণের প্রধান পূর্বশর্ত এক ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তন নিশ্চিত করা, যে পরিবর্তনে সম্মিলন ঘটতে হবে উষ্ণ হৃদয়, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাহসী দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের সঙ্গে জনগণের সুদৃঢ় অংশগ্রহণ (substantive public actions) । এ ধরনের রাজনৈতিক-সামাজিক

রূপান্তরই টেকসই শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ও মানবকল্যাণমুখী অর্থনীতির ভিত্তি বিনির্মাণ করতে সক্ষম ।

একটি একান্ত পর্যবেক্ষণ: উন্নয়ন চিন্তার বিকল্প জ্ঞান ভিত্তি প্রয়োজন

বিশ্ব নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে । সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সংকট- পরবর্তি বিশ্ব আগের তুলনায় ভিন্ন, একমেরুত্ব । বিশ্বায়ন বিশ্বকে পাল্টাচ্ছে । ওলট-পালট হচ্ছে । আমরা পাল্টাছি । পাল্টাচ্ছে নেতা, আমলা, ব্যবসায়ী, কালো টাকার মালিক । সাধারণ মানুষও আগের মতো নেই । ১১ সেপ্টেম্বর-পরবর্তি বিশ্ব অতীতের তুলনায় ভিন্ন । একমেরুর বিশ্ব দখল করতে চায় অন্য সকলের সম্পদ ও বাজার । ধরা যাক যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে যুদ্ধ শুরু করল । বিশ্ব আরও নতুন রূপ নেবে । কেমন হবে সে বিশ্ব; আর সে বিশ্বে বাংলাদেশে আমাদের ভূমিকা ও উন্নয়ন কৌশল কী হবে? ধরা যাক আগামীকাল বর্গি-ফিরিজি-ডোনাররা একযোগে পেনে উঠে এদেশ ছেড়ে দিল । বিশ্বব্যাপক তার নিজের স্বার্থের প্রতি নিষ্ঠাবান । ধরা যাক, আমাদের সবকিছুতেই পরামর্শ দেওয়া যাদের অভ্যাস অথচ যাদের আমরা পছন্দ করি না তারা আর নেই । আমরা কী করব? নিজেকে আমাদের নিজেদের চালানোর যোগ্যতা ও প্রস্তুতি কতটুকু? আমার ধারণা জটিল সমীকরণের এসব বিষয় চিন্তা ও বিশ্লেষণে আমাদের পূর্ণ মাত্রায় গলদ আছে । আমরা পরিবর্তন, রূপান্তর-এর যে কথা বলছি তার কৌশল কি হবে? সম্ভবত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে Paradigm shift প্রয়োজন । সম্ভবত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের inherent অক্ষমতা ও চিন্তার দৈন্য আছে । সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্রসহ অনেকেই এ বিষয়ে অগ্রণী হতে পারে । তবে ঐ shift নিশ্চিত করার প্রথম ও প্রধান শর্ত হবে সত্যকে নির্মোহভাবে আলিঙ্গন করার যোগ্যতা অর্জন । আশার কথা, এ দেশের সচেতন মধ্যবিত্ত সমাজে এক ধরনের আত্মানুসন্ধানের ধারা সৃষ্টি হয়েছে । কিন্তু সেখানেও রয়েছে আত্মপ্রবঞ্চনা, ছলনা, দোদুল্যমানতা, সত্যানুসন্ধান বস্তুনিষ্ঠতার অভাব, বৈপরীত্য, বিচ্যুতি । তবে নির্মোহ সত্যানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা কম হলেও আছে । এ অনুসন্ধান প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে নতুন জ্ঞান ভিত্তি সৃষ্টি হবে । যে ভিত্তিতে গভীর মূল্যায়ন ভিত্তিক চয়নের স্বাধীনতার পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে । সুতরাং নির্মোহ সত্য অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হবে । আর সেই আবিষ্কৃত সত্য যত রুঢ়ই হোক তাকে গ্রহণ করার মানসিক কাঠামো সৃষ্টি করতে হবে । উভয়ই নিঃসন্দেহে একটা বড় মাপের কাজ ।

তথ্যসূত্র

১. সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র আয়োজিত ‘আদমজী পাটকল বিলুপ্তি এবং বাংলাদেশে শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক জাতীয় সংলাপে উপস্থাপিত/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি মিলনায়তন, ঢাকা: ৩১ ডিসেম্বর ২০০২/১৭ পৌষ ১৪০৯

২. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, Bangladesh Review of Public Enterprise Performance and Strategy: Key Issues and Policy Implications, World Bank: November 2002, Dhaka, PP. 55-59।

৩. বিস্তারিত দেখুন, Kenneth J. Arrow, Some Paradoxes of Sustainability : Empirical and Theoretical. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত লোক বক্তৃতা, ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০২।

৪. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, Barkat Abul and S Akhter, A Mushrooming Population: The Threat of Slumization Instead of Urbanization in Bangladesh, in The Harvard Asia Pacific Review, Vol 5, Issue 1, 2001: 27-30.

৫. দেখুন ফ্রেডারিক ডি টেম্পল, ‘বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের মূল্যায়ন ও কৌশল’, দৈনিক ইন্ডেফাক, ২৪ ডিসেম্বর ২০০২।

৬. উল্লেখ্য যে, বিশ্বায়নের কারণেই বিনিয়োগকারীরা চাইবেন যথার্থ বিনিয়োগ পরিবেশ। এ জন্য যে তেরোটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে, তার প্রথমটি বাদে অন্য কোনটি বাংলাদেশে নেই। প্রথমটি, অর্থাৎ স্বল্প মজুরে শ্রম আমাদের একমাত্র সুবিধার দিক। এ ছাড়া কাঁচামাল, অবকাঠামো, বিভিন্ন ধরনের শুল্ক ও করভার, শ্রমঅসন্তোষমুক্ত পরিবেশ, কাগজপত্রের দ্রুত চলাচলের নিশ্চয়তা, উন্নত ব্যাংকিং ব্যবস্থা, দুর্নীতিহীনতা বা স্বল্প দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলা, সুশাসন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সর্বোচ্চ মুনাফা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, মুনাফা ইচ্ছামাফিক ব্যবহারের পরিবেশ- এ বারোটি বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থা নেতিবাচক। আবার এ কথাও সত্য যে, অনেক ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ পরিবেশে বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়।

[লেখক: গণমানুষের পক্ষে চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব। অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন চেয়ারম্যান, জনতা ব্যাংক লিমিটেড।]

বিশ্বে পাট নিয়ে বিশাল সম্ভাবনার নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ

মাক সু দু ল আ ল ম

[মাকসুদুল আলমের জন্ম ফরিদপুরে। জন্মতারিখ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৪। বিডিআরে বাবার চাকরিসূত্রে ঢাকা পিলখানাতেই কেটেছে শৈশব-কৈশোর। ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে মাকসুদুল উচ্চশিক্ষা নিতে চলে যান তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের (বর্তমান রাশিয়া) মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। সেখান থেকে অণুজীববিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি শেষ করেন। মাকসুদুল তাঁর দ্বিতীয় পিএইচডি করেন জার্মানির ম্যাক্স প্লানক ইনস্টিটিউট থেকে। এরপর শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীববিজ্ঞান বিভাগে। ১৯৯৭ সালে পান এনআইএইচ শ্যানান অ্যাওয়ার্ড। অণুজীববিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে দেওয়া হয় এই পুরস্কার। ২০০১ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বোর্ড অব রিজেন্টস এক্সেলেন্স অব রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড পান তিনি। একসময়ে পিলখানার খেলার মাঠে বিকেলবেলা সব ছেলেপেলের দল হৈছল্লোড় করে খেলাধুলা করত। মাকসুদুল সবার সঙ্গে যোগ দিলেও মাঝেমাঝে উধাও হয়ে যেত কোথায় যেন। অনেক খুঁজে তাকে শেষে পাওয়া যেত কোনো গাছগাছালি অথবা লতাপাতার সামনে। লতাগুল্ম নেড়ে নিবিষ্ট মনে কী যেন দেখছে মাকসুদুল। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটত। এভাবেই কাটছিল ছোটবেলা। মাকসুদুল আলম গবেষণা করেছেন, রাশিয়া, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র হয়ে মালয়েশিয়ার বড় বড় গবেষণাকেন্দ্রে। পুঁপে, রাবার ও সর্বশেষে পাটের মতো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফসলের জীবনরহস্য উন্মোচন করে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন এই গবেষক। যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী জার্নাল ন্যাচার মাকসুদুল আলমকে নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তাঁকে ‘বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবক’ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

২০১৩-র ১৬ জুন মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে পাটের জিন-নকশা উন্মোচনের সংবাদ শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যম ফলাও করে

প্রচার করে। পাট নিয়ে একই ধরনের গবেষণা করছে এমন প্রতিযোগী দেশগুলোর গণমাধ্যমে সংবাদটিকে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে মাকসুদুল আলম ও তাঁর দলের এ সাফল্য দিয়েছে বাংলাদেশের সোনালি আঁশের সোনালি দিন ফিরিয়ে আনার সুখবর। সোনালি দিনের স্বপ্নপুরুষ মাকসুদুল আলম ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ৬০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য, সাক্ষাৎকারটির কিছু অংশ গ্রহীত হয় জুন ২০১০-এর কোনো এক তারিখে এবং কিছু অংশ গ্রহীত হয় জুন ২০১৩-এর কোনো এক তারিখে।]

ইফতেখার মাহমুদ

প্রাণরসায়ন নিয়ে গবেষণায় আপনার হাতেখড়ি কখন থেকে এবং কীভাবে?

মাকসুদুল আলম

আমি তখন ঢাকার গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ি। বাবা বুড়িগঙ্গার পারে কামরাঙ্গীরচরে একখণ্ড জমি কিনলেন। সেখানে একটি ঘরও তৈরি করলেন। আমি প্রায়ই সেখানে যেতাম। নিজের উদ্যোগেই ঘরের এক কোণে একটি গবেষণাগার তৈরি করলাম। বিভিন্ন উদ্ভিদের লতাপাতা এনে একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে দেখতাম, কী হয়। প্রাণরসায়ন নিয়ে গবেষণায় হাতেখড়ি আমার সেখান থেকেই।

ইফতেখার মাহমুদ

জিন নকশা উন্মোচনের যে অব্যাহত গবেষণা, এর গুরুত্ব দিকটা সম্পর্কে যদি বলেন...

মাকসুদুল আলম

একবার দেশে প্রচণ্ড বন্যা হল। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর বাবা আমাদের জমিতে ট্যাডসের বীজ লাগালেন। কয়েক মাস পর দেখলাম, সেখানে বিশাল আকৃতির ট্যাডস হয়েছে। এত বড় ট্যাডস আগে কখনো দেখিনি। অবাক হয়ে ভাবলাম, বন্যার আগেও তো বাবা ট্যাডসের চারা রোপণ করেছিলেন। কিন্তু এবার এত বড় আকৃতির ট্যাডস কীভাবে হল? এই গভীর রহস্যময় আচরণ আমাকে ভাবিয়ে তুলল। ভাবলাম, নিশ্চয়ই এখানে মাটি, পানি ও বীজের মধ্যে এমন কোনো সমন্বয়ের ব্যাপার আছে, যা ফসলের চেহারা ও আকৃতি একে একে সময়ে একে একে রকম করে দেয়। কী করলে সারা বছর ও সব জায়গায় একই রকমের

উন্নত ফসল পাওয়া সম্ভব, তা অনুসন্ধান করতে থাকলাম। এভাবেই রহস্য উন্মোচনের পথে আমার যাত্রা শুরু।

ইফতেখার মাহমুদ

দেশি বা তোষা পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের বিষয়টি সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাকসুদুল আলম

একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভিশন-মিশন নিয়ে আমরা তোষা পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছিলাম। কারণ, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চাষ হওয়া পাটের সিংহভাগই তোষা পাট।

ইফতেখার মাহমুদ

কত দিনের মধ্যে আপনারা কৃষকের হাতে পাটের নতুন জাত পৌঁছে দিতে পারবেন?

মাকসুদুল আলম

এ ধরনের গবেষণার ফলাফল পাওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে সময়সীমা বেঁধে কাজ করা কঠিন। তবে এখন পর্যন্ত যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাতে আশা করা যায়, আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে আমরা নতুন ওই জাত পরীক্ষামূলকভাবে চাষ শুরু করতে পারব। সবকিছু ঠিকঠাকমতো চললে কৃষকের হাতে নতুন জাত পৌঁছে দিতে সর্বোচ্চ চার-পাঁচ বছর লাগতে পারে।

ইফতেখার মাহমুদ

কিন্তু পাটের তো এখন দুর্দিন যাচ্ছে। কৃষক এখনই যা উৎপাদন করছেন, তার ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না; নতুন জাত চাষের ক্ষেত্রে তারা কি আগ্রহ পাবেন বলে মনে করেন?

মাকসুদুল আলম

আমাদের কাজ কৃষকের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে নতুন জাত উদ্ভাবন করা। আমরা দেখেছি, ছত্রাক ও পোকাকার আক্রমণে কৃষকের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পানির কারণে কৃষক পাট পচাতে পারেন না। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে পাটের চাষ করা যায় না। আমরা এই সমস্যাগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা করছি। একই সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য

থাকবে পাটের জাতের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্যগুলো যুক্ত করা, যার চাহিদা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রয়েছে। যেমন: দেশের বস্ত্রশিল্পে কাপড় তৈরির উপযোগী সুতা পাট থেকে উৎপাদন করা যাচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করছি, পাটের আঁশকে আরও সূক্ষ্ম ও শক্ত করা যায় কি না, যা থেকে উন্নতমানের সুতা উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

ইফতেখার মাহমুদ

কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে কি পাটের সেই চাহিদা আছে? চাহিদা তো দিন দিন কমছে...

মাকসুদুল আলম

চাহিদা কমার বড় কারণ, পাটের ব্যবহার শুধু বস্তা, রশি ও অন্যান্য শৌখিন দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু একটি পরিবেশসম্মত কৃষিপণ্য হিসেবে বিশ্বে পাটের বিশাল সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশ সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার নেতৃত্ব দিতে পারে। তবে এ জন্য আমাদের শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদেরও প্রস্তুতি নিতে হবে।

ইফতেখার মাহমুদ

কীভাবে সেই প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব? তা কি নেওয়া হচ্ছে?

মাকসুদুল আলম

পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের পূর্বপ্রস্তুতি আমাদের ছিল না— এমন প্রশ্ন পাঁচ-ছয় বছর আগে কেউ যদি করত, তাহলে উত্তর নিশ্চয়ই হত 'না'। কিন্তু আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা এই কয়েক বছরের মধ্যেই তোষা পাট ও ছত্রাকের জীবনরহস্য উন্মোচন করে দেখিয়ে দিয়েছেন, তা সম্ভব। আমরা এখন একের পর এক স্বত্ব (পেটেন্ট) পাওয়ার জন্য আবেদন করছি।

শুরুতে আমরা ভাবতাম যে আমাদের তো কৃতিস্বত্বের আবেদন করার মতো বিশেষজ্ঞ আইনজীবী নেই। আমরা তিনজন তরুণ আইনজীবীকে এ কাজের আইনি পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিলাম। তাঁরা এখন উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে পালা দিয়ে মোট পাঁচটি কৃতিস্বত্বের আবেদন করেছেন। আরও ১১টির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ফলে আমরা দেখছি, চেষ্টা ও দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করলে সব সম্ভব। জিনোম গবেষণার ফলাফলকে দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুতি

আমাদের কৃষক, শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারির ভিত্তিতে কাজ করলে দ্রুত সফলতা পাওয়া সম্ভব।

ইফতেখার মাহমুদ

জৈবপ্রযুক্তি ও জিনোম গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার কত বড়? স্বত্ব পেলে আমাদের পক্ষে ওই বাজারে কতটুকু কীভাবে যুক্ত হওয়া সম্ভব?

মাকসুদুল আলম

বৃহত্তর পরিসরে যদি বলি, তাহলে কমপক্ষে এক ট্রিলিয়ন (এক লাখ কোটি) ডলারের বাজার এটি। জিনোম গবেষণার ফলাফলগুলোকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়ে যেতে পারলে সেটা আরও কয়েক গুণ বাড়বে। নতুন ধরনের এনজাইম তৈরি হচ্ছে।

আমরা যে এনজাইমটির জীবনপ্রক্রিয়া জানতে পেরেছি, তা বিশ্বের এনজাইম বাজারের চাহিদার ২০ শতাংশ মেটায়। স্বত্ব পেলে কয়েক হাজার কোটি টাকার ওই বাজারে বাংলাদেশ অংশ নিতে পারবে। ছত্রাকের ওপরে যে কৃতিস্বত্বগুলোর জন্য আমরা আবেদন করেছি ও আবেদনের প্রস্তুতি নিচ্ছি, তা পেলে আমাদের অর্থনীতির চেহারা ই বদলে যাবে। কেননা, ওই বিষয় নিয়ে বিশ্বের যেখানেই যারা গবেষণা করবেন, তাঁদের বাংলাদেশকে স্বত্ব বাবদ অর্থ দিতে হবে। ফলে এই গবেষণাগুলোর বহুমুখী অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে।

ইফতেখার মাহমুদ

কিন্তু জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য নিয়ে বিশ্বজুড়ে তো অনেক বিতর্ক রয়েছে। এর পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিয়ে অনেক ধরনের সমালোচনা আছে। জিনোম গবেষণা এ থেকে কতটুকু মুক্ত?

মাকসুদুল আলম

মনসান্তোসহ বিশ্বের অনেক বড় বড় কোম্পানির উৎপাদিত পণ্য নিয়ে বিশ্বের অনেক দেশেই আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। জিনোম গবেষণার মাধ্যমে যে ফসল ও পণ্য তৈরি হবে, তাতে আমরা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছি। অর্থাৎ, আমরা জাত উদ্ভাবনের সময় প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রাখি, যাতে ওই জাতটি বেড়ে উঠতে পারে।

ইফতেখার মাহমুদ

আপনারা একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ওই গবেষণাগুলো করছেন। তারও একটি মেয়াদ আছে। এই গবেষণা ও উদ্যোগগুলোকে টেকসই করতে কী প্রয়োজন?

মাকসুদুল আলম

আমি মনে করি, আমাদের এই জৈবপ্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্রটি একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। লক্ষ্য পূরণের জন্য একে একটি জাতীয় জিনোম গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি নিজে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের একটি গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছি। এই কেন্দ্রটি স্থাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে অর্থ দেওয়া হয়েছিল, তা আমরা কয়েক বছরের মধ্যেই ফেরত দিয়েছি। আট বছর ধরে ওই কেন্দ্র নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। নিত্যনতুন গবেষণা করছে, গবেষক তৈরি করছে।

বাংলাদেশেও এটি সম্ভব। সরকার আমাদের প্রকল্প বাবদ যে অর্থ দিয়েছে, আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজেরা উপার্জন করে ফেরত দিতে পারব। আমাদের এই কেন্দ্রের গবেষণার ফলাফল ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য অনেক ধরনের প্রস্তাব ইতোমধ্যে আমাদের কাছে আসতে শুরু করেছে। ফলে আমরা আত্মবিশ্বাসী এই গবেষণা কেন্দ্রটি আগামী দিনের বাংলাদেশের বিজ্ঞান গবেষণার নতুন পথের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। সে ধরনের বিজ্ঞানী আমরা ইতোমধ্যে এখানে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি।

ইফতেখার মাহমুদ

এর জন্য কী প্রয়োজন?

মাকসুদুল আলম

আমাদের এই গবেষণা কেন্দ্রটি নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। কোনো একটি ফলাফল পাওয়ার চূড়ান্ত মুহূর্ত এলেই আমরা জাতির সামনে তা তুলে ধরছি। আমাদের এই গবেষণার ফলাফল দেশের সব মানুষের। দেশের সর্বস্তরের সব মানুষ আমাদের যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়েছে, আমরা তা জাতিকে গবেষণার ফলাফলের মাধ্যমে ফেরত দিতে চাই।

ইফতেখার মাহমুদ

১৯৭১-এর মুক্তি-সংগ্রামে আপনার বাবাকে পাঞ্জাবি বাহিনী ধরে নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেয়নি। এ বিষয়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই...

মাকসুদুল আলম

১৯৭১ সালে স্বাধীনতায়ুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম সপ্তাহেই পাকিস্তানি বাহিনী আমার বাবা দলিলউদ্দিন আহমেদকে ধরে নিয়ে যায়। সে বছরের ৩ এপ্রিল পিলখানার এক কোনায় বিডিআরের বেশ কয়েকজন সদস্যকে পাকিস্তানি বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। সেখানে আমার বাবাও ছিলেন।

ইফতেখার মাহমুদ

অল্প বয়সে বাবাকে হারালেন। এরপর মা-ই তো আপনার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। আপনার এই ধরনের জীবন তৈরিতে মায়ের অবদান সম্পর্কে কিছু বলুন...

মাকসুদুল আলম

কাপড় সেলাই করাকে পেশা হিসেবে নিয়ে মা লিরিয়ান আহমেদ সংসারের খরচ চালাতেন। বড় ভাই মনজুরুলসহ চার ভাই ও চার বোনের সবাই টিউশনি করে নিজেদের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতেন। মায়ের নিরলস সংগ্রাম আর সাধনার গুণেই সংসারে সুদিন এল একদিন। সবার বড় বোন শামসুন নাহার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর শেষ করে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিতে যোগ দিলেন। তিনি অন্য ভাই-বোনদের উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব নিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, নিজের গায়ের চামড়া দিয়ে জুতা বানিয়ে দিলেও আমার বড় বোনের ঋণ শোধ হবে না। তিনি আমার জন্য যা করেছেন, তা না পেলে আমার পক্ষে এতদূর আসা সম্ভব হত না। (বলতে না বলতেই তাঁর চোখ জলে ছলছল করে ওঠে।) (মায়ের কথা বলতে গিয়ে আবেগ আর চোখের জলে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে আবারও। 'সব ভাই-বোনকে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করে বিয়ে দিয়ে মা মারা গেলেন ১৯৯৮ সালে। ঠিক বাবার মৃত্যুর দিনেই, অর্থাৎ ৩ জুন।' কিছুক্ষণ থামলেন মাকসুদুল। তারপর বললেন) একজন সচেতন মা একটি শিক্ষিত জাতি তৈরি করতে পারে। আমার মা পড়াশুনা কম জানলেও তিনি শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বাংলাদেশকে বিজ্ঞানে এগিয়ে নিতে হলে নারীদের বিজ্ঞানমুখী করতে হবে। তারাই মা হয়ে তার সব সন্তানকে বিজ্ঞানমনস্ক করতে পারবে। সেটা করা গেলে এর প্রভাব হবে বহুমুখী।

ইফতেখার মাহমুদ

সোনালি আঁশ পাটের জিন-নকশা আবিষ্কারের গল্পটা নিশ্চয়ই অনেক দীর্ঘ। সংক্ষেপে যদি সেই গল্পের কিছুটা বলেন...

মাকসুদুল আলম

যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পেঁপের জীবনরহস্য উন্মোচনের (জেনোম সিকোয়েন্সিং) সময় আমার শুধু আফসোস হয়েছে দেশের জন্য কিছু করতে পারলাম না বলে। সুযোগ পেলে আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজনীয় শস্য ও ফসলের জিন-নকশা উন্মোচন করার সাধ তখন থেকেই ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই রাজ্যের প্রধান ফসল পেঁপে। জিন-নকশা উন্মোচনের পর তাঁরা বেশ কিছু নতুন জাত উদ্ভাবন করলেন। পেঁপের বেশ কিছু রোগ হত। পোকাকার আক্রমণে প্রচুর পেঁপে নষ্ট হত। কৃষক বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হত। উন্নত জাত উদ্ভাবন করে কৃষকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার পর তাদের ভাগ্য বদলে গেল। পেঁপের উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে গেল। হাওয়াই রাজ্যের কৃষি-অর্থনীতির চেহারাই পাটে গেল। মনে হচ্ছিল, নিজের দেশের ধান, পাট, বনজ ঔষধি গাছগুলোর জিন-নকশা উন্মোচন করা গেলে দেশের কৃষির চেহারা পাটে দেওয়া সম্ভব হতো।

২০০৮ সালের শেষের দিকে মালয়েশিয়া সরকার জিন-নকশা নিয়ে গবেষণা করার জন্য একটি বড় গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করে। সেখানে আমার ডাক পড়ল রাবার নিয়ে গবেষণা করার জন্য। তাঁর সঙ্গে হাওয়াই থেকেও কয়েকজন যোগ দিলেন। ২০০৯ সালের নভেম্বরের মধ্যেই তাঁরা রাবারের জেনোম সিকোয়েন্সিং উন্মোচন করে ফেললেন। তখন আরও বেশি করে দেশের জন্য কাজ করার আগ্রহ বোধ করলাম। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। প্রাণরসায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে আমার সঙ্গে কাজ করেন এমন বন্ধুরা শুনেই উৎসাহ দেখালেন। তাঁরা বললেন, যেকোনো মূল্যে এটা হতেই হবে, আমরাই পাটের জিন-নকশা উন্মোচন করব।

২০০৮ সালের জুন মাসে তৈরি হল ‘স্বপ্নযাত্রা’ নামের একটি উদ্যোগ। প্রবীণ-নবীন মিলিয়ে ৭২ জন বিজ্ঞানী ও তথ্যপ্রযুক্তিবিদ যোগ দিলেন সঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হাসিনা খান ও জেবা সিরাজ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী যোগ দিলেন। নিজেদের অর্থ ও কারিগরি সহায়তা নিয়ে তাঁরা কাজ শুরু করলেন। উল্লেখ্য, গবেষণার জন্য এঁরা কেউ পারিশ্রমিক নেননি।

ইফতেখার মাহমুদ

গবেষণার ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের কি কোনো সহযোগিতা রয়েছে?

মাকসুদুল আলম

গবেষণার এক পর্যায়ে গিয়ে টাকার অভাবে আটকে গেলাম। তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী হঠাৎ একদিন ফোন করলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করলাম। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে অর্থসহায়তা দেওয়ার ঘটনা আমাদের হতাশা কাটিয়ে সাফল্যের দিকে নিয়ে গেল। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে অর্থসহায়তা দেওয়ার পর ৩ জানুয়ারি আরও নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হল। গবেষণা শুরুর আগে সবাই লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, পুরো গবেষণা শেষ হওয়ার আগে কেউ কোনো তথ্য বাইরে কারও কাছে বলবেন না। গবেষকদের ৪২ জন সদস্যের সবাই তা মেনে চলেছেন।

ইফতেখার মাহমুদ

সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

মাকসুদুল আলম

আপনাকেও ধন্যবাদ।

উৎস: ত্রৈমাসিক গোলাঘর, এপ্রিল'১৪ – জুন ও জুলাই – সেপ্টেম্বর ২০১৬
সংখ্যা।

জিন সম্পদে কৃষকের অধিকার

মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

[এ-রচনাটি সরাসরি পাট সম্পর্কিত নয়, তবে বাংলাদেশের প্রায় সব কৃষকই পাট-চাষের সঙ্গে যুক্ত; রচনাটি কৃষকের অধিকার সম্পর্কিত বলে এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। সম্পাদক]

আমাদের চারপাশে মাঠে এখন যত ফসল দেখি এসবই আমাদের পূর্বপুরুষদের বুনো গাছগাছালি থেকে দীর্ঘ যাচাই বাছাই-এর মধ্য দিয়ে পাওয়া ফসল। হাজার হাজার বছর ধরে এসব ফসল সংরক্ষণ করে চলেছেন তারা। প্রাকৃতিকভাবে ঘটে আকস্মিক জিন পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট উদ্ভিদকুল থেকে মানুষ দিনের পর দিন চালিয়েছে তাদের বাছাই কার্যক্রম। কখনো আবার প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত পর-পরাগায়ন সৃষ্টি করেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ গাছগাছালি। এখানেও চলেছে মানুষের নানামুখি নির্বাচন, এসেছে নতুন ফসল, এসেছে ফসলের নতুন জাত। কখনো আবার ঘটেছে পর-পরাগায়ন এবং ক্রোমোজোম দ্বিগুণ হওয়ার কাজ প্রাকৃতিকভাবেই। এসব পরিবর্তন জন্ম দিয়েছে আরো যোগ্যতম গাছগাছালি কিছু। তা থেকে বাছাই করে নিয়েছে মানুষ কতসব গুরুত্বপূর্ণ ফসল যেমন: গম, তামাক, মিষ্টিআলু, গোলআলু, কলা ইত্যাদি ফসল।

কেবল যে ফসল বাছাই করেছে মানুষ তা তো নয়। বছরের পর বছর পরম যত্নে এসব ফসল মানুষ আগলে রেখেছে। এসব ফসলের সাথে মানুষের সম্পর্কটা তাই আত্মিক। এদের খুঁটিনাটি নানা বিষয় তাদের আত্মস্থ। এদের আবাদ কৌশল, এদের সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং এদের নানামুখি ব্যবহারের জ্ঞান তাদের রয়েছে। কৃষক এবং কৃষক সম্প্রদায় এদের সংরক্ষণ করেছে এবং এদের প্রয়োজনমাপিক আবাদ করেছে। এসব উদ্ভিদের নানারকম ব্যবহার ও জ্ঞান তাদের রয়েছে। এই যে মানুষের সংরক্ষিত ফসলের প্রজাতি, এদের নানারকম জাত আর আনুষঙ্গিক জ্ঞান মিলে এসব জিন সম্পদের উপর তাদের এক জন্মগত অধিকার জন্মেছে। সে জন্মগত অধিকার আজ নানাভাবে বিদ্বিত হচ্ছে।

পৃথিবীর নানা অঞ্চলে মানুষ এভাবে বাছাই করে নিয়েছে নানা ফসল আর ফসলের জাত। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদরাজি থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচন আর মানুষের কৃত্রিম নির্বাচন মিলে মানুষ দেশে দেশে পেয়েছে ফসলের কত কত স্থানীয় জাত। এ যাবৎ মানুষের চেনাজানা উদ্ভিদপ্রজাতির সংখ্যা তিন লক্ষ। এদের মধ্য থেকে এক লক্ষ উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে নানা সময়ে ফল-মূল কিংবা বীজ মানুষ ব্যবহার করেছে। এদের মধ্যে ভক্ষণযোগ্য উদ্ভিদপ্রজাতির সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় সাত হাজার উদ্ভিদপ্রজাতি। আর মানুষ এদের ভেতর থেকে ফসল হিসেবে বাছাই নিয়ে নিয়েছে ৭০০টি উদ্ভিদপ্রজাতি। জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ আবাদি ফসলের সংখ্যা ১২০টি। এ সবগুলোর আবার রয়েছে কৃষকের নানারকম বাছাই করা জাত। বাংলাদেশ-ভারত মিলিয়ে এই অঞ্চলে ধানের কৃষকের বাছাই করা জাতের সংখ্যা ছিল ৩০,০০০। কেবল বাংলাদেশে নানারকম ধানের জাত ছিল প্রায় ১২০০০। এরকম গম, ভুট্টাসহ বহু ফসলেরই ছিল বহুসংখ্যক স্থানীয় জাত।

কৃষকের উদ্ভাবিত জাত দিয়েই চলেছে মানুষের কৃষি হাজার হাজার বছর ধরে। দিনে দিনে মানুষ বেড়েছে, বেড়েছে খাদ্যের চাহিদা। প্রচলিত কৃষকের জাত আবাদ করে সে চাহিদা পূরণ কোনো কোনো দেশে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। শুরু হয় সে কারণে নানামুখি ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। সে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রধান কাঁচামাল হল এসব স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত ফসলের নানা জাত। কৃষকের বাছাই করা জাতগুলো ছিল মিশ্রিত প্রকৃতির। একাধিক লাইনের বীজ একত্রে মিশে তবে গড়ে উঠেছিল এসব জাত। ধানের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্থানীয় জাতই ছিল এ প্রকৃতির। একটি জাতের ভেতর মিশে থাকা লাইনগুলোর সকলেই যে সমান সফল ছিল তা কিন্তু নয়। সেটি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এড়ায়নি বলে জাতের মিশ্রণের ভেতর থেকে উত্তম লাইনটিকে আলাদা করে নেবার কাজ শুরু হয় সেই কবে। এভাবে বেরিয়ে আসে নানা ফসলের স্থানীয় উন্নত জাত। এসব স্থানীয় উন্নত জাতগুলোর মূল ভিত্তি কিন্তু ছিল কৃষকের বাছাই করে নেওয়া জাতসমূহ। এসব উন্নত জাত খানিকটা বেশি সফল হওয়ায় এদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয় আমাদের কৃষকগণের। দিনে দিনে এদের আবাদ বাড়ে আর কমে বহু স্থানীয় জাতের আবাদ। এরপর আসে উচ্চ ফলনশীল জাত, এদের সফলতা সহজেই নজর কাড়ে কৃষকের। পাশাপাশি চলে এসব জাত বিস্তারে নানা রকম প্রণোদনা প্রদান। ফলে বেশ দ্রুত এদের বিস্তার ঘটে। আর একইসাথে বেশ দ্রুত মাঠ থেকে বিদায় নেয় অতি চেনাজানা বহু কৃষকের বাছাই করা স্থানীয় জাত। এদের অনেকেই বিলুপ্ত হয়। অনেক ফসলের জাত আবার সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয় জিন ব্যাংকে বিলুপ্তির হাত থেকে এদের রক্ষা করার জন্য। ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যেন যে কোনো সময় এদের ব্যবহার

করা যায় সেজন্যেই জিন ব্যাংকের হিমঘরে নানারকম তাপমাত্রা আর আর্দ্রতায় এদের যত্ন করে সংরক্ষণ করা হয়। পৃথিবীর দেশে দেশে গড়ে তোলা হয় জিন ব্যাংক। এদের অধিকাংশই আসলে বিভিন্ন দেশের জাতীয় জিন ব্যাংক। বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে কোনো জিন ব্যাংক নেই। ফসলের বহু মূল্যবান জিন সম্পদ এদেশে এখনও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও সকল জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এখনও সম্ভব হয়নি। তাছাড়া জিন ব্যাংকে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের কোনো একক কর্তৃপক্ষ না থাকায় এ বিষয়ে কোনো সমন্বিত কার্যক্রমও হাতে নেওয়া যাচ্ছে না। যাচ্ছে না কৃষকের অধিকার রক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণও।

কৃষকের পরিশ্রমের ধন এইসব ফসলের জিন সম্পদ অবাধে সংগ্রহ করেছে নানা দেশের মানুষ গত শতাব্দীর আশির দশক জুড়ে। সে সময় এসব জিন সম্পদকে অভিহিত করা হয়েছিল ‘মানুষের সাধারণ উত্তরাধিকারের ধন’ হিসেবে। বলা হয়েছিল এতে সকলেরই অধিকার আছে। সকল মানব-জাতির বাঁচা-মরার সাথে এসব জিন সম্পদ জড়িত। ফসলের সকল উৎপত্তিস্থল থেকে এভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে নানারকম ফসলের জিন সম্পদ। এর জন্য তখন কৃষককে জিজ্ঞাসাও যেমন করা হয়নি তেমনি কৃষকের এসব জিন সম্পদে দিনের পর দিন সংরক্ষণের জন্য কোনো আর্থিক মূল্য তাকে দেওয়া হয়নি। এমনকি দেওয়া হয়নি এর জন্য তাকে কোনো স্বীকৃতিও।

আমাদের দেশে অনেক ফসলের জাত আমরা নতুন নতুন নাম দিয়ে রেজিস্ট্রি করে নিচ্ছি প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির নামে। এসব জাত আসলে পাওয়া গেছে হাজার হাজার বছর ধরে কৃষক কর্তৃক সংরক্ষিত নানারকম স্থানীয় জাত থেকে। হয়তো এদের প্রথাগত কোনো সুনির্দিষ্ট নাম নেই অথবা হয়তো কোনো কোনোটার জাতের স্থানীয় কোনো নামও রয়েছে। বিজ্ঞানী বা গবেষকগণ সেসব জাত সংগ্রহ করে উদ্ভমটাকে নতুন নাম দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে বাজারে। অথচ কৃষক এসব জাত সংরক্ষণ করে চলেছেন তার নাম থেকে যাচ্ছে অনুল্লিখিত। গবেষকগণ এসব জাত থেকে অবশ্য আর্থিক ফায়দা খুব একটা গ্রহণ করছেন না এ কারণে যে, এসব জাতের বীজ বা চারা বিনা পয়সার যে কেউ বর্ধন, সংরক্ষণ ও বিক্রয় করতে পারে। তবে এভাবে বিজ্ঞানীর নিজস্ব সুনাম অর্জনের একটা সুযোগ পায়। তবে খুবই ভালো হয় পাশাপাশি যদি সংরক্ষণকারী বা সম্প্রদায়ের কথা জাতটির বিবরণে উল্লেখ থাকে। এটি তাদের স্বীকৃতি দেবার একটি উপায় হতে পারে।

আজ নানা দেশ থেকে সংগৃহীত এসব জিন সম্পদ সংরক্ষিত আন্তর্জাতিক জিন ব্যাংকগুলোতে। এরা সংরক্ষিত রয়েছে জিন সম্পদ সংগ্রহ অভিযান পরিচালনাকারী বিজ্ঞানীদের নিজ নিজ দেশের জিন ব্যাংকেও। অধিকাংশ ফসলের উৎপত্তি ঘটেছে আসলে অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র দেশগুলোতে। ফলে এসব জিন সম্পদ মূল্যায়ন ও

এদের মধ্যে কী কী জিন রয়েছে তা শনাক্তকরণের জন্য অবকাঠামোগত, যান্ত্রিক ও রাসায়নিক সুযোগসুবিধা ও দক্ষ জনবল তাদের নেই। ফলে এদের বাস্তবে ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ খুবই সীমিত আকারে হচ্ছে। অন্যদিকে ধনী দেশগুলোর নিজস্ব জিন সম্পদ তেমন নেই। তবে আর্থিক ও কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষ জনশক্তি থাকায় তারা এসব জিন সম্পদকে শনাক্তকরণ, তা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সুফল অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। সমস্যা শনাক্তকরণ ও প্রয়োগে নয়, সমস্যা হচ্ছে এসব জিনকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবন করা জাতের পেটেন্ট রাইট বা মেধাস্বত্ব অর্জন নিয়ে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে অর্জিত জিন সম্পদ কাজে লাগিয়ে মেধাস্বত্ব পাওয়া এবং তা থেকে মুনাফা অর্জন সঠিক কিনা সেটি হল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

জিন সম্পদে কৃষকের অধিকার প্রশ্নটি প্রথম উত্থাপিত হয় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে। বিশেষ করে বিভিন্ন দরিদ্র দেশগুলো থেকে সংগৃহীত জিন সম্পদকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করে উদ্ভাবকগণ যখন তার মেধাস্বত্ব লাভ করে অর্থাৎ এককভাবে মুনাফা অর্জনের অধিকার লাভ করে তখন থেকেই উঠতে শুরু করে জিন সম্পদে কৃষকের অধিকারের প্রশ্নটি। উদ্ভিদ জিন সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে কৃষকের যে ভূমিকা তার প্রসঙ্গটি নিয়ে কৃষকের অধিকার প্রসঙ্গটি উঠে আসে প্রথম ১৯৮৯ সনে। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল আন্ডারটেকিং-এর প্রস্তাবনায় কৃষকের অধিকারটি সংজ্ঞায়িত করা হয়। কৃষকের অধিকার যেন প্রদান করা যায় সেজন্য ১৯৯১ সনে উদ্ভিদ জিন সম্পদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক তহবিল গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়। জিন সম্পদে প্রবেশাধিকার এবং মুনাফা বণ্টনের বিষয়টি আন্তর্জাতিক ইস্যু হয়ে ওঠে ১৯৮০-এর গোড়ার দিকে যার ফলশ্রুতিতে কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি (CBD) পরিগ্রহণ করা হয় ১৯৯২ সনে। বাংলাদেশ CBD-এর স্বাক্ষরদানকারী একটি দেশও বটে। এই কনভেনশনের লক্ষ্য হল তিনটি এক, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দুই, জীববৈচিত্র্যের টেকসই প্রয়োগ এবং তিন, মুনাফার ন্যায্য এবং ন্যায়সংগত বণ্টন নিশ্চিত করা।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর উদ্যোগে আট বছর ধারাবাহিক আলোচনার পর ২০০১ সনে ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি অন প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস ফর ফুড এন্ড এগ্রিকালচার (ITPGRFA) গ্রহণ করা হয় যা কার্যকর হয় ২০০৪ সন থেকে। এর লক্ষ্য হল উদ্ভিদ জিন সম্পদের সংরক্ষণ এবং এর টেকসই প্রয়োগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি CBD-এর প্রস্তাবনায় সাথে সাযুজ্য রক্ষা করে জিন সম্পদ ব্যবহারের জন্য ন্যায্য ও ন্যায়ভিত্তিক মুনাফা বণ্টন নিশ্চিত করা। এই ট্রিটির মাধ্যমে জিন সম্পদে প্রবেশের ও মুনাফা বণ্টনের একটি খসড়া বহুপাক্ষিক সিস্টেম

দাঁড় করানো হয় যা অনুসরণ করে এ পর্যন্ত নির্দিষ্টকরণকৃত ৬৪টি ফসল ও গো-খাদ্যের জিন সম্পদে চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ অধিকতর প্রবেশাধিকার পাবে। কৃষকের অধিকারের বিষয়টি আজ আলোচিত হচ্ছে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার নির্দিষ্ট ফোরামে ধারাবাহিকভাবে। কিভাবে কতটুকু আর্থিক মুনাফা এর জন্য কৃষককে দেওয়া যায় তা নিয়েও কথা হচ্ছে। মুনাফার বিষয়টি কেবল আর্থিক নয়, এর বাইরেও কিছু সুবিধা বা বাড়তি মুনাফা রয়েছে। যারা জিন সম্পদ ব্যবহার করে কোনো জাত বা ব্রিড তৈরি করে মুনাফা পাবে তারা তা থেকে ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক অর্থ ট্রিটির বেনিফিট শেয়ারিং ফান্ডে জমা দেবে। ইচ্ছে করলে ভিন্ন দেশ, আন্তর্জাতিক ফাউন্ডেশন এবং প্রাইভেট সেক্টর এই ফান্ডে অর্থ প্রদান করতে পারবে। এই ফান্ডে জমাকৃত অর্থ প্রধানত উন্নয়নশীল দেশের কৃষকদের স্বার্থে ব্যয় করার বিধান এতে রয়েছে। অর্থনৈতিক মুনাফার বাইরে যেসব সুবিধা এ থেকে পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে এর মধ্যে রয়েছে তথ্যের বিনিময়, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং ভৌত, কারিগরি ও জনবল সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করা।

চাহিদামাফিক বহুপাক্ষিক সিস্টেমের মধ্যে থেকে জিন সম্পদ পাওয়ার উৎস আসলে একাধিক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে জিন সম্পদ সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করা হয়েছে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা সেন্টারে। কনসাল্টেটিভ গ্রুপ অন ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচার রিসার্চ (DGIAR)-এর আওতাধীন রয়েছে এসব সেন্টারগুলো। এসব জিন ব্যাংকে জমাকৃত জিন সম্পদে জিন সম্পদ জমাদানকারী দেশগুলোর অধিকার রয়েছে। তারা এসব জিন সম্পদ প্রয়োজনের সময় চাইলে তা জিন ব্যাংকগুলো থেকে গ্রহণ করতে পারবে। পারবে এসব জিন ব্যাংকের জিন সম্পদ কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবন করা প্রোগ্রামের লাইন গ্রহণ করে তাকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে। তাছাড়াও বহু আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে জমা রয়েছে ফসলের জিন সম্পদ। জিন সম্পদ জমা রয়েছে অনেক দেশের জাতীয় জিন ব্যাংকগুলোতে, রয়েছে তা গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর জিন ব্যাংকেও। এসব জিন সম্পদ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে বহুপাক্ষিক সিস্টেমে যারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বা হচ্ছে তারাও জিন সম্পদ পাবার অধিকার অর্জন করবে। এই সিস্টেমে ঘোষিত জিন সম্পদের মোট সংখ্যা ২০১৩ সনের ৪ নভেম্বরের হিসাব অনুযায়ী ১,০৩৭,৫২২টি। এর মধ্যে ৬,৯৩,৭৫২টি জিন সম্পদ রয়েছে আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা সেন্টারগুলোতে। ইউরোপ অঞ্চলের জিন সম্পদের সংখ্যা ৩,১৮,০০১টি। অন্যান্য চুক্তিবদ্ধ পার্টির কাছে রয়েছে ২৫,৭৬৯টি জিন সম্পদ। এফএও-এর কমিশন অন জেনেটিক রিসোর্সেস ফর ফুড এন্ড এগ্রিকালচার-এর বার্ষিক নিয়মিত সভায় উপস্থিত থেকে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ জিন সম্পদের অধিকারের বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করার কারণে

এখনও কোনো সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। তবে কৃষকের সংরক্ষিত জিন সম্পদ অন্যের ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি এবং তা থেকে মুনাফা ভাগাভাগি করার নানা ফর্মুলা উপস্থাপন করা হলেও আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করা অবশ্যই সম্ভব হবে। আমাদের কৃষকের কষ্টের ধন ব্যবহারের সুফল সংশ্লিষ্ট কৃষক সম্প্রদায় পাবে এ প্রত্যাশা আমাদের রয়েছে। এছাড়া জিন সম্পদে প্রবেশাধিকার ও মুনাফা বণ্টনের বিষয়ে নিয়ে দফায় দফায় CBD-এর সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এসব সভায় খানিকটা অগ্রগতি হয়ে থাকলেও বেশ কিছু বিষয় এখনও অমীমাংসিত থাকায় এ বিষয়টির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে আশার কথা এই যে, এ নিয়ে ন্যূনতম সমঝোতায় উপনীত হওয়ার জন্য কাজ চলছে। উদ্ভিদ জিন সম্পদে কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এর জন্য আর্থিক মূল্য প্রদানের বিষয়টি আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। তবু কোনো কোনো দেশ নিজেদের দেশে আইনে কৃষকের অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে অধিকারটিকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে কৃষক ও কৃষক সম্প্রদায়ের জিন সম্পদ ব্যবহার করে কোনো জাত উদ্ভাবন করা হলে কৃষককে কিভাবে তার মূল্য প্রদান করা হবে সেটি নির্ধারণ করা বেশ জটিল এক বিষয়ই বটে। ভারতে মেধাস্বত্ব আইনে কৃষকের জন্য একটি জিন ফান্ড গঠনের প্রস্তাব রয়েছে। বাংলাদেশেও কৃষকের অধিকার রক্ষায় প্রায় একই রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

[লেখক: অধ্যাপক, কৌলিকত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
পাট গবেষক। প্রোভিসি, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। লিখেছেন ১৩ টি গ্রন্থ,
সম্পাদনা করেছেন ৩টি গ্রন্থ।]

পাট নিয়ে স্মৃতি ও কিছু কথা

আবদুল আউয়াল

আমাদের শৈশব-কৈশোর কেটেছে পাটের সংস্পর্শে— গ্রামে জন্ম নিয়েও অনেকের শৈশবে যা এখন আর সেভাবে ঘটে না। পাটক্ষেতের সৌন্দর্য থেকে শুরু করে এর অর্থনৈতিক দিকসহ বহু ধরনের বিষয় আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে আজও। পাট যখন চারা অবস্থায় থাকে, তখন ক্ষেতের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে গেলে কী অপরূপ নান্দনিক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়! এই দৃশ্য যারা দেখেনি, তাদেরকে বলে বোঝানো যাবে না বিষয়টি আসলেই কতটা সুন্দর। তবে পাট একটু বড় হয়ে গেলে এর গায়ে প্রচুর বিছা বাস করে, এরা পাটের পাতা খেয়ে বাঁচে— এই বিছাকে আমি বড় ভয় পেতাম। পাট কাটার সময় হলে, গলাপানিতে নেমে চার-পাঁচটা পাট হাতের মুঠায় ধরে একদুবে কৃষকরা কেটে আনতো। এখন অতো পানিও হয়না আর কৃষককে আগের মতো ডুব দিয়ে পাট কাটতেও হয় না। কাটা পাটের ছোট ছোট মুঠা বাঁধা হতো— সেই মুঠা আবার পানিতে সাজানো হতো একটার ওপর আরেকটা দিয়ে। স্রোত থাকলে অনেক মুঠা দিয়ে তৈরি চাঁই ভেলার মতো ভাসিয়ে কিংবা স্রোত না থাকলে বৈঠা বা চহির (একটা বাঁশ জাতীয় বড় দণ্ড) দিয়ে বেয়ে কৃষকের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হতো। পানি থেকে এরপর উঠিয়ে কয়েকদিন ডাঙ্গায় সাজিয়ে রাখা হতো পাতা ঝরার জন্যে। পাতাজরা শেষ হলে কোনো ডোবাপুকুরে পাটগাছ পচানোর জন্যে জাক দেয়া হতো। কয়েকদিন পরপর কৃষক পরীক্ষা করে দেখতো পাট পচেছে কি-না। ১৫-২০ দিন পর আকাজ্জিত রূপে পচে আসলে আবার ডাঙ্গায় তোলা হতো পাটখড়ি থেকে আঁশ আলাদা করার জন্যে। এই কাজটি নারী-পুরুষ উভয়ে মিলে করতো। এসময় বাড়িতে বাড়িতে উৎসবমুখর অবস্থা তৈরি হতো। পাটের গাঁ থেকে বাতাসে ছড়িয়ে যেত একধরনের ভাল-লাগা পচাগন্ধ। সেই গন্ধের কথা আমার আজও মনে পড়ে। এরপর ছাড়ানো আঁশ এরপর পরিষ্কার পানিতে ধোয়া হতো— তখন পাটের সিঁদল খেতে আসতো ছোট ছোট অসংখ্য মাছ। একেকটি মুঠা ধুয়ে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হতো— অনেকগুলো মুঠা দিয়ে বাঁধা হতো বড় বড় আঁটি। সেই আঁটি বাড়িতে নিয়ে বাঁশের ওপর রোদে শুকাতে দেয়া হতো। উঠানে কিংবা বাড়ির সামনে বা পেছনের খালি

জায়গায় রোদে দেয়া হতো পাটখড়ি— মনে পড়ে পাটখড়ির ওপর অসংখ্য ফড়িং আর প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসতো ।

পাট শুকানো শেষ হলে পুনরায় আরেক ধরনের মুঠি বাঁধা হতো যা দেখতে অনেকটা বাঙালি নারীর চুলের খোপার মতো । এরপর বিক্রির পালা । কোনো কোনো ফড়িয়া বড় নৌকা নিয়ে গ্রামের কাছাকাছি নোঙর করে কয়েক দিন ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কৃষকের কাছ থেকে পাট কিনে নৌকা ভরে তুলতো । একসময় নৌকা শহরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যেত । অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য কৃষক তার আর্থিক প্রয়োজন অনুসারে পরিমাণমতো বাজারে নিয়ে পাট বিক্রি করতো । বিক্রির টাকায় কিনে আনতো ইলিশ মাছ, আম, কাঠাল, কাপড়চোপড় আরও কত কী । এগুলো খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার । আজকাল গ্রামে গেলে কিছু কিছু জায়গায় পাটচাষ থাকলেও আগের সেই যৌলুস নিয়ে পাট যেন আর আগের জায়গায় নেই । মনটা খারাপ হয়ে আসে পাটের সেই সব দিনের কথা মনে হলে ।

পাটখড়ি ছিল গ্রামের অন্যতম জ্বালানী । সারা বছর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বড় বড় মাচা বানিয়ে সেখানে পাটখড়ি সংরক্ষণ করা হতো । পাটখড়ি দিয়ে জ্বালানী ছাড়াও বেড়া তৈরি করা হতো । এমন পরিবার গ্রামে তখন ছিল না, যাদের পাটখড়ির অন্তত একটা বেড়া ছিল না । পর্দারক্ষা জনিত কারণে বা অন্য কারণে কোনো কোনো বাড়ির বাহির দিকে পুরো এক বা দুইধার দিয়ে পাটখড়ির বেড়া তৈরি করতে দেখা যেত । পাটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পাটশাক । চৈত্র মাসে প্রতিটি বাড়ির সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হতো পাটশাক । এখনো এই শাক পাওয়া যায় কিন্তু আগের মতো যেন আর স্বাদ-গন্ধ নেই তাতে । পাটশাকের প্রসঙ্গ এলে হারিয়ে যেতে হয় সেই শৈশব-কৈশোরে ।

দুই.

একসময় পাট ছিল বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক আয়ের খাত । অবশ্য এখন সেখানে গার্মেন্ট ও রেমিটেন্স এসেছে । তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়, আমাদের পাট-খাতের এই দশা হলো কেন? একে একে পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে গেল । কৃষকের উৎপাদিত পাটে চাকা ঘুরতো ওই সব পাটকলের । একসময় কলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কৃষক পাট বিক্রি নিয়ে পড়লো মহাসংকটে । নিরুৎসাহিত হয়ে পাট উৎপাদন কমিয়ে দিল কৃষক । তবে জীবীকার টানে তাদের পক্ষে একেবারে বন্ধ করা সম্ভব হলো না পাট উৎপাদন । বর্তমানেও পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় । উৎপাদিত এই পাট-শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন অনুসারে পাটকল না-থাকায় ব্যাপক পরিমাণে পাট ভারতের পাটকলগুলোতে যেতে আরম্ভ করে ।

বলা যায়, বাংলাদেশের পাটশিল্পের মৃত্যুর ভেতর দিয়ে ভারতের পাটশিল্প রমরমা হয়ে ওঠে। যে বছর বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল ‘আদমজী’ বন্ধ হয়ে গেল, সে বছর ভারতে নতুন দশটি পাটকল স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে কেউ কেউ বলেছিল, বিশ্বে পাটের চাহিদা আগের মতো আর নেই— সেক্ষেত্রে প্রশ্ন এসে যায়, দাহিদাই যদি না থাকবে, তাহলে ভারতে তখন এতোগুলো নতুন পাটকল স্থাপিত হলো কেন? সুতরাং এ-কথা পরিষ্কার যে, বাংলাদেশের পাটশিল্প কেবল দেশীয় অরাজকতারই শীকার হয়নি, বরং বহির্বিশ্বের কোনো কোনো দেশের ষড়যন্ত্র সক্রিয় ছিল বাংলাদেশের পাটশিল্প ধ্বংসের পেছনে।

তিন.

কয়েক বছর আগে একটা সুসংবাদ শুনে সত্যি আশাবাদী হয়েছিলাম। ড. মকসুদুল আলম একদল গবেষক নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করে পাটের জেনম আবিষ্কার করেছেন। আরও জানা গেল, এই আবিষ্কারের ফলে জেনম সমন্বয়ের মাধ্যমে পাটগাছকে আরও বেশি মোটা ও লম্বা আকারে ফলানো যাবে। আগে যে ঋতুতে, যেসব অঞ্চলে পাট জন্মাতো না, এখন সেই শুষ্ক মৌসুমে এমনকি পাহাড়ী অঞ্চলেও পাটচাষ করা সম্ভব হবে। পাটের আঁশকে করা যাবে আরও উন্নত মানের এবং আগের তুলনায় আরও পচনরোধী। তাছাড়া এই ‘জেনম সমন্বয় বিজ্ঞান’ অন্য কোনো দেশ ব্যবহার করতে চাইলে বাংলাদেশ তাদের কাছ থেকে পাবে বড় অঙ্কের রয়্যালটি। সুতরাং অবধারিতভাবে পাট বাংলাদেশে বয়ে আনতে যাচ্ছে এক নতুন সুদিন।

আমাদের শুধু ভয়— বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সার্বিক অব্যবস্থাপনা ও অসততা নিয়ে। দেশপ্রেমের অভাবেই একটি জাতির পক্ষে এতোগুলো পাটকল বিচার-বিবেচনা ছাড়া বন্ধ করে দেয়া সম্ভব। সেই একই জাতি জেনমের মতো একটি অতি স্পর্শকাতর বিষয়কে কীভাবে চূড়ান্ত সফলতার দিকে নিয়ে যাবে— ভয় ওই একটি জায়গাতেই।

তারপও আশা রাখতে চাই। চাই পাটের জেনম পেটেন্টের সঙ্গে যে বিজ্ঞানীরা যুক্ত রয়েছেন, তারা নতুনভাবে চিন্তা করবেন অতীতের নেতিবাচক সকল অভিজ্ঞতা থেকে। তাহলেই কেবল রেমিটেন্স, গার্মেন্টস-এর মতো জাতীয় শীর্ষ-আয় অর্জনকারী খাত হিসেবে আমরা আবার ফিরে পাব সোনালী আঁশকে। দেশে যে ভাল, সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ একেবারে নেই, সেটা হতে পারে না- আমরা নির্ভর করতে চাই ওই মানুষগুলোর ওপর। আমরা বিশ্বাস করতে চাই, অনেক ব্যর্থতার পরও মুক্তি আমাদের অবশ্যম্ভাবি।

[লেখক: প্রকৌশলী, নিবন্ধকার, সমাজসেবক। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্ট্রীকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড।]

প্র বন্ধ

সোনালি আঁশের জিন-নকশা বাংলাদেশকে বদলে দেবে

মো. মাহবুবুল ইসলাম

স্বাধীন বাংলার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাটের অমিত সম্পদ ও সম্ভাবনার বিষয়টি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি জানতেন অতীতের ডাঙি-লন্ডন-কোলকাতা, করাচি, পিন্ডির সম্পদ বিকাশে পাটের অবদান অনস্বীকার্য। তাই লক্ষ করা যায় সুদীর্ঘ কালব্যাপী আর্থ-রাজনৈতিক চিন্তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পশ্চাদপট নির্মাণে তিনি পাটকে সর্বদাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণের জন্য তিনি পাটখাতকে সুপরিকল্পিত উপায়ে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। পাট প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা এবং প্রত্যক্ষ কর্মোদ্যোগকে দুটি পৃথকভাবে উল্লেখ করা

যেতে পারে। প্রথম বঙ্গবন্ধুর আর্থ-রাজনৈতিক চিন্তায় পাট প্রসঙ্গ আর দ্বিতীয় স্বাধীন বাংলাদেশে পাটখাতের পুনর্গঠন তাঁর সূচিত ব্যবস্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তার অর্থ হচ্ছে পাট প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর চিন্তার দূরদর্শিতা আর অপরটি চিন্তা ও কর্মের গভীর সমন্বয় সাধন। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও পাট। এই তিনটি শব্দ আমার জানামতে এক-আত্মা। কারণ বঙ্গবন্ধুকে ভাবতে হলে বাংলাদেশকে ভাবতে হয় আর বাংলাদেশকে ভাবতে হলে পাটকে ভাবতে হবে। বঙ্গবন্ধু যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এক দীর্ঘ, জটিল এবং বহুমুখী কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যিক স্তর অতিক্রম করেই পাট চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। এক্ষেত্রে নিবিড় এবং কার্যকর সমন্বয়ের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের পাটখাত নিয়ে তাঁর গঠনমূলক উদ্যোগের ফলে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই পাট মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু গভীর দূরদৃষ্টি দিয়ে ঠিকই বুঝেছিলেন, কৃষকের মাঠের পাট ক্রয় থেকে শুরু করে বিদেশের বাজারে পাটজাত পণ্য বিক্রয় পর্যন্ত জটিল ব্যবসায় সাফল্যের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যকর সমন্বয়ের খুবই দরকার।

গত বছর আমি এর উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। আমার জানামতে পাটের সোনালি আঁশের জন্যই বাংলার নাম হয়েছে সোনার বাংলা। বঙ্গবন্ধু যখন বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানি শোষকেরা সোনার বাংলার পাটের টাকা নিয়ে ইসলামাবাদ তৈরি করছে তখনই শুরু হয় দ্বন্দ্ব। আর সেই দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটে স্বাধীনতা দিয়ে। কিন্তু বর্তমান সরকারের নির্বাহী প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, জননেত্রী, গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা, তিনিও বুঝতে পেরেছেন এই ফসল সোনার ফসল। পৃথিবীর একমাত্র বাংলাদেশেই ভালো মানের পাট উৎপন্ন হয়। এর ভবিষ্যৎ এখনও খুবই উজ্জ্বল। গত ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে যুগান্তকারী বিজয়ের পটভূমিতে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। জননেত্রী শেখ হাসিনার দিনবদলের সনদের প্রতি দেশবাসী বিশেষত তরুণ সমাজের অভূতপূর্ব সমর্থন এবং বিপুল প্রত্যাশা দেশের সামনে একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। সবাই ভেতরে ভেতরে বেশ আবেগাপ্ত ও উত্তেজনা অনুভব করে, আর তারই ফলশ্রুতিতে প্রবল একটা আশাবাদ জেগে ওঠে সবার মনে, এবার একটা কিছু হবে। আর তাই হল। সেই দিনবদলের ডাক দেয়া সরকারের অর্থায়নেই সাফল্য লাভ করল পাটের জিন-নকশা উন্মোচন কার্যক্রম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উৎসাহ ও প্রেরণা এবং শ্রদ্ধেয়া বেগম মতিয়া চৌধুরী, মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর দৃঢ়চিত্ত ও একনিষ্ঠ উদ্যোগ এই স্বপ্নযাত্রার স্বপ্নকে বাস্তবায়নে রূপ দিতে এককভাবে আশা যুগিয়েছেন। আজ প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদরা

সম্পদের হাজারো সীমাবদ্ধতার মাঝেও যুগোপযোগী গবেষণার সাফল্যের ধারা ধরে রাখতে সক্ষম ।

জিন-নকশা/জিনম-সিকোয়েন্সিং এবং পাট

আমি একজন পাটের কৃষিবিজ্ঞানী, কৃষিতত্ত্ববিদ । তারই সূত্র ধরে গত প্রায় ২২ বছর যাবত পাটের কৃষিক্ষেত্রে গবেষণার কাজ পরিচালনা করে আসছি । জিন বিজ্ঞান বা বায়োটেকনোলজি আমার বিষয় নয় তবে কাজের সাথে জানা আর জানার সূত্র ধরেই কিছু কথা লিখার চেষ্টা করা । পাদ্রি গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের কথা আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি । তিনিই প্রথম জীবনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা করেছিলেন । যেমন লম্বা আর খাটো মটরশুঁটির বৈশিষ্ট্য কিভাবে বংশানুক্রমে প্রবাহিত হয়, সেটি জানতে গিয়ে তিনি খুঁজে পান এক নতুন বিজ্ঞানের । তাঁর ধারণা থেকেই মানুষ জানতে পারে যে, দেখতে যেমনই হোক আর বহিরাবরণে যাই থাক, জীবনের বৈশিষ্ট্যেরও একক আছে এবং সেই এককের ভিন্নতার জন্য জীবনের নানা প্রকাশ । তবে তখনও মেন্ডেলের এই ধ্যানধারণা গুরুত্বের সাথে কাজও নজর কাড়তে পারেনি । তার প্রায় ১০০ বছর পর মানুষ তাঁর এ ধারণার কথা জানে এবং বিশ্বাস করতে শুরু করে । আস্তে আস্তে শুরু হয় বংশগতি বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ । মানুষ জানতে পারে জীবনের বৈশিষ্ট্যের একক হল জিন, আর সেই বিজ্ঞান হল জেনেটিক্স । তার পর আবার ধিমধরা গতিতে কেটে যায় প্রায় ৫০ বছর । একসময় ধরা দেয় একজোড়া বিজ্ঞানী, নাম ওয়াটসন ও ক্রিক, যাদের দেওয়া ধারণা থেকেই মানুষ জানতে পারে জিন মাত্রই এক ধরনের এসিডের চাঞ্চল্য । নিউক্লিক এসিড (ডিঅক্সিরাইবো বা রাইবো) । সবটার নাম ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড) বা আরএনএ (রাইবো নিউক্লিক এসিড) । ডিএনএ-এর কাজ হল জীবনের জন্য কী ধরনের প্রোটিন বানাতে হবে, সেটির নির্দেশনা নিয়ে কাজ করা । আর আরএনএ-র কাজ হল সেই বার্তা প্রয়োজনীয় স্থানে বয়ে নিয়ে যাওয়া । তার অর্থ হল জীবন মানেই ডিএনএ ও আরএনএ-র দৌড়ঝাঁপ ছাড়া কিছু নয় । একজন মানুষের চোখের রং নীল হবে না কালো হবে, তার তথ্য প্রথম মাতৃকোষেই লিখা থাকে, লিখা থাকে ডিএনএ দ্বিসূত্রকের বিন্যাসে । মাতৃকোষের বিভাজন থেকে শরীর গঠনের এক পর্যায়ে চোখ গঠিত হয় । আর তখন আদি কোষের ডিএনএ থেকে আরএনএ নীল চোখের বার্তা পৌঁছে দেয় সেখানে । তৈরি হয় নীল চোখ, আর আমরা দেখি নীলনয়নাকে । এভাবেই আসলে সব জীবকোষের সব বৈশিষ্ট্য সঞ্চিত আছে ডিএনএ-র জিনে । মোট কথা কোনো জীবের জীবনকে বুঝতে হলে, তার জিনের অনুক্রম বা বিন্যাসটা জানতে হবে । আর এটাই হল জিনবিজ্ঞানের মূল বিষয় । অর্থাৎ জীবনরহস্যের

আসল বিষয় জিন-নকশা বা জিন সিকোয়েন্স। পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম ভাইরাস থেকে সবচেয়ে জটিলতম মানবসত্ত্বানের মাঝে একটা গভীর মিল আছে। তাদের সবার গঠনের একটা নীল নকশা আছে। আর সেই নীল নকশা অনুযায়ীই কেউ পিঁপড়া আর কেউবা বিশাল আকারের হাতি, কেউ লজ্জাবতী আর কেউ বটগাছ, কেউ সাপ আর কেউবা জলহস্তী হয়ে গড়ে উঠে। এটুকু তথ্য যদি বিশ্বাস করা যায় তাহলে পরের অংশটুকু আরো চমৎকার ও চমকপ্রদ। সেটা হল পৃথিবীর সকল প্রাণীরই একটি জীবননকশা আছে এবং সেই নকশার ভাষা একটি। সেই ভাষাটি লিখা হয়েছে ইংরেজির মাত্র চারটি অক্ষরে। আর সেই চারটি অক্ষর হচ্ছে এ, টি, সি এবং জি। যা জীবনের মৌলিক উপাদানগুলোর আদ্যক্ষর। সম্প্রতিকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এমন পর্যায় পৌঁছে গেছে যে, মানুষ ইচ্ছা করলে যে কোনো প্রাণের উৎসের চার অক্ষরে লিখা জীবনের সেই নীলনকশাটি পড়ে ফেলতে পারে। মানুষের জীবনে সেই নীলনকশাটির নাম “মানবজিনম”। সবমিলিয়ে সেই জিনম বা নীলনকশায় আছে ৩০০ কোটি অক্ষর যা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় “বেসপেয়ার”।

পাট একটি অর্থকরী মাঠফসল। এটি গাছ। এরও জীবন আছে। পাটের বেলায় ঐ অক্ষরের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক, ১২০ কোটি যা সম্প্রতি আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা বের করতে সক্ষম হয়েছেন যাকে বলা হয় “জুট-জিনোম সিকোয়েন্স”। এই জিনোম সিকোয়েন্স বের করার কাজটা ছিল খুবই জটিল। এই সিকোয়েন্সের মধ্যেই পাটের জীবনরহস্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ধাপে ধাপে সাজানো আছে। পাটের সকল বৈশিষ্ট্যের তথ্যসম্বলিত একটি সাজানো নীলনকশার গঠনই আসলে “জুট জিনোম সিকোয়েন্স”। আমাদের দেশে শীতকালে পাট হয় না। আর যে কারণে হয় না, সে তথ্যটি জিনোম সিকোয়েন্সের কোথাও না কোথাও আছে। যা বিজ্ঞানীরা বের করে একটা নতুন জাতের পাট উদ্ভাবন করতে পারবেন, তখন কনকনে শীতেও পাট ফসলে মাঠ ভরে যাবে। আর বিজ্ঞানীরা চাইলে ঠাণ্ডা পানির পাট, লোনা পানির পাট, কম পানির পাট, চিকন সুতার পাট, শক্ত/নরম আঁশ উৎপাদনকারী পাট, পোকা/রোগ-নিরোধক পাট, ওষুধি পাট এমনকি রঙিন পাটের জাত পর্যন্ত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবেন ভবিষ্যতে। পাট কিন্তু তার আঁশের রং-এর জন্য সোনালি আঁশ নাম হয়নি। তার অর্থমূল্যটাই ছিল মূল ভিত্তি। স্বর্ণের রঙের মতো জিনিসের স্বর্ণের মতো দাম, তাই সোনালি আঁশ। বাংলার মাটি পাট চাষে খাঁটি।

কথাটি সত্যি। পাট আঁশের চাহিদা একসময় বিশ্বব্যাপী ছিল। যার ফলে পাট হয়ে ওঠে আমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল। তবে সব আশার সাথে নিরাশাও থাকে। উন্নতবিশ্বে হঠাৎ করে আবির্ভূত হয় প্লাস্টিক পণ্য, পলিথিন, কৃত্রিমতন্তু। ফলে রাতারাতি পরিবেশবান্ধব পাট হারিয়ে যায়। আর আমাদের পাটও হারিয়ে ফেলে তার সোনালি অর্থের আভা। তবে দিনের আবার বদল হয়। কিন্তু ততক্ষণে বেশ সময় লেগে যায়। অবশেষে মানুষ বুঝতে পারে কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত আঁশের ক্ষতিকর প্রভাব ও তার পরিণতিতে পরিবেশের বিপ্লয়ের কী রূপ। আর সাথে সাথেই শুরু হয় পরিবেশের বন্ধুর সন্ধান। তাতেই শুরু হয় পাটের সোনালি আলোর প্রতি পৃথিবীর পরিবেশের হাতছানি।

যেহেতু সময়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং পরিবেশের চাহিদার রূপ পাল্টিয়েছে তাই পুরনো ধ্যানধারণা বাদ দিয়ে নতুনভাবে শুরু করা প্রয়োজন। আর তার জন্য প্রয়োজন ধবধবে পাট। যাতে ব্লিচ করার প্রয়োজন না হয় এবং লিগনিন কম থাকে, যার আঁশ হবে মানসম্পন্ন ও মিহি। তবে সমস্যা হল পাট খুবই স্পর্শকাতর। পোকাকার আক্রমণ ও রোগবালাই সহ্য করতে পারে না। আবার এমন পাট আছে যে, পোকাকার আক্রমণ সহ্য করতে পারে কিন্তু লিগনিন বেশি। পচাতে অনেক সময় লাগে। তাই শুরু হল কম লিগনিনওয়ালা পাটের খোঁজ করা। কিন্তু সেটা কোথায় পাওয়া যাবে? ধানের অভিজ্ঞতা থেকে সহজেই চিন্তা করা যায়, নিশ্চয়ই এমন পাট প্রকৃতিতে আছে যার দেহে লিগনিনের পরিমাণ কম। অতএব বিজ্ঞানীদের কাজ হবে একটির বৈশিষ্ট্য অন্যটিতে ঢুকিয়ে দেয়া। তবে তা করতে গিয়ে দেখা গেল ধানের মতো হাজার হাজার জাত পাটের নেই। পাটের আছে হাতেগোনা কয়েকটি জাত। এখন কী করা? সাথে সাথে ঢাকার বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাব ও টেকসাসের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের মধ্যে সমন্বয়ের আলোচনায় ধরা পড়ে গেল বিজ্ঞানী ম্যাগ্‌ভেল, ওয়াটসন ও ক্রিকের কথা। আর সেই কথা থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়া হল, পাটের বর্তমান যুগোপযোগী উন্নত জাত পেতে হলে জানতে হবে পাটের মুক্ত বৈশিষ্ট্যের রহস্য অর্থাৎ পাটের জিননকশা। আর তা জানলেই জানা যাবে কোন জিন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যটিকে ধারণা করছে বা লিগনিনের আধিক্যের জন্য দায়ী কে অথবা কোন জিন বৈশিষ্ট্যের জন্য ধবধবে পাটে পোকাকার আক্রমণ হয় ইত্যাদি। এটা যে শুধু বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদেরই চিন্তার বিষয় ছিল তা নয় বিশ্বের সবকটি পাট উৎপাদনকারী দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক অদৃশ্য যুদ্ধ চলছিল পাটের জিননকশা সবার আগে উন্মোচন করার জন্য। অবশেষে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন, বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলমের নেতৃত্ব ও বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠান, ডাটাসফট এদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সফল হল পাটের জিন-নকশা উন্মোচনের বিশাল কাজ, আর তার সাথে খুলে গেল পাটের যুগোপযোগী জাত উদ্ভাবন ও বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের বায়োটেকনোলজি বিষয়ে নতুন ভুবনে কাজ করার সুযোগ। বিশ্বের প্রাণরসায়ন গবেষণায় পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন বাংলাদেশের জন্য একটি অভাবনীয় অর্জন। বিশ্বে এ পর্যন্ত ১৭টি উদ্ভিদের জীবনরহস্য উন্মোচিত হয়েছে। এই প্রথম বাংলাদেশের মতো কোনো উন্নয়নশীল দেশের বিজ্ঞানীরা এ কাজে বড় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

শেষকথা

পাটের জিন-নকশার সুবাদে পাটচাষকে বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ুর উপযোগী করে আঁশের সেরা মান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সম্ভব হবে উন্নতমানের পাটের জাত উদ্ভাবন করে পাটের ফলন ও আঁশের মান বাড়িয়ে বিশ্বে পাটের বাজারে বাংলাদেশকে আবারও সুপ্রতিষ্ঠিত করা। উন্নত জাতের সুতা ও ওষুধ তৈরিতেও এ আবিষ্কার অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশেষ ধারণা।

এতসব সম্ভাবনাকে জোড়া লাগালে একদিকে কৃষি ও কৃষকের বিকাশ, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধির উজ্জ্বল ছবি অনুমান করা অসম্ভব কিছুই নয়। এখন তথ্যপ্রযুক্তি আর বায়োটেকনোলজির সহযোগিতায় বাংলাদেশের দিনবদলের নতুন অধ্যায় শুরু হবে। এই আবিষ্কার রোগবালাই দমন করে বৈরী আবহাওয়ায় পাটকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। একইসাথে অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে ফলে লাখ লাখ কৃষকের মুখে হাসি ফুটবে। পাট সত্যিকার অর্থে আবারও সোনালি আঁশে পরিণত হবে। তবে এখন প্রয়োজন মাঠপর্যায়ে প্রায়োগিক সাফল্য অর্জনের সব ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিশ্চিত করা। আর তারজন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণা ও সরকারের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতা।

[লেখক: পাট গবেষক, পরিচালক, প্রশাসন ও অফ বাংলাদেশ পাট গবেষণা
ইনস্টিটিউট।]

আমাদের শ্রেষ্ঠ মেধাসম্পদ

হা সিনা খান

অন্য কোনো কাজে এরকম job satisfaction পাওয়া যায় কিনা জানি না। আমার job-এ আমি ষোল আনার চেয়ে বেশি satisfied। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাসম্পদ নিয়ে কাজ করার মজাই আলাদা। প্রতিদিনই কর্মস্থলে আসার জন্য একটি magnetic pull অনুভব করি। নেশাজাগানো এক আকর্ষণ।

আমার গবেষণাগারে একদল প্রাণোদ্ভিদ তরুণের মাঝে নিজেকেই যেন প্রতিদিন নতুন করে আবিষ্কার করি। প্রতিকূল পরিবেশে সোনা ফলানোর, স্বপ্ন দেখানোর একগুচ্ছ প্রাণ। এরা স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্যম রাখে এবং এদের স্বপ্নযাত্রায় সহযাত্রী হতে পেরে আমি গর্বিত।

কলেজ শেষ করছি এরকম সময় আমার সেজ ভাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরলেন। সেটা ১৯৭৪ সালের কথা। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Biochemistry'র জয়জয়কার। (Molecular biology'র স্বর্ণযাত্রা শুরু হলেও তখনও তেমন প্রসার পায়নি)। ভাইয়ের অনুপ্রেরণায় ভর্তি হলাম Biochemistry তথা প্রাণরসায়ন বিভাগে। এমন এক জগতে আমার অনুপ্রবেশ ঘটল যেখানে প্রতিনিয়তই যেন বিস্ময় অপেক্ষা করে। সে বিস্ময়ের ঘোর আজ ৪২ বছর পরও কাটেনি। কতদিন পড়তে গিয়ে পড়াতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিয়েছে। বিস্ময় জেগেছে। প্রকৃতির কাজ করার অদ্ভুত নিয়ম, নিজেদের মধ্যে অপূর্ব সহযোগিতার মধ্যে কাজ করে যাওয়া ভাবতেই শিউরে উঠি। এরই মধ্যে আস্তে আস্তে molecular biology যাকে আমরা নাম দিয়েছি অনুপ্রাণ বিজ্ঞান তা সম্পর্কে জানতে শুরু করেছি এবং এ বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা জন্মেছে এবং প্রকৃতির প্রতি আরো শ্রদ্ধাশীল হয়েছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমি মাস্টার্স thesis এর কাজ করছি তখন আরো ভালোভাবে molecular biology কে বুঝতে শিখেছি এবং মানবকল্যাণে এটি ব্যবহারের অপার শক্তি উপলব্ধি করেছি। তাই পিএইচডি করতে এই অনুপ্রাণ বিজ্ঞানকেই বেছে নিই। পিএইচডি'র গবেষণা করতে আবিষ্কার করলাম আরো একটি বিস্ময় যা হচ্ছে উদ্ভিদজগতের রহস্য।

Molecular biology-কে রপ্ত করে যখন দেশে ফেরা তখন আমার বাবা বেঁচে নেই। কিন্তু মনে পড়েছে বাবার দেশপ্রেম এবং দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ১৯৬০-এর শুরুতে তাঁর মেজ ছেলেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার না বানিয়ে-এ পাটসংক্রান্ত পড়াশুনার জন্য Jute Technology Institute, কোলকাতায় পাঠানোর কথা। এসব আমাকে উদ্বুদ্ধ করল। শুরু করলাম পাট নিয়ে গবেষণা এবং পাটের molecular biology বোঝার। আমাদের সৌভাগ্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাট আমাদের দেশে জন্মে এবং বাংলাদেশ পাট গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে পৃথিবীর সব দেশ থেকে সংগ্রহ করা পাট এবং পাটের মতো তত্ত্ব তৈরি করে এমন গাছের বীজ যা প্রায় ৬০০০-এর মতো। যেন এক রত্নভাণ্ডার।

১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় সারা দেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। কৃষকদের পাল্লাটা ছিল সবচেয়ে ভারি। বন্যা-পরবর্তী সময়ে চাষিরা পাটের বীজশূন্য হয়ে পড়েছিল। এসময় পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আনা নিম্নমানের বীজের কারণে পরের বছরগুলোতে কৃষকেরা লাভের মুখ দেখতে পারেনি। এ সময় পাটের বীজ, ডিএনএ দেখে সনাক্ত করার কাজে সফল হই। গবেষণা শুরু করি গোল্ডেন ফাইবার খ্যাত পাট নিয়ে। আমার মলিকিউলার বায়োলজি ল্যাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে নিয়ে দেশে সর্বপ্রথম পাটের জিন নিয়ে গবেষণা শুরু করি। ২০০০ সালে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং-এর মাধ্যমে পাটের জাত নির্ণয় করা ল্যাবের প্রথম সাফল্য। এছাড়া 'টিস্যু কালচার অনির্ভর পদ্ধতি' উদ্ভাবন করে জেনেটিক ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে গবেষণা চলছে লবণ সহনশীল পাট উদ্ভাবন ও পাটের আঁশের পুরুত্বের জন্য যে উপাদানটি কাজ করে, যাকে লিগনিন বলে আমরা চিনি সেই লিগনিনের পরিমাণ কমানো নিয়ে। পাটের জিনোম আবিষ্কারের জন্য ডিএনএ সিকুয়েন্সিং উপযোগী ডিএনএ তৈরি করা হয়েছিল আমার মলিকিউলার বায়োলজি ল্যাবেই।

সারাবিশ্বে বাণিজ্যিকভাবে পাটের দু'টি প্রজাতির চাষ হয়। আমাদের দেশে প্রজাতিদ্বয় দেশি ও তোষা পাট নামে পরিচিত। পাট শুধু ফসল হিসেবে নয় ঐতিহ্যগত ভাবেও আমাদের দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। লুপ্তপ্রায় এই national heritage-এর বহুমুখি ব্যবহার করে এর অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যেই মূলত পাটের জীবনরহস্য উদঘাটনের ধারণাটা তৈরি হয়।

একটি জীবের জেনোম হচ্ছে একটি বইয়ের মতো, যেখানে সেই জীবের জীবনগল্প লেখা থাকে। একটি জীব কেন কেবলই তার নিজের মতো, কেন সে তার জন্য নির্ধারিত কাজগুলোই করে, তার পূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে তার জেনোম গ্রন্থে। জীবের এই জীবনগল্প খোঁদিত হয় তার জেনেটিক পদার্থ বা জেনোমে, যা

চার ধরনের বেস বা নিউক্লিটাইডের সমবায়ে গড়ে ওঠা ডিএনএ দিয়ে তৈরি। যুগলবন্দি এই বেসগুলো বিভিন্ন সজ্জায় সজ্জিত থাকে এবং এদের সংখ্যা হতে পারে কয়েকশ কোটি পর্যন্ত। যেহেতু যেকোনো জীব-এর প্রত্যেক আণবিক কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় ডিএনএ দিয়ে, তাই একটি জীবের জেনোম রহস্য উদঘাটনের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এমন শস্য উদ্ভাবন করতে পারবেন যারা দ্রুত বাড়বে, রোগব্যাদির বিরুদ্ধে বেশি প্রতিরোধী হবে, এবং অধিকতর কার্যকারিতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষণ করবে।

পাট পরিবেশবান্ধব ও অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন শস্য হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যশস্য সহ অন্যান্য ফসলের চাপে ক্রমান্বয়ে marginal land-এ চাষের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে পাট ফসল বিভিন্ন রোগ, পোকামাকড় ও অজীবীয় কারণ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। পাটের জেনোম সিকুয়েন্স জানার কারণে একটি প্রযুক্তিগত মঞ্চ তৈরি হবে, যার মাধ্যমে পাটের বহুমুখি ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এর মধ্যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য সঞ্চারণ সম্ভব হবে। উদ্ভব করা যাবে ঘাত সহনশীল পাট। আরো সম্ভাবনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাটের তন্তুর দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করা, যাতে একে সহজেই তুলা এবং সিল্কের সাথে মিশিয়ে মিশ্রতন্তু তৈরি করা যায়; কিংবা এর গঠনগত পরিবর্তন, যাতে পাট থেকে তৈরি কাগজের গুণগত পরিবর্তন করা যায়। এসব প্রতিটি কৌশলেরই উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে সিকুয়েন্সিং, যা জেনেটিক বিশ্লেষণের কৌশলকে শক্তিশালী করে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ জিন সনাক্তকরণ ও এসব জিনের মেধাস্বত্ব এখন আমাদের থাকবে।

পাটের যে কোনো ধরনের উন্নয়ন, জিনোমের তথ্য ব্যবহার করে করা সম্ভব হবে, যেমনটি সম্ভব হচ্ছে ধানের ক্ষেত্রে। গত ২০০৫ সালে ধানের জেনোম Sequenced হয়ে যাওয়ার পরে নানাবিধ জেনোম তথ্যভিত্তিক গবেষণা ধানের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে, রাখছে প্রতিকূল পরিবেশে সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনে। সিকোয়েন্স জানার কারণে বর্তমানে ধানের উৎপাদন বাড়ানোতেও সফলতা আনা সম্ভব হয়েছে।

পাটের জীবনরহস্য বা বিজ্ঞানীদের ভাষায় Jute genome sequencing-এর চিন্তা যখন করা হচ্ছে তখন প্রথম যে চিন্তাটি সবার মনে জাগল তা হচ্ছে কোন প্রজাতির পাটের জেনোম sequencing করা উচিত। প্রজাতিদ্বয়ের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে দেশি পাট-এর উৎপত্তি, পক্ষান্তরে তোষা পাট-এর উৎপত্তি আফ্রিকা মহাদেশে। তবে তোষা পাটের গুণগতমান, চাষাবাদের ব্যাপকতা এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার কথা বিবেচনা করে স্থির করা হল যে তোষা পাটেরই জিনোম sequencing করা হবে। তবে এর জন্য নির্দিষ্ট জাতের কেবলমাত্র একটি গাছ থেকেই বীজ সংগ্রহ করতে হবে, যাতে genome sequencing-এর উৎস

গাছগুলোতে মাতৃগাছের সকল গুণাগুণ বজায় থাকে। উল্লেখ্য একই জাতের বিভিন্ন গাছ জেনোম পর্যায়ে ভিন্নতর হয়ে থাকে। এ কারণে genome sequencing-এর জন্য শুধুমাত্র একটি গাছের জেনোম নেওয়া হয় যাতে প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে জটিলতা এড়ানো যায়।

পাতা, বীজ বা গাছের অন্য যে কোনো অংশ থেকে ডিএনএ (genome-এর মূল উপাদান, এবং এটিই sequencing করা হয়) সংগ্রহ করা যায় কিন্তু আমাদের অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায় পূর্ণবয়স্ক পাতার চেয়ে এক সপ্তাহ বয়সী চারাগাছ থেকে আহরিত ডিএনএ উন্নতমানের ও sequencing উপযোগী হয়। বলাবাহুল্য পুরো genome sequencing-এর জন্য যে পরিমাণ ডিএনএ প্রয়োজন তা একটি পাটগাছের বীজ থেকে পাওয়া কঠিন। এই লক্ষ্যে প্রথমে বাংলাদেশ পাট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রজনন বিভাগের বিজ্ঞানীদের সহায়তায় তোষা পাট জাত, বিজেআরআই তোষাপাট - ১ (O-4) জাতের একটি গাছ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষণ প্লট থেকে সনাক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের মলিকুল্যার বায়োলজি ল্যাবে উদ্ভাবিত পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে এটি O-4 জাতেরই পাটগাছ।

ডগা কাটিং পদ্ধতির মাধ্যমে একটি বীজ থেকে পাওয়া গাছ থেকে অনেক O-4 জাতের পাটগাছ উৎপন্ন করা হয়। Cross fertilization ঠেকানোর জন্য ফুল আসার আগেই গাছগুলোকে নেট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে Cross fertilization-এর মধ্য দিয়ে genomic বিন্যাসের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। বীজ পাকার পর অতি সতর্কতার সাথে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। এই বীজ থেকেই পরবর্তীতে jute genome sequencing-এর ডিএনএ আহরণ করা হয়।

Nucleus ছাড়া একটি কোষের আরো যে দু'জায়গায় ডিএনএ পাওয়া যায় তা হল mitochondria এবং chloroplast। আমরা বহুদিন ধরে পাটের ডিএনএ নিয়ে কাজ করলেও genome sequencing-এর জন্য পাটের mitochondria এবং chloroplast ডিএনএ এর কোনো রকমের contamination ছাড়া শুধুমাত্র nucleus থেকে ডিএনএ আহরণ আমাদের জন্য একটি বিরাট challenge ছিল। বেশ বেগও পেতে হয়েছে এ কাজে। আমাদের জন্য আরও একটি challenge ছিল যতটা সম্ভব ডিএনএ-কে অক্ষত অবস্থায় আলাদা করা অর্থাৎ ডিএনএ যাতে বেশি খণ্ডিত না হয়। এ সব আয়ত্ত করতে আমাদের বেশ সময় লেগে যায়। তবে সমস্যা সত্ত্বেও সফলভাবে আমরা এ কাজ করতে পেরেছি এটাই আমাদের গর্ব।

অল্প সময়ের মধ্যে জিনোম sequence-এর মতো এত বড় এক কর্মযজ্ঞ করা সম্ভব হয়েছে আমাদের মেধাবী তরুণদের জন্য। প্রাথমিকভাবে স্থির হয়েছিল, যে গবেষকদল যুক্ত হবে জিনোম sequence-এর কাজে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

কিন্তু উদ্দমী এই তরুণদের সেটা প্রয়োজন পড়েনি। তারা নিজেরাই পড়াশোনা করে, internet-এর সাহায্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং একটা pipeline দাঁড় করায়, যার মাধ্যমে অতি দ্রুত sequence analysis করা সম্ভব হয়।

এর পরও একটা জায়গায় আমার মধ্যে বিরাট এক হতাশা কাজ করে। আমরা এই মেধাসম্পদ আমাদের দেশে ধরে রাখতে পারছি না।

এখানে কাজ করার অনুকূল পরিবেশ না পেয়ে এই তরুণদল দেশ ছাড়ছে। আমার কষ্ট, আমাদের তৈরি করা, এই গরিব দেশের অর্থে তৈরি করা এই দক্ষ গবেষকদল আমরা ছেড়ে দিচ্ছি উন্নত দেশগুলোকে আরো সমৃদ্ধ করতে।

পাটের জিনোম sequence করার মাধ্যমে আমাদের ইচ্ছে ছিল এ দেশে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণাকে আগে গতিশীল করা। দীর্ঘদিন গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি এ দেশে গবেষণার কোনো culture নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেবল পাঠদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেখানে গবেষকদের কোনো স্বীকৃতি নেই, নেই কোনো মূল্যায়ন, যেখানে গবেষণার পরিবর্তে রাজনীতি করলে শিক্ষকরা বেশি লাভবান হন, পরিচিতি পান সেখানে কে করবে গবেষণা? আমরা চেয়েছিলাম পাটের জিনোম sequencing-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা খাতে বরাদ্দ বাড়াবে, গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরো গবেষণা সহায়তা দেবে। মনে রাখতে হবে মৌলিক গবেষণা না করলে দেশ এগুবে না। এবং মৌলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েই হয়ে থাকে।

এখনো হতোদ্যম হইনি। আমাদের এই মেধাপাচার রোধে বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশে উচ্চমানের গবেষণার জন্য সরকার কার্যকর ভূমিকা নেবে। এই মেধাবী তরুণদল আমাদের সম্পদ, অমূল্য রতন। এদের এ দেশের মাটিতেই সুযোগ করে দিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

[লেখক: অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ

হায়দার আকবর খান রনো

সোনালি ধান আর রূপালি পাটের দেশ বাংলাদেশ। মনে পড়ে গত শতাব্দীর ষাটের দশকে আমরা এ কথাটি প্রায়ই উচ্চারণ করতাম বক্তৃতায়, আলোচনায় অথবা লেখায়। এ কথার মধ্যে কিছুটা কাব্যিক চং থাকলেও কথাটির যথার্থতা ছিল। আমরা অভিযোগ করতাম, আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের পাটের টাকা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ। এই অভিযোগ মিথ্যা ছিল না। গত শতাব্দীর সত্তরের দশক পর্যন্ত কাঁচাপাট ও পাটজাতদ্রব্যই ছিল আমাদের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী। এখন সেই স্থান দখল করেছে রেডিমেড গার্মেন্টস। তাছাড়া বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স থেকে পাচ্ছি সবচেয়ে বড় অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা। কিন্তু এসবের সঙ্গে পাটের কোনো বিরোধিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। পাটজাতদ্রব্য থেকে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা এখনো আছে এবং এমনকি ভবিষ্যতে এর বিকাশের সম্ভাবনাও রয়েছে। মাত্র বছর দশেক আগেও বিশ্বব্যাংক মন্তব্য করেছিল, ‘Bangladesh can have a viable jute industry’ (সূত্র: World Bank letter P/3, তারিখ ৪ এপ্রিল ১৯৯৬ সালে)।

বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে এই যে, সেই বিশ্বব্যাংকই আবার চাপ দিয়েছিল আদমজী জুট মিল বন্ধ করে দেয়ার জন্য। বিশ্বব্যাংকের আজ্ঞাবহ আমাদের সরকার পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জুট মিল আদমজী বন্ধ করে দিল। বাহবা দিল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও জাপান সরকার। তারা তদানীন্তন খালেদা জিয়া সরকারের সাহসী সিদ্ধান্তের প্রশংসা করলেন। আমরা বুঝতে পারলাম না, একটা বড় মিল চালানোর ব্যর্থতার মধ্যে যেখানে গ্লানিবোধ থাকা দরকার, সেখানে প্রশংসার কী আছে। সাহসেরই-বা কী আছে। বলা হয়েছে, আদমজী লোকসান দিচ্ছে। প্রথম কথা আদমজী মোটেও লোকসান দেয়নি। স্বাধীনতার পরবর্তী তিন

দশকের হিসাব নিলে দেখা যাবে আদমজি যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছিল, যে পরিমাণ রাজস্ব দিয়েছিল এবং বিদ্যুৎ ইত্যাদির দাম পরিশোধ করেছিল তার মোট অঙ্কটি, যে লোকসান দেখানো হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। অনেক অর্থনীতিবিদ ভাগ ভাগ করে পরিসংখ্যান দিয়ে এটা প্রমাণ করেছিলেন। এখানে আরো উল্লেখ্য, ব্যক্তিমালিকানাধীন মিলগুলো করফাঁকি দেয়। বিদ্যুৎ ইত্যাদির দাম ঠিকমতো দেয় না। সব মিলিয়ে আদমজি জুট মিল সরকারের জন্য লাভজনকই ছিল। তবু বিশ্বব্যাংকের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে আমাদের গর্ব আদমজি জুট মিল বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। বিশ্বব্যাংকের কাছে আমরা নতি স্বীকার করি কেন? কারণ ওরা টাকা দেয়। অবশ্য কথাটা পুরো সত্য নয়। ওরা ঋণ দেয়, যে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এই ঋণ পরিশোধের প্রধান দায়ভার নিতে হয় গরিব ও মধ্যবিত্ত জনগণকে। অন্যদিকে ঋণের টাকার একটা বড় অংশ নানা কায়দায় হাতিয়ে নেয় আমাদের দেশের কিছু রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও আমলা, যারা হচ্ছে সমগ্র জনগণের অতি সংকীর্ণ স্তর। অবশ্য তারাই হচ্ছে এই সমাজের সবচেয়ে ধনী, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশ। একটা হিসাবে দেখা যায়, ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বকেয়া ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১৭.২ বিলিয়ন ডলার, যা হচ্ছে আমাদের দেশজ উৎপাদনের ৩১.৭ শতাংশ। সেই ২০০৪ সালেই আমরা শুধু ঋণের সুদ বাবদই দিয়েছি ১৬৫ মিলিয়ন ডলার। গড় হিসাবে দেখা যায়, রফতানি আয়ের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ চলে যায় সুদ ও আসলের অংশবিশেষ পরিশোধ করার জন্য। আবার আরেকটা হিসাবে দেখা যায়, ওই ২০০৪ সালেই বিদেশে কর্মরত শ্রমিকরা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ৩৩৭২ মিলিয়ন ডলার। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. খলীকুজ্জমান আহমদ বলেছিলেন, ‘রাজস্ব আদায় এবং সম্পদ ব্যবহারে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন শুধু ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কমিয়ে আনা এবং বিদেশে কর্মরতদের পাঠানো অর্থ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বাড়ানো সম্ভব হলে বাজেটে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।’ কিন্তু আমাদের কর্তব্যক্তি ও নীতিনির্ধারকরা সে পথে যাবেন না। কারণ ঋণের এই পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক না কেন এবং এই ঋণ না নিয়ে চলা সম্ভব হলেও ঋণের টাকা ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ করেই তারা তাদের সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলেছেন। অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন, বৈদেশিক ঋণের তিরিশ শতাংশ ভোগ করে অসাধু রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও আমলারা। তাই বিশ্বব্যাংকের কথা শুনতে হয় এবং এ কারণেই আমাদের পাটশিল্পকে ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পিতভাবেই ধ্বংস করা হচ্ছে।

একটা কথা বলা হয়, পাটের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। কারণ পাটের বিকল্প বেরিয়ে গেছে। পাটের ব্যাগ বা পাটের বস্তার এখন আর আগের মতো কদর নেই। কথাটা ঠিক নয়। কারণ পাট হচ্ছে পরিবেশবান্ধব। পৃথিবীর মানুষ এখন অধিকতর পরিবেশ-সচেতন হচ্ছে। ফলে পাটের চাহিদা আরো বাড়বে। আমরা যখন আদমজি জুট মিল বন্ধ করে দিয়েছিলাম, ঠিক তখন, সে বছরই ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি নতুন করে পাটকল স্থাপিত হয়েছিল। যদি পাটের চাহিদাই না থাকবে তাহলে ভারত কেন নতুন করে পাটকল স্থাপন করবে? বিশ্বব্যাপী এখনো পাটজাতদ্রব্যের চাহিদা কত? FAO-এর রিপোর্ট অনুযায়ী এই বিশ্বে চাহিদার পরিমাণ হল চার লাখ টন। এখনো বাংলাদেশে থেকে যে চাহিদা আছে আমরা তার অংশবিশেষ পূরণ করছি মাত্র। গত ২১ এপ্রিল বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে BJMC-এর সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও পাট বিশেষজ্ঞ খালেদ রব যে মূল প্রবন্ধটি পাঠ করেন, সেখানে উপরোক্ত চাহিদার তুলনায় বাংলাদেশ ও ভারতের উৎপাদনের তুলনামূলক বিচার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ২০০২-০৩ থেকে ২০০৫-০৬ সাল এই কয় অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় রফতানি ছিল এক লাখ আশি হাজার টন, অর্থাৎ বিশ্বচাহিদার অর্ধেকেরও কম। উপরোক্ত রফতানি পরিমাণের মধ্যে BJMC-এর অংশ ১,৩৭,০০০ টন এবং BJMA-এর অংশ ৪৩,০০০ টন। বিশ্বচাহিদার বাকিটা পূরণ করছে কে? ভারত। বাংলাদেশ ও ভারত এই দুই দেশই পাটজাতদ্রব্য রফতানি করে। বর্তমান অর্থবছরে বাংলাদেশের রফতানির পরিমাণ আরো কমে গেছে, ১,৬৫,০০০ টন। অথচ ১৯৯৯-২০০০ সালে আমাদের রফতানির পরিমাণ ছিল আড়াই লাখ টন। পাশাপাশি ভারতের উৎপাদন ও রফতানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। খালেদ রব ভারতের পাটশিল্পের তিনটি বড় গ্রুপের উৎপাদনের একটা চিত্র তুলে ধরেছেন। অরণ্য বাজোরিয়া (হুগলি), সারদা ও শামদানির সাম্প্রতিক বার্ষিক উৎপাদন হচ্ছে যথাক্রমে ২,৭৬,০০০ টন, ১,২০,০০০ টন এবং ১,৩০,০০০ টন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভারতের কোনো একটি গ্রুপেরই উৎপাদন আমাদের BJMC-এর পুরো উৎপাদনের কাছাকাছি বা কখনো বেশি।

এখানে উল্লেখ্য, ভারতের পাটকলের শ্রমিকের মজুরি বাংলাদেশের প্রায় দ্বিগুণ। বাংলাদেশ উন্নতমানের পাট উৎপাদন করে এবং বাংলাদেশের কাঁচাপাটের উৎপাদনের পরিমাণও বেশি। এমনকি বাংলাদেশ থেকে আইনিভাবে ও গোপন পথে ভারত পাট ক্রয় করে মিল চালাচ্ছে। তারপরও ভারতের পাটশিল্পের রমরমা অবস্থা আর আমাদের পাটশিল্প ধ্বংসের মুখে। কেন এমনটি হবে? এটা একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফল। খালেদ রব দেখিয়েছেন বিশ্বের যেসব বাজার আমাদের জন্য প্রায় নিশ্চিত ছিল, তা আমরা ক্রমান্বয়ে হারাচ্ছি। তিনি বলেছেন,

সিরিয়ার অর্ধেক বাজার আমরা ইতিমধ্যেই হারিয়েছি, যা দখল করেছে ভারত । মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বাজারও আমরা হারাতে বসেছি । আমাদের পাটশিল্পের যে কী কারণ অবস্থা তা সাম্প্রতিক খুলনার ঘটনা থেকেই বোঝা যায় । খুলনার চারটি জুট মিলের শ্রমিকরা কয়েক মাসের বকেয়া বেতন না পেয়ে অবশেষে জরুরি আইন অগ্রাহ্য করে রাস্তায় নেমেছেন । এক সপ্তাহ মজুরি না পেলে গরিবের সংসার চলা যে কী কষ্টকর, তা আমাদের দেশের কর্তাব্যক্তির জানেন না । কারণ তারা সবাই উচ্চবিত্ত । খুলনার খালিশপুরের চারটি মিলের শ্রমিক বর্ধিত বেতন দাবি করেনি, অন্য কোনো দাবিও উত্থাপন করেননি । শুধু বলেছেন, কয়েক মাস ধরে পড়ে থাকা পাওনা মিটিয়ে দাও । এই দাবি নিয়ে তারা রাস্তায় নামলে প্রশাসন ন্যায্য পাওনা মেটানোর বদলে শত শত রাউন্ড টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ও গুলি নিক্ষেপ করেছে । জরুরি আইন ভঙ্গের অপরাধে প্রশাসন শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে । পাঁচ হাজার শ্রমিককে আসামি করেছে । সংখ্যাটি অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য । তার মানে সব শ্রমিকই অপরাধী । কী অপরাধ? তারা কয়েক মাস ধরে পড়ে থাকা বকেয়া মজুরি দাবি করেছে । জরুরি আইন বা কঠোরতর আইন দিয়ে আর যা-ই হোক ক্ষুধার আগুন নেভানো যায় না । প্রশাসন বকেয়া পরিশোধের বদলে আরো যে কাজটি করেছিল তা ছিল চরম বর্বরতা । পুলিশ শ্রমিক কলোনিতে মাইকে ঘোষণা দিয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে । সভা-মিছিল করলে চরম ব্যবস্থা নেয়া হবে । সেই ব্যবস্থা তারা নিয়েছিল । শুধু মামলা ও গ্রেফতার নয়, রাতে শ্রমিক কলোনিতে বেধড়ক পিটিয়েছে শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের । শিশু ও নারীরাও বাদ যায়নি । তারপরও শ্রমিকবিক্ষোভ দমন করা যায়নি । জরুরি আইনকে উপেক্ষা করে খালিশপুর অঞ্চলে হরতাল হয়েছে । এই হরতালে সমর্থন দিয়েছে ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষও, দোকানদার, মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য শ্রমজীবী । পাটশিল্প প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে খুলনার এই সাম্প্রতিক ঘটনাটা প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখ করতে হয়েছে । খুলনার ঘটনায় প্রশাসনের শ্রমিকবিদ্বেষী মনোভাবই কেবল ফুটে ওঠেনি, সরকার ও প্রশাসনের অগণতান্ত্রিক চরিত্রেরই প্রকাশ ঘটেনি, তার চেয়েও গুরুতর যে ঘটনাটি ঘটেছে তা হল পাটশিল্পের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করা হয়েছে । আদমজি বন্ধ করে দেয়ার ফলে বিশ্ববাজারে ক্রেতাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল । খুলনার খবরও বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে । ফলে ক্রেতাদের মধ্যে অনাস্থার ভাব তৈরি হবে । এ সবটাই কি কোনো দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের ফসল? অন্যথায় কেন মাসের পর মাস মজুরি বকেয়া পড়বে? কেন পাটকল লাভজনক হবে না, যেখানে বিশ্বে চাহিদা রয়েছে, যেখানে আমাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতে পাটশিল্প বিকাশ লাভ করেছে? পাটশিল্পের সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং লক্ষাধিক শ্রমিকের স্বার্থ জড়িত রয়েছে, শুধু তাই-ই নয়,

এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছে তিন কোটি কৃষকের স্বার্থও। অতএব, পাটশিল্পকে হালকাভাবে দেখার কোনো কারণ নেই। পাকিস্তান আমলে পাট আমাদের রাজনীতির বড় বিষয় ছিল। আমাদের অভিযোগ ছিল, আমাদের পাট দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন করা হচ্ছে। এই বাংলার পাট দিয়েই একদা গড়ে উঠেছিল ব্রিটেনের ডাভি শিল্পাঞ্চল। পরবর্তী সময়ে পরাধীন ভারতে কলকাতার আশপাশের পাটশিল্পের কাঁচামালের জোগানদার ছিল তখনকার পূর্ববাংলার পাটচাষিরা। ব্রিটিশ গেছে, পাকিস্তানি মালিকরা গেছে। এখন স্বাধীন বাংলাদেশে কেন পাটশিল্পের এমন খারাপ অবস্থা হবে? হওয়ার কোনো কারণই নেই। বলা হয়, রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব খাতের কারণে পাটশিল্প লোকসান দিচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তিমালিকানায যেসব কারখানা পানির দরে বেচে দেয়া হয়েছে, তারাও তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চালাচ্ছে না। ভারতের শিল্পপতিরা পারলে আমরা কেন পারছি না? এর কারণ, যেসব নব্যধনী এসব মিল কিনেছে প্রায় পানির দামে, তারা আসলে উৎপাদনবিমুখ ও শিল্পে অনাগ্রহী। মিলের জমি ও অন্যান্য সম্পদ যা পেয়েছে খুবই সস্তা দরে, তার থেকেই লাভ করতে তারা আগ্রহী। তাই ব্যক্তিমালিকদের ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না। সরকারকেও মনোযোগী, উদ্যোগী, ভালো ব্যবস্থাপক ও পরিচালক হতে হবে। পাটশিল্পের বিকাশের ভালো সম্ভাবনা আছে। তাকে গলা টিপে হত্যা করলে তা হবে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার সমান অপরাধ।

আমাদের সামনে সম্ভাবনা ও আশঙ্কা দুটিই রয়েছে। পাট ও পাটশিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে বড় ধরনের অবদান রাখতে পারি। অথবা পাটশিল্পকে ইতিহাসের আঁস্কাঁকুড়ে নিষ্ক্ষেপ করতে পারি। কোনটা করব তা কি নীতিনির্ধারণ করা ভেবে দেখবেন? বিশেষ করে এবারের বাজেট প্রণয়নের আগে আগে পাট নিয়ে ভাবনাটা যেন সত্যিকারের ভাবনা হয় আমরা সেই কামনাই করব।

উৎস: প্রথম প্রকাশ: দৈনিক সমকাল, ১৪ মে, ২০০৭ এবং দ্বিতীয় প্রকাশ: অমিতা চক্রবর্তী, ফারজানা শম্পা, নাসরিন সিরাজ ও আনু মুহাম্মদ সম্পাদিত 'পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ও বিবৃতি সংকলন ২০০৭'।

[লেখক: সমাজবাদী চিন্তক ও রাজনীতিক।]

পাটের ভবিষ্যৎ: ফিরে আসুক সোনালি আঁশের সোনালি দিন

জা হাঙ্গীর আলম

আমার ছেলেবেলার অনেক বিয়ে হতে দেখেছি বর্ষাকালে। শাওন-ভাদ্র মাসে বর যাত্রীরা কনের গান বাজিয়ে কনে বাড়ি গেছে ছেয়া নৌকায় পাল তুলে, নানা রঙের নিশান সাজিয়ে। ফিলে এসেছে লাল শাড়িপরা এক টুকটুকে বউ নিয়ে। ফুপা বলেছেন, এ সময়টাতো পাটের মৌসুম। গ্রামের মানুষের হাতে নগদ টাকা আছে এখন। তাই বিয়ে হচ্ছে। এর পর ক্রমেই বড় হয়েছি দেখেছি, মহাজনের ঋণ পরিশোধ, ছেলের পড়ার খরচ, মেয়ের গহনা, শহরে জমি কেনা সবই হচ্ছে পাট বিক্রির অর্থ দিয়ে। গ্রামে ও শহরে পাটের জমজমাট ব্যবসা করেছে বহু মানুষ। দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে বাজার, পাটগুদাম, পাটকল ও বাণিজ্যকেন্দ্র। তাতে কর্মসংস্থান হয়েছে অনেকের। শুধু তাই নয়, বাংলার পাট গেছে যুক্তরাজ্যের ডাভিতে, ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে, রাশিয়ার, ব্রাজিলে ও আমেরিকায়। তাতে আয় হয়েছে অসংখ্য বৈদেশিক মুদ্রার। পাটকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এ দেশের সংস্কৃতি। এখানকার রাজনীতির অঙ্গনও মুখর করে রেখেছে এদেশের পাট। পাটকে ঘিরে অতীতে অনেক স্বপ্ন দেখেছে বাংলাদেশের মানুষ। হয়তো দেখবে ভবিষ্যতেও।

পাট একপ্রকার দ্বিবীজপত্রী আঁশযুক্ত গাছ। এর ছাল থেকে হয় আঁশ, আর ভেতরে থাকে কাঠি। প্রাচীনকালে একে বলা হত নালিতা। অনেকের মতে উড়িয়া শব্দ ‘ব্লুট’ বা সংস্কৃত ‘জুট’ শব্দ থেকে ইংরেজি ‘জুট’ শব্দের উৎপত্তি। কেউ কেউ মনে করেন, পাটের আদি নিবাস দক্ষিণ চীন ও আফ্রিকায়। মতান্তরে মালয় কিংবা শ্রীলংকা পাটের উৎপত্তিস্থান। ভারতে এর চাষ শুরু হয় বাগানের উদ্ভিদ হিসেবে। প্রথমে এর ব্যবহার হত সবজি ও ওষধিগাছ হিসেবে। বস্ত্র হিসেবেও পাটের ব্যবহার অনেক পুরনো। পাটবস্ত্র ব্যবহারের উল্লেখ আছে মহাভারত এবং বাইবেলেও। বাংলাদেশের গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে পাট উৎপন্ন হত প্রায় তিন হাজার বছর আগে। ক্রমেই এর উৎপাদন ও ব্যবহার বেড়েছে। কালের বিবর্তনে পাটের ব্যবহার হয়েছে বহুমাত্রিক। পাট পরিণত হয়েছে এদেশের কৃষকের একটি প্রধান

অর্থকরী ফসল হিসেবে। বাঙালির ঐতিহ্যে ও অস্তিত্বে একাকার হয়ে মিশে গেছে সোনালি আঁশ পাট।

প্রধানত দুটো প্রজাতির পাট এদেশে উৎপন্ন হয়। এগুলো হচ্ছে সাদা পাট ও তোষা পাট। সাদা পাট পানিসহিষ্ণু। এর চাষ হয় নিচু জমিতে। তোষা পাট জলাবদ্ধতা সহ্যে পারে না। তাই এর চাষ হয় মাঝারি জমিতে। পাট উৎপাদন করা হয় বর্ষাকালে। প্রাক-বর্ষা মৌসুমের অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও উচ্চ তাপমাত্রা পাট উৎপাদনের জন্য সহায়ক। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, মায়ানমার, নেপাল, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও ব্রাজিলসহ আরো কয়েকটি দেশে পাটের উৎপাদন হয়ে থাকে। তবে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদিত হয় ভারত, বাংলাদেশ ও চীনে। ব্রিটিশ যুগে অবিভক্ত বাংলার অর্থনীতি ছিল মূলত পাটভিত্তিক। কৃষকের স্বপ্ন ছিল পাটকে ঘিরে।

ব্রিটিশ ভারতে পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশই ছিল কাঁচা পাটের সর্ববৃহৎ যোগানদার। বর্তমানে এ শরিকানা বহুলাংশেই হ্রাস পেয়েছে। এখন পাট উৎপাদনের প্রধান অংশীদার ভারত, যেখানে একসময় পাটের উৎপাদন ছিল খুবই কম। ১৯৬৯-৭০ সালে বাংলাদেশে পাটের উৎপাদন ছিল ১২ লাখ ৮০ হাজার টন। সে বছর ভারতের উৎপাদন ছিল ৯ লাখ ৯৪ হাজার টন। বর্তমানে ২০০৬-০৭ সালের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশের মোট উৎপাদন হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১ লাখ ৮৬ হাজার টনে। ভারতে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ লাখ টনে। একই সময়ে বাংলাদেশে পাট চাষাধীন জমির পরিমাণ প্রায় ১০ লাখ হেক্টর থেকে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ হেক্টরে। অপরদিকে ভারতে তা ৭ লাখ ৭০ হাজার হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ ৩৫ হাজার হেক্টরে। এর প্রধান কারণ বিশ্ববাজারে পাটের বিকল্প হিসেবে সিস্টেটিকের আবির্ভাব, বাংলাদেশে পাটকলগুলোর দৈন্যদশা, পাটচাষে কৃষকের প্রণোদনাহীনতা এবং পাটজমির ধানী জমিতে রূপান্তর। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে পাটের আভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা বাড়ছে। সগৌরবে গড়ে উঠছে নতুন নতুন পাটকল। কৃষকরা পাচ্ছে প্রণোদনামূলক মূল্য আর তাতে বাড়ছে পাটের উৎপাদন। স্বাধীনতার পূর্বে বিশ্বের পাট উৎপাদনে বাংলাদেশের শরিকানা ছিল প্রায় ৮০ ভাগ। বর্তমানে তা নেমে গেছে ৩৭ শতাংশে। অপরদিকে ভারতের অংশীদারিত্ব দ্রুত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭ শতাংশে। বাংলাদেশে পাটকলগুলোর উন্নয়ন এবং পাটের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটচাষে কৃষকদের প্রণোদনা যোগানো ছাড়া এখনকার পাট উৎপাদনে ক্রমহ্রাসমান ধারা তেমন সহজে ঠেকানো যাবে বলে মনে হয় না।

বাংলাদেশে পাটের উৎপাদন ও ব্যবসা অনেক পুরনো হলেও এখানে পাটকল গড়ে উঠেছে বিলম্বে, পূর্ব পাকিস্তান আমলে। এর অনেক আগে পাটশিল্পের বিকাশ

ঘটে পশ্চিমবঙ্গে। ১৮৫৫ সালে হুগলী নদীর তীরে কলকাতার কাছে রিষড়ায় ভারতের প্রথম পাটকল নির্মিত হয়। অতঃপর কলকাতা কেন্দ্রিক পাটশিল্প দ্রুত বিকশিত হতে থাকে। এর কাঁচামালের যোগানদাতা ছিল মূলত পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ। একসময় কলকাতার মিলগুলো ডাল্লির মিলগুলোকেও প্রতিযোগিতায় হার মানায়। কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতা এবং সস্তায় শ্রমিক সরবরাহের ফলে কলকাতার মিলগুলো সস্তায় পাটজাত পণ্য রফতানি করতে থাকে। সে যুগে পাটের একচেটিয়া ব্যবসা করেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ভারতে প্রতিষ্ঠিত পাটকলগুলো এবং এর ব্যবসা চলে যায় মাড়ওয়ারিদের হাতে। ভারতীয় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী টাটা ও বিড়লা প্রথমে তাদের ব্যবসা শুরু করেছিল পাট দিয়ে। অতঃপর তারা এখান থেকে পুঁজি সঞ্চয় করে তাদের ব্যবসাকে করেছে বহুমুখী, বিনিয়োগ করেছে বিভিন্ন খাতে। পরিণত হয়েছে বৃহৎ শিল্পপতিতে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দেশবিভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত ও চলমান পাটকলের সংখ্যা ছিল ১০৪টি। পূর্ববঙ্গে তখন একটি পাটকলও ছিল না। পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পাটশিল্প গড়ে উঠতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জে চালু হয় বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল আদমজি। অতঃপর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশের পাটশিল্পের বিকাশ ঘটায় আদমজি ও বাওয়ানিসহ আরো অনেক বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এ সময় পূর্ববঙ্গ থেকে কাঁচা পাটের সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে গেলে পাটচাষে উৎসাহিত করা হয় পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের। পূর্ববঙ্গে তথা পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত পাট কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় দেশীয় পাটকলে এবং রফতানি করা হয় বিশ্বজুড়ে। পঞ্চাশ ও ষাট-এর দশকে দেশের প্রধান রফতানি খাত ছিল পাট ও পাটজাত দ্রব্য। এর মাধ্যমে আয় হত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। তাই পাট ছিল দেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। একে বলা হত সোনালি আঁশ। অবশ্য পাট রফতানি করে তখন যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হত তার সিংহভাগ বিনিয়োগ করা হত পশ্চিম পাকিস্তানে। তাতে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা ছিল খুবই কম। এই বৈষম্যের কারণে বাঙালি অর্থনীতিবিদরা রচনা করেছিলেন ‘দুই অর্থনীতি তত্ত্ব’। এই বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও বড় ধরনের প্রেরণা যুগিয়েছে পাটভিত্তিক অর্থনৈতিক বঞ্চনা। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বেসরকারি উদ্যোগে এদেশে ৭৭টি আধুনিক পাটকল গড়ে উঠে। তাতে নিয়োজিত হয় প্রায় আড়াই লাখ শ্রমিক। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে পরিত্যক্ত পাটকলগুলো রাষ্ট্রীয়ভুক্ত করা হয়। তখন এরূপ পাটকলের সংখ্যা ছিল ৬৭টি। এগুলোকে পরিচালনা করার জন্য গঠন করা হয় বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন

(বিজেএমসি)। অতঃপর আরো ১০টি পাটকল এবং ২টি যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী মিল সংযুক্ত করা হয় বিজেএমসি'র পাটকল বহরে। এর পর ১টি কার্পেট কারখানা এবং ১টি জুট প্লাস্টিক কারখানা স্থাপন করা হয় বিজেএমসি'র অধীনে। তাতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পাটকলের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৮২টিতে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শুরু হয় পাটকলসমূহের বিরাস্ত্রীয়করণ। ১৯৭৭-৮৬ সালে ৪৩টি পাটকল ছেড়ে দেয়া হয় বেসরকারি খাতে। আর ১টি করা হয় একীভূত। ১৯৯৩ সাল থেকে বিশ্বব্যাংকের চাপে পাটকলগুলোর বেসরকারিকরণ কর্মসূচি চলতে থাকে অব্যাহতভাবে। এ খাতের ওপর শুরু হয় সংগঠিত আক্রমণ। ২০০২ সালে বন্ধ করে দেয়া হয় দেশের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি। তাতে কর্মচ্যুত হয় দেশের লাখ লাখ মানুষ। তাদের চোখের পানি আর আহাজারিতে এক হৃদয়বিদারক পরিবেশ সৃষ্টি হয় আদমজি প্রান্তরে। তারপরও বিরাস্ত্রীয়-করণ কর্মসূচি থেমে থাকেনি। বর্তমানে বিজেএমসি'র অধীনে পাটকলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭টিতে। এর মধ্যে ১৬টি পাটকল ও ৩টি মেশিন প্রস্তুতকারী কারখানা চালু আছে। ৫টি পাটকল লিজ দিয়ে দেয়া হয়েছে বেসরকারি খাতে, ৩টি বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে রয়েছে মোট ১৪৮টি পাটকল। এর অধিকাংশই বন্ধ ও রংগণ। বেসরকারি কলগুলো ঋণের ভারে জর্জরিত। পাট প্রক্রিয়াকরণের কাজ ছেড়ে দিয়ে মিল এলাকায় কৃষিকাজ জুড়ে দিয়েছে তাদের অনেকে। কেউ বা অনভিজ্ঞতার কারণে শিল্পকর্ম বাদ দিয়ে অলস দিন কাটাচ্ছে। অপরদিকে সরকারি পাটকলগুলো অর্থাভাবে বাজার থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পাট কিনতে পারছে না। পুঁজির অভাব, অনিয়ম, অদক্ষতা, অশৃঙ্খলা, শ্রমিক অসন্তোষ, পুরনো যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎবিভ্রাট ইত্যাদি কারণে এগুলো পরিণত হয়েছে লোকসানের কারখানায়। ২০০৬-০৭ সালে সরকারি খাতে এরূপ লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২১ কোটি টাকা। বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলগুলো ইতিপূর্বে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার এটাই ছিল মূল কারণ। অনেকের মতে পাটকলগুলো বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া সমস্যার কোনো সমাধান নয়। বরং প্রয়োজন হল চলমান অদক্ষতা দূর করে এগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। তাতেই দেশের মঙ্গল নিহিত। পাটচাষিদের জন্যও তা একান্ত কাম্য।

বাংলাদেশে যখন পাটকলগুলো একের পর এক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, ভারতে তখন রাষ্ট্রীয় সমর্থনে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন পাটকল। সাম্প্রতিককালে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই গড়ে উঠেছে ১৮টি নতুন পাটকল। তাছাড়া ২০০২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশে আদমজি জুট মিলস বন্ধ করে দেয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পাটখাতে প্রণোদনামূলক নতুন প্যাকেজ ঘোষণা করে ভারত সরকার। পাটকলগুলোর

মেশিনাদি নবায়নের জন্য প্রদান করা হয় ভর্তুকি। খাদ্যশস্য ও চিনির বস্তা হিসেবে পাটের ব্যাগ ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করা হয়। পাটখাতে নিয়োজিত কয়েক লক্ষ শ্রমিক ও পাটচাষীদের বেঁচে থাকার কথা বিবেচনা করেই এরূপ সিদ্ধান্ত নেয় ভারত সরকার। তাতে এখন পাটের উৎপাদন বাড়ছে ভারতে। বাড়ছে পাটজাত দ্রব্য থেকে আহরিত রফতানি আয়। অপরদিকে বাংলাদেশে তা কমেছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য রফতানি করে বাংলাদেশ আয় করেছিল ৪৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি ছিল আমাদের মোট রফতানি আয়ের ৫৮ শতাংশ। ২০০৬-০৭ সালে ডলারের অনেক মূল্য হ্রাসের পরও পাট রফতানি খাতে বাংলাদেশ আয় করেছে ৪৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি ছিল মোট রফতানি আয়ের ৩.৮ শতাংশ। এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের রফতানি আয়ে প্রস্তুতকৃত পোশাকশিল্পের হিস্যা অনেক বেড়েছে। তবে জাতীয় পাটনীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাট থেকে ১ ডলার আয় গার্মেন্টস থেকে ৪ ডলার আয়ের সমান।

তুলনামূলক বিচারে পাট থেকে বৈদেশিক মুদ্রার আয় অধিকালে হ্রাস পেলেও বিশ্ববাজারে এখনো বাংলাদেশি পাটের আধিপত্য বিরাজমান। কাঁচা পাট রফতানির ক্ষেত্রে ২০০৬-০৭ সালে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের শরিকানা ছিল ৯৪ ভাগ এবং পাটজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ছিল ৫৯ শতাংশ। বাংলাদেশী কাঁচা পাট প্রধানত রফতানি করা হয় ভারত, পাকিস্তান, চীন, ইউরোপ, আইভরি কোস্ট, থাইল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশসমূহে। অপরদিকে পাটজাত দ্রব্যও রফতানি হয় ইউরোপ, তুরস্ক, ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, জাপান, সুদান, ঘানা এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে। আমাদের কাঁচা পাট আমদানির বেলায় পাকিস্তান, চীন ও ভারত এবং পাটজাত দ্রব্য আমদানির বেলায় ইউরোপ ও তুরস্কের স্থান সবার শীর্ষে। বর্তমানে পাটের বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। তার কারণ পলিথিন ও সিনথেটিক-এর ব্যবহার বিশ্বব্যাপী এখন নিরঙ্গুসাহিত করছে পরিবেশবাদীরা। পলিথিন ও সিনথেটিক দ্রব্য পচনশীল নয় বিধায় এগুলো পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অপরদিকে পাট পরিবেশবান্ধব। তাই এর চাহিদা বাড়ছে বিশ্বব্যাপী। এটি বাংলাদেশের জন্য সুখবর। একসময় সিনথেটিক পণ্যের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে গিয়েছিল পাট। এখন পরিস্থিতি পাটে যাচ্ছে। তাই পাটের ক্রমবিকাশমান আন্তর্জাতিক বাজার ধরার জন্য আমাদেরকে এখন খুবই তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে পাটের কদর বাড়ছে আভ্যন্তরীণ বাজারেও। তবে এর গতি অত্যন্ত শ্লথ। পাটের ব্যাগ, থলে ইত্যাদি ব্যবহারের ওপর সরকারি ও বেসরকারিভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হলেও তা সবসময় মেনে

চলছে না। বাংলাদেশ বর্তমানে উৎপাদিত পাটের শতকরা মাত্র ১৫ থেকে ২০ ভাগ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করছে। এটি ভবিষ্যতে বাড়বে। অপরপক্ষে ভারতে উৎপাদিত পাট ও পাটজাত দ্রব্যের শতকরা ৮৫ থেকে ৯০ ভাগই ব্যবহৃত হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে। বাকিটা রফতানি হচ্ছে বিদেশে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতকে অনুসরণ করা হলে এবং পাটের ব্যবহার উৎসাহিত করা হলে ভবিষ্যতে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতেও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে কাঁচা পাটের। সে কারণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

বাংলাদেশের সব জেলাতেই পাট কমবেশি উৎপাদিত হয়ে থাকে। তবে বেশি করে পাট উৎপাদিত হয় ফরিদপুর, যশোর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, টাংগাইল, জামালপুর এবং ঢাকা জেলায়। মোটমোট বিচারে এদেশে পাটের উৎপাদন হ্রাস পেলেও এখনকার প্রতি ইউনিট জমির ফলন গড়পরতায় বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। ১৯৬৯-৭০ সালে এদেশে পাটের গড় ফলন ছিল হেক্টর প্রতি ১.২৮ টন। ২০০৬-০৭ সালে তা ১.৯৮ টনে বৃদ্ধি পায়। ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে পাটের গড় ফলন কিছুটা বেশি। এ দেশের মাটি ও আবহাওয়া পাট উৎপাদনের জন্য দারুণ উপযুক্ত। কৃষকগণও পাটচাষে খুবই অভ্যস্ত এবং বেশ আগ্রহী। অনুকূল নীতিমালা ও যথাযথ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা এদেশে উজ্জ্বল।

পাটখাতে উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্যে এদেশে গড়ে উঠেছে একটি পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। ১৯৫৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে তেজগাঁও-এ। বর্তমানে শেরে-বাংলা নগরস্থ মানিক মিঞা এভিনিউতে প্রতিষ্ঠিত আছে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর। এখানে পাট উৎপাদন বিষয়ে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন সম্পর্কে এবং পাটের ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন দ্রব্যসামগ্রী তৈরির কারিগরি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। ইতিমধ্যেই ইনস্টিটিউটটি ৩৮টি উচ্চ ফলনশীল পাটের জাত উদ্ভাবন করেছে। তাছাড়া কম খরচে উন্নতমানের পাটজাত দ্রব্যসামগ্রী উদ্ভাবন করেছে ৪০টি। কৃষক পর্যায়ে পাটের উন্নত জাতসমূহ সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যিকভাবে পাটজাত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ভবিষ্যতে এদেশে পাটের সুদিন ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

পাটের ব্যবহার প্রধানত প্যাকেজিংয়ের কাঁচামাল হিসেবে। বাংলাদেশের চটের ব্যাগ বা গানি ব্যাগের খ্যাতি রয়েছে বিশ্বজোড়া। পাটকাঠি গ্রামের মানুষের জ্বালানি ও ঘরের বেড়া নির্মাণের একটি বিশেষ অবলম্বন। প্রথাগতভাবে এদেশে পাটের ব্যবহার হচ্ছে রশি, সুতলি, শিকা, পাকানো সুতা, হাতে তৈরি কাপড়, কম্বল,

মাদুর, গালিচা, দেয়ালের আচ্ছাদন হিসেবে। গোয়ালঘরে গরু বাঁধা, নৌকা ঘাটে বেঁধে রাখা কিংবা মাছধরার কাজে পাটের দড়ি ও সুতার ব্যবহার এদেশে খুবই জনপ্রিয়। পাটের সুতা দিয়ে শাড়ি ও লুঙ্গি তৈরির বিষয়েও আমরা সবাই অবহিত। বর্তমানে শপিংব্যাগ হিসেবেও এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া কাঁচা পাট ব্যবহার করে কাগজ তৈরির পাল্প, তুলার সঙ্গে পাট মিশিয়ে মিহি সুতা, ঘরের আবাসাবপত্র তৈরির জন্য জুটো-প্লাস্টিক সামগ্রী, নদী ও রাস্তার ভাঙন রোধকল্পে জুট জিও-টেক্সটাইল ইত্যাদির সঙ্গেও এখন আমরা কম-বেশি পরিচিত। পাট থেকে মূল্যবান কার্পেট তৈরির বিষয়টি এখানে উল্লেখযোগ্য। শনের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যবহার অতি প্রাচীন। ১৮৫৪-৫৬ সালে ক্রিমিয়া যুদ্ধের কারণে রাশিয়া থেকে শন আমদানি বন্ধ হয়ে গেলে যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত ডাভি কারখানাগুলো শনের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যবহার শুরু করে। ওই সময় ডাভিস্ট শনের মিলগুলো রূপান্তরিত হয় পাটকলে। অতঃপর ১৮৬১-৬৫ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণে তুলার সরবরাহ হ্রাস পায়। তাতেও বিকল্প হিসেবে পাটের কদর বেড়ে যায়। পাট অপেক্ষাকৃত সস্তা বলে সারা ইউরোপে, আমেরিকা ও রাশিয়ায় পাটকল স্থাপিত হতে থাকে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যদের রক্ষার্থে পরিখায় ব্যবহারের জন্য বালিভরা কাঠামো তৈরি ও খাদ্যশস্য বয়ে নেয়ার জন্য বিপুলসংখ্যক পাটের বস্তা ব্যবহার হয়। তাতে বেড়ে যায় কাঁচা পাটের চাহিদা ও মূল্য। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পাটের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে সিনথেটিক ফাইবার। তাতে পাটের চাহিদা হ্রাস পায়। বর্তমানে পরিবেশ-সচেতনতার ফলে বিশ্বব্যাপী আবার পাটের ব্যবহার বাড়ছে। হারানো গৌরব ফিরে পেতে যাচ্ছে বাংলার সোনালি আঁশ পাট।

পাটের ব্যবসা বেশ রমরমা। বিভিন্ন ধাপে কাঁচা পাট ক্রয় করা হয় ভোক্তার হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য। প্রাথমিক ধাপে কৃষকের বাড়ি অথবা গ্রাম্য হাট থেকে পাট ক্রয় করে নেয় ব্যাপারিরা। এদের নিকট থেকে দ্বিতীয় ধাপে পাট ক্রয় করে নেয় গুদামের মালিক ও ব্যবসায়ীরা। তৃতীয় ধাপে পাট ক্রয় করা হয় নারায়ণগঞ্জ/খুলনার পাটকলগুলোতে। চতুর্থ ধাপে বা শেষ পর্যায়ে কাঁচা পাট/পাটজাত দ্রব্যের চালান হয় বিদেশে, রফতানি বাজারে। এসব ধাপ অতিক্রমে কিছু বিপণন ও প্রক্রিয়াকরণ খরচ গুণতে হয়। মুনাফারও অংশ দিতে হয় প্রতিটি ধাপে। তাতে ভোক্তাপ্রদত্ত দামের একটি বড় অংশের ভাগীদার কৃষক হতে পারে না। ২০০৬-০৭ সালে বাংলাদেশী কাঁচা পাটের রফতানিমূল্য ছিল প্রতি মণ ৮৭২ টাকা। ওই বছর কৃষক পেয়েছে মণপ্রতি ৬৩০ টাকা। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০০৫-০৬ সালে কাঁচা পাটের রফতানিমূল্য ছিল গড়ে ১০৩৬ টাকা। কৃষক পেয়েছে ৬৮৫ টাকা। এ দু'বছর গড়ে রফতানিমূল্যের ৬৯ ভাগ অর্থ কৃষকের হাতে

গিয়ে পৌঁছেছে। বাকিটা পেয়েছে ব্যবসায়ী ও মধ্যস্থত্বভোগীরা। এখন থেকে প্রায় ২৮ বছর আগে ১৯৮০-৮১ সালে কাঁচা পাটের রফতানিমূল্য বর্তমান বাজারদরে ছিল প্রতি মণ ৬৮৩ টাকা। গত দুই বছরের মণপ্রতি গড় মূল্য ৯৫৪ টাকা তুলনায় তা ছিল শতকরা ২৮ ভাগ কম। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সময়ের ব্যবধানে পাটের আন্তর্জাতিক মূল্য বেড়েছে। সাম্প্রতিককালে সিনথেটিক নিরুৎসাহিত হওয়ায় বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এর মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে রফতানি বাজারে। একইসঙ্গে কৃষিউপকরণের মূল্যবৃদ্ধির কারণে অনেক বেড়ে গেছে পাটের উৎপাদনখরচ। তবু পাটের আন্তর্জাতিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে সম্প্রতি পাটচাষ উৎসাহিত হচ্ছে। তাতে লাভবান হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষক ও ব্যবসায়ীরা।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশী পাটের ভবিষ্যৎ বেশ আশাব্যঞ্জক। বিশ্বব্যাপী এখন পাটের বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। পাটের চাহিদা বাড়ছে আভ্যন্তরীণ বাজারেও। এই বাড়তি চাহিদা মেটাতে হলে আমাদের পাটের উৎপাদন বাড়তে হবে। পাটচাষের জন্য কৃষকদের যোগাতে হবে প্রণোদনা। তাদেরকে সরবরাহ করতে হবে উন্নত বীজ। বর্তমানে মোট চাহিদার প্রায় ১০ ভাগ প্রত্যায়িত বীজ চাষীদেরকে সরবরাহ করছে সরকার। এটি আরো বাড়তে হবে। নতুবা বিদেশি নিম্নমানের বীজ আমাদের চাষীদের প্রতারিত ও বিপর্যস্ত করবে। তাছাড়া চাষিরা যাতে সময়মতো পাট বিক্রি করতে পারে এবং উৎপাদিত পাটের ন্যায্যমূল্য পায় তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারের আলোকে তাদেরকে আগাম ধারণা দিতে হবে পাটের আভ্যন্তরীণ ক্রয়মূল্য সম্পর্কে। যেসব ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল বর্তমানে ঋণের ভারে নুইয়ে পড়েছে, সেগুলোকে পুনঃতফসিলিকরণের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের সুযোগ দিতে হবে। তাদেরকে স্বল্প সুদে প্রদান করতে হবে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। খোলাবাজার থেকে পাট ক্রয়ের জন্য যথাসময়ে পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান করতে হবে বিজেএমসি'র জন্যে। এ সংস্থার আওতাধীন পাটকলগুলো যাতে পূর্ণ মাত্রায় চালু থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। এগুলোতে ব্যবহৃত পুরনো মেশিনগুলো পরিবর্তন করে সেখানে স্থাপন করতে হবে নতুন যন্ত্রপাতি ও মেশিন। তাতে সংযোজন ঘটাতে হবে আধুনিক প্রযুক্তির। পাটকলগুলোতে যাতে সারাক্ষণ বিদ্যুৎ থাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া পাটশিল্প খাতে ভর্তুকি বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎসাহিত করতে হবে পাট ও পাটজাত পণ্যের রফতানি। সেইসঙ্গে পাটের আভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারিত করতে হবে। বিগত জোট সরকারের আমলে পলিথিনের ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হলেও পাটের তৈরি শপিংব্যাগ এখনো তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। এ বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচারণা চালিয়ে যেতে হবে। নির্দিষ্ট হারে পাটের খলে ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে সিমেন্টের বস্তা, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের

বস্তা তৈরির কাজে । বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত পাটকলগুলোকে সহায়তা ও সমর্থন যোগাতে হবে সরকারিভাবে । আর রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পাটকলগুলোতে ফিরিয়ে আনতে হবে আত্মবিশ্বাস ও শৃঙ্খলা । এর জন্য একটি নতুন পাটনীতি প্রণয়নের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে ।

পাট বাংলাদেশের ঐতিহ্য । এটি বাঙালি সংস্কৃতিরই একটি অপরিহার্য অংশ । এ দেশের কৃষকদের নগদ অর্থ উপার্জনে, কর্মসংস্থানে, দারিদ্র্য বিমোচনে, বৈদেশিক অর্থ আহরণে ও সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তভাবে বিনির্মাণে পাটের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বর্তমানে বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির যে অমিত সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে তাকে কাজে লাগাতে হবে পুরোপুরি । বিকাশ ঘটাতে হবে পাটভিত্তিক কল-কারখানার । সেজন্য চাই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা । বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী পাটের ক্ষেত্রে সে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে বর্তমান মহাজোট সরকার পুরোপুরি প্রস্তুত বলেই আমরা ধারণা করি । বাংলার সোনালি আঁশ অদূর ভবিষ্যতে তার হারানো গৌরব ফিরে পাক এ প্রত্যাশা সকলের ।

[লেখক: কৃষি অর্থনীতিবিদ । প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ।]

বাংলাদেশে পাটচাষের সম্ভাবনা ও প্রতিকূলতা

শা মী ম শা ম ছি

পাট বাংলাদেশের একটি অর্থকরী উদ্ভিদ। এটি Corchorus গনের অন্তর্ভুক্ত পরিবার। Corchorus গনের দুইটি প্রজাতি C. olitorius ও C. capsularis পরবর্তী প্রজাতির পাট উন্নতমানের। প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে তুলার পরেই পাটতন্তুর ব্যবহার হয়ে আসছে। পাটতন্তু লম্বা, চকচকে, নরম এবং মজবুত। পাটতন্তু প্রধানত Cellulose ও lignin দ্বারা প্রস্তুত হয়। এটিকে bast fiber category-তে ফেলা হয়। বাণিজ্যিকভাবে পাটকে raw Jute বলা হয়।

পাটতন্তু সাদাতে বা খয়েরি-রং এর হয় এবং ১-৪ গজ মিটার লম্বা হয়। পাটকে সোনালি আঁশ বলা হয়। এর উচ্চমূল্য ও উজ্জ্বল বর্ণের জন্য পাট the golden fiber নামে পরিচিত।

৪ থেকে ৬ সপ্তাহ কালের পাটগাছ শাক হিসেবে গ্রামগঞ্জ ও শহরে সমাদৃত। পাটের পাতা বা কচি কাণ্ড যা শাক হিসেবে খাওয়া হয় এটি বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ ও চোখের দৃষ্টির জন্য উপকারী। এতে বিদ্যমান লৌহ মানবদেহের রক্ত পরিশোধনে উপকারী ভূমিকা রাখে। ক্যালসিয়াম শরীরের হাড় ও দাঁতকে মজবুত করে। এর ভিটামিন সি ত্বককে ভালো রাখে, দেহের হিমিউন সিস্টেমকে স বল রাখে।

এছাড়াও পাটসবজিতে রয়েছে Antic oxidant যা মানবদেহের ক্রনিক রোগ, হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিকস ও হাইপার টেনশন প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। কচি পাটের পাতা ও কাণ্ড আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। সর্দি, জ্বর, টিউমার, বেদনানাশক ও পাইলস চিকিৎসায় এর ব্যবহার আছে। ক্ষুধাবৃদ্ধি ও বলকারক হিসেবেও পাটের পাতা ব্যবহৃত হয়।

পাট বর্চজীবী উদ্ভিদ-এর উচ্চতা ৫ থেকে ১৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাটচাষের জন্য জমিকে উত্তমরূপে চাষ দিতে হয়। বীজ বপনের পূর্বে পরিমাণমতো গোবর সার ও রাসায়নিক সার জমিতে মিশ্রিত করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা হয়। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত জমিতে বীজ বপন করার জন্য উপযুক্ত সময়। উপযুক্ত পরিবেশে ৪ থেকে ৫ সপ্তাহের মধ্যে

বীজের অঙ্কুরোদগমন হয়। এ সময়ে মাটিতে পানির পরিমাণ যেন বেশি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ক্ষেতে যাতে আগাছা না হয় সে জন্য অঙ্কুরোদগমের কিছুদিনের মধ্যেই ক্ষেতে নিড়ানি দেয়া আবশ্যিক। গাছগুলো যাতে পর্যাপ্ত আলোবাতাস পায় সেজন্য চারাগাছগুলো পরিমাণমতো উঠিয়ে পরিমাণমতো পাতলা করে দিতে হবে। এর পর পাটক্ষেতে আবার ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা আবশ্যিক। চার মাসের মধ্যে পাটগাছ কাটার উপযুক্ত হয়। নিম্নভূমির পাট (সাদা পাট) সাধারণত জুলাই মাসে কাটা হয়। উচ্চভূমির পাট (তোষা পাট) আগস্ট মাসে কাটা হয়।

গাছে ফুল ফোটার সময় পাট কাটার উপযুক্ত সময়। তাতে পাটের গুণগত মান ভালো থাকে। পাট কাটার পর পাটের আঁটি বাঁধা হয় এবং ৪ থেকে ৫ দিনের মধ্যে একত্রে রাখা হয়। এতে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং পাটের আঁশ ছাড়াতে সুবিধা হয়। পরবর্তীতে জলাশয়ে পাটের আঁটি জাগ দেয়া হয়। কচুরিপানা বা অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ দিয়ে পাটের আঁটি ঢেকে দেয়া হয়। পাট জাগ দেয়ার পর পাট পচনকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক পাটের আঁশ শোলা থেকে পৃথক করে দেয় এবং সহজেই পাটতন্তু আলাদা করা যায়।

পানিতে রেখেই পাটের আঁশ আলাদা করে পরিষ্কার করা হয়। বাঁশের আড়ার উপরে ছড়িয়ে সূর্যের আলোতে পাটের আঁশ শুকিয়ে নেয়া হয়। এর পর বাজারজাত করা হয়।

সমতল, দোয়াঁশ মাটি, জলাবদ্ধ ভূমি পাটচাষের উপযোগী। বর্ষাকালের উষ্ণ ও ভেজা আবহাওয়া পাটচাষের অনুকূল, ২০গ্দপ থেকে ৪০গ্দপ উষ্ণতা এবং ৭০%-৮০% আর্দ্রতা পাট জন্মানোর জন্য উপযোগী। মিঠা পানিতে পাটের চাষ ও উৎপাদন ভালো হয়।

সাদা পাট (Corchorus olitorius)

ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলা বা বাংলাদেশে আদিকাল থেকে কৃষকরা পাটচাষ করে এসেছে। দরিদ্র গ্রামবাসী পাটের তৈরি সুতা থেকে ব্যবহারের জন্য যেমন কাপড় তৈরি করেছে অন্যদিকে পাটের তৈরি হ্যান্ডলুম কাপড়, দড়ি, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরি, ব্যবহার ও বাজারজাত করেছে।

তোষা পাট (Corchorus capsularis)

তোষা পাট বিদেশি পাট হিসেবে ভারতবর্ষ বিশেষত বাংলাদেশে সুবিদিত। ১৭শ শতাব্দীতে East India Company পাটকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে উৎপাদন ও বাজারজাত শুরু করে।

পৃথিবীর সেরা দশটি পাট উৎপাদনকারী দেশের তালিকা নিম্নে দেয়া হল:

দশটি পাট উৎপাদন করার সেরা দেশ - ২০১১	
দেশ	উৎপাদিত পণ্য (টন)
ভারতবর্ষ	১,৯২৪,৩২৬
বাংলাদেশ	১,৫২৩,৩১৬
চীন	৪৩,৫০০
উজবেকিস্তান	১৮,৯৩০
নেপাল	১৪,৪১৮
ভিয়েতনাম	৮,৩০৪
এয়ানমার	২,৫০৮
জিম্বাবুয়ে	২,২৯৮
থাইল্যান্ড	২,১৮৪
ইজিপ্ট	২,১০০
সারা বিশ্ব	৩,৫৮৩,২৩৫

পাটগাছ সহজেই ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ ও কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়। পাটের ছত্রাকজনিত রোগের মধ্যে কাণ্ডপচা, ব্লাকব্যান্ড, অ্যালথ্রাকনোজ ও নরম পচা রোগ উল্লেখযোগ্য। এসব রোগের কারণে

পাটতন্তুর গুণগত মান নষ্ট হয়। একইভাবে উৎপাদনকারী পাটচাষি বা জোতদাররা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

পাটগাছকে রোগমুক্ত রাখার জন্য সহজ পদ্ধতি হচ্ছে

- ১। রোগমুক্ত বীজ সংগ্রহ করা।
- ২। বীজ বপনের পূর্বে মাটিকে খুঁড়ে আলগা করে বার বার উল্টেপাল্টে সূর্যালোকে ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে আগের বছরের ছত্রাকের স্পোর সেখানে না থাকে।
- ৩। জমিতে আগাছা পুড়িয়ে দিতে হবে।
- ৪। মাটিতে পরিমাণমতো সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ৫। পর্যায়ক্রমে ফসলের চাষ ও পাটগাছের রোগ দমনে সাহায্য করে।

Bangladesh Jute Research Institute (BJRI)-এর পাট গবেষণা অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার সহায়তায় প্রচলিত ছত্রাক কারক ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। যাতে পাটগাছ সুস্থ ও সতেজ থাকে এবং ভালো মানের পাট উৎপাদন সম্ভব হয়। এর ফলে পাট উৎপাদনকারী ও এর সাথে জড়িত কৃষককুল, পাটের শিল্পের সঙ্গে জড়িত অর্থলগ্নীকারী সংস্থা ও কর্মচারীরা ব্যাপকভাবে লাভবান হবেন একইসঙ্গে বিশ্বে বাংলাদেশের পাটচাষের সুনাম ফিরে আসবে এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ হবে।

[লেখক: অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

পাট : বাংলাদেশের সোনালি আঁশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শীর্ষক একটি পর্যালোচনা

হো মা য় রা আ হ় মে দ

বাংলাদেশের সোনালি আঁশ এক সময় দেশের রপ্তানি আয়ের ৮০ ভাগ অর্জন করত। পলিব্যাগ এবং অন্যান্য পুনর্ব্যবহার্য (Recyclable) দ্রব্যের তৈরি প্যাকেজিংসামগ্রীর সুলভ প্রচলন হবার পর বিশ্ববাজারে পাটের তৈরি পণ্য, বিশেষত প্যাকেজিং-এর জন্য ব্যবহৃত ব্যাগ, বস্তা ইত্যাদির চাহিদা হ্রাস পাওয়াতে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা কমে আসে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিশ্বের বৃহত্তর পাটকল আদমজি জুট মিল সহ দেশের অন্যান্য ছোট বড় পাটকলগুলোর সিস্টেম লস, অব্যবস্থাপনা, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং তদসংক্রান্ত রাজনীতি— যা বাংলাদেশের পাটশিল্পকে কার্যত করে দেয় অচল।

একই সময়ে পাটচাষিরা উৎপাদিত পাটের মূল্য ঠিকমত না পেতে শুরু করে পাটচাষে নিরুৎসাহিত হতে থাকেন। অন্যদিকে ইরি এবং অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান ও অন্য রবিশস্য সংক্রান্ত গবেষণায় বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট যুগান্তকারী সাফল্য দেখায়। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার সরকারি উদ্যোগ এ সময় এসব শস্য উৎপাদনে কৃষকদের ভর্তুকি, সহজশর্তে কৃষিক্ষণ প্রদান, যথার্থ সময়ে কীটনাশক, বীজ ও সারের সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে কৃষকের এসব নতুন জাতের ধান, ফল, সবজি ও অন্যান্য রবিশস্য চাষে উৎসাহিত করেন। ফলে পাটচাষিরা ধীরে ধীরে পাট উৎপাদন থেকে সরে এসে অন্যান্য ফসল উৎপাদন করতে শুরু করেন। দেশের পাটখাত কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যায়— কৃষি ও শিল্প উভয় খাতেই।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু বিপর্যয়, তথা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, পরিবেশ দূষণ, আবহাওয়া ও তাপমাত্রার পরিবর্তন এবং উপর্যুপরি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন— খরা বন্যা, জলোচ্ছাস, সুনামি, আইলা, ক্যাটরিনা ও অন্যান্য সাইক্লোন, ভূমিকম্প ইত্যাদির প্রকোপ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়াতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নত বিশ্বেও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পায় গত আড়াই দশকে। আর এর ফলে জলবায়ু আন্দোলনের অংশ হিসেবে পানি, মাটি এবং বায়ুদূষণকারী পলিব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত তৈরি হয়। আর এ সুবাদেই পাট ও পাটজাতপণ্যের হারানো চাহিদা পুনরুদ্ধার হতে থাকে— টেকসই উন্নয়নের সবুজ বিকল্প (GREEN ALTERNATIVE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT) হিসেবে। বাংলাদেশ সরকার ও পাটের জিনোম তত্ত্ব আবিষ্কারের বিষয়ে সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা দেবার কারণে এবং বাংলাদেশী গবেষকদের আন্তরিক ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা তা করেন। ফলে বিগত এক দশক ধরে সরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিশ্ববাজারে চাহিদা বৃদ্ধির সৃষ্টির কারণে পাটচাষিরা আবারও পাট উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ফলে দেশের পাটখাত স্বল্পপরিসরে হলেও পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু করেছে।

দেশের বিভিন্ন জেলা এবং বিভাগে পাটচাষিরা বর্তমানে পাটের উৎপাদন এবং বাজারমূল্যে সন্তুষ্ট। ২০১৬-এর মাঝামাঝি জুন—জুলাই মাসের দিকে বিশেষত, রাজশাহীর স্থানীয় হাটবাজারে প্রতিমণ পাট ১৭০০ টাকা থেকে ১৯০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে, যেখানে গত বছর (২০১৫ সালে) পাটের মূল্য ছিল মণপ্রতি ১৪০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা।

পাটকলের মালিকরা মনে করেন সরকারি এবং বেসরকারি উভয় খাতে কাঁচা পাটের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগেরা তথ্যানুযায়ী বিগত সাত-আট বছর আগে যেমন কাঁচা পাটের উপযুক্ত

বাজারদর না পাওয়ায় পাটচাষিরা উৎপাদনের আগ্রহ হারাচ্ছিল, বর্তমান চিত্র ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে লাভজনক মূল্য পাবার কারণে বর্তমানে কৃষকেরা অধিক মাত্রায় পাট উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ২০১৬ সালে শুধুমাত্র রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ এবং চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলাতেই নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চাইতে ১০,২৬৫ হেক্টর বেশি জমিতে পাট চাষ হয়েছে। যেখানে ২০১৬ সালে মোট ৩৬,০৩৭ হেক্টর জমিতে পাটচাষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, সেখানে কৃষকরা মোট ৪৬,৩০২ হেক্টর জমিতে পাট উৎপাদন করেছেন।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)— এর প্রতিবেদন অনুসারে উন্নতমানের বীজ এবং সার, কীটনাশক ইত্যাদি কৃষি কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য সহজ শর্তে কৃষিক্ষেত্রের সহজলভ্যতা পাট উৎপাদনের লক্ষণীয় বৃদ্ধির পেছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। কৃষিবিদরা তাই মনে করেন বর্তমানে দেশের পাট উৎপাদনের বিশেষত রপ্তানির বহুমুখিতার কারণে, এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। যদি মানসম্পন্ন বীজের নিয়মিত যোগান নিশ্চিত করা যায় এবং অধিকতর আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়, তবে বাংলাদেশের পাট উৎপাদন কেবল নয় প্রক্রিয়াজাতকরণ, পাটজাতপণ্য তৈরি ও রপ্তানির ক্ষেত্রেও বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হবে— যা কৃষিখাতকে পুনরায় দেশের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তিতে পরিণত করবে। একই সঙ্গে পাটশিল্প পুনরুজ্জীবিত হবে, যা আমাদের শিল্পখাতেও (বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র— তিন পরিসরেই) নতুন জোয়ার বয়ে আনবে।

বর্তমান বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে ইতোমধ্যেই দূরদর্শিতার সাক্ষর রেখেছে। সরকার ২৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পাটকলকে আধুনিকায়ন করবার উদ্যোগ নিয়েছে, যেগুলো বিভিন্ন ধরনের পাটজাত পণ্য উৎপাদন করবে। এ উদ্যোগের আওতায় Balanding Modirnisation, Rihalrilitation and lipansion (BMRE) গণচীনের of public sector mills প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তায় প্রাথমিক ভাবে ৩টি পাটকল আধুনিকীকরণ করা হবে, যাতে আনুমানিক ব্যয় হবে ৩৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন বা বিজেএমসি-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫শ' মেট্রিক টন উন্নতমানের সনাতন এবং বহুমুখী ব্যবহারোপযোগী পাটজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন গাড়ির ড্যাশ বোর্ড, দরজা, জানালা, দামি গাড়ির সিট প্রভৃতি উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন পণ্যসমূহ ভবিষ্যতে পাটজাত পণ্য দিয়েই তৈরি হবে।

বিজেএমসি প্রদত্ত উপাত্ত অনুযায়ী বর্তমানে এর আওতায় ২৬টি পাটকল রয়েছে যেগুলো ৬০ থেকে ৭০ বছরের পুরনো। এর মধ্যে ২৪টি পাটকল চালু রয়েছে, যা

তাদের প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার মেট্রিক টনের মধ্যে বর্তমানে প্রতিবছর ২ লক্ষ ৮ হাজার ৬৪২ মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদন করে। বিজেএমসি'র কর্মকর্তাদের মতে এসব বহুদশক পুরনো পাটকলগুলোর প্রকৃত উৎপাদনক্ষমতা শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ১০০ ভাগই কমে গেছে। সরকার এগুলোর মধ্যেই ২৪টিকে আধুনিকায়ন করে উৎপাদন বৃদ্ধি বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ সরকার দেশীয় বাজারে পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্যও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ২০১৪ সালে জানুয়ারি মাসে পাটশিল্প পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় কৃষিপণ্যের প্যাকেজিং-এ পাটের (বস্তা ও অন্যান্য প্যাকেজিংসামগ্রীর মাধ্যমে) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করার হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী ধান, চাল, গম, আটা, সার এবং চিনি প্যাকেজিং-এর জন্য পাটের ব্যাগের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যার অন্যথায় (অর্থাৎ এসব পণ্য পরিবেশ— অবাস্তব সিনসেটিক বা পলিথিন প্যাকেজিং সামগ্রী দ্বারা প্যাকেজিং করলে) এক বছরের জেল বা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডই প্রদান করা হবে। সরকারের এ উদ্যোগের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) একই বছর (২০১৪) অক্টোবর মাসে এই রুল জারি করে যে, কোনো ব্যবসায়ীকে কোনো ধরনের ব্যবসায়িক ঋণ প্রদান করা হবে না, যদি না তাঁর পণ্য প্যাকেজিং পাটজাত পণ্য ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন বা বিজেএমএ-'র প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী এ উভয় উদ্যোগের ফলে জুট স্পিনাররা সরাসরি ভাবে উপকৃত হবেন, যাঁরা বছরে ৩৬ লাখ বেল পাট ব্যবহার করে থাকেন।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ মোট ৭৫ লাখ বেল কাঁচা পাট উৎপাদন করে (তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো) বা পরবর্তী অর্থবছরে অতিবৃষ্টির এবং বন্যার কারণে খানিকটা হ্রাস পায়। কিন্তু ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আবার পাট উৎপাদন পূর্বের চাইতে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থানীয় বাজারে প্যাকেজিং-এ পাটের ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বাংলাদেশ বস্ত্র এবং পাট মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে এ নিষেধাজ্ঞা পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

এ প্রবন্ধে সমন্বিত তথ্যের ভিত্তিতে এ উপসংহারে পৌছানো যায় যে বাংলাদেশে পাট এবং পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে তার পূর্ণ সদ্যবহার করবার জন্য সরকারি বেসরকারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন কৃষি ও শিল্পখাতে সংশ্লিষ্ট সকলের যথেষ্ট সদিচ্ছা রয়েছে। উপযুক্ত নির্দেশনা, সঠিক দূরদর্শিতা এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে পারলে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ আবার তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

[লেখক : গবেষক, বিআইডিএস।]

প্র বন্ধ

পাটের অর্থনীতি

জা হা সী র আ ল ম

গত দু'বছর ধরে পাটের বাজার মন্দা যাচ্ছে। ন্যায্য দামে পাট বিক্রি করতে পারছে না কৃষক। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনখরচও পাওয়া যাচ্ছে না পাট বিক্রি করে। তাতে খুবই ভোগান্তি হচ্ছে কৃষকদের। ২০০৯-২০১০ সালে পাটের বাজার ছিল তেজি। এর দাম ছিল মণ প্রতি ১৫০০ থেকে ২৫০০ টাকা। এর পরের বারে ২০১০-২০১১ সালে পাটের উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিশ্বমন্দা ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের চাহিদা হ্রাসের কারণে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের দাম হ্রাস পায়। ২০১১-১২ সালেও এই মূল্যহ্রাসের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। চলতি ২০১২-২০১৩ সালে এই অবস্থা আরো শোচনীয় আকার ধারণ করে। এবার

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকারভেদে পাট বিক্রি হচ্ছে মণ প্রতি ৭০০ থেকে ১১০০ টাকায়। বর্তমানে কোথাও কোথাও এর মণপ্রতি দাম নেমে গেছে ৫ থেকে ৬ শ' টাকা। নারায়ণগঞ্জ ও দৌলতপুরে পাটের মণ প্রতি এফওবি রপ্তানিমূল্য প্রকারভেদে ১৮৫০ থেকে ২৪৫০ টাকা। খামার গেটে ও গ্রামীণ বাজারগুলোতে কৃষক তার অর্ধেক দামও পাচ্ছেন না।

বর্তমানে মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের আগে ২০০৭-২০০৮ সালে পাটের মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ৪৭ লাখ টন। বিদেশে পাটের চাহিদাবৃদ্ধি ও মূল্যপ্রণোদনার কারণে ২০১০-২০১১ সালে পাটের আবাদি জমির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং মোট উৎপাদন ৮৪.৬ লাখ বেলে গিয়ে দাঁড়ায়। এর পরের বছর অর্থাৎ ২০১১-২০১২ সালে কাঁচা পাটের মূল্যপতনের কারণে পাটের আবাদি জমির পরিমাণ প্রায় ৬০ হাজার হেক্টর হ্রাস পায় এবং উৎপাদন ৪.৪৫ শতাংশ কমে গিয়ে ৮০.৮৩ লাখ বেলে এসে ঠেকে। চলতি ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে পাটের উৎপাদন আরো হ্রাস পেয়ে ৭৮ লক্ষ বেলে এসে দাঁড়িয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে (সারণি ১)। গত বছরের মজুদ ১৮ লাখ বেল যোগ করে এবারে মোট কাঁচা পাটের যোগান হবে প্রায় ৯৬ লাখ বেল। সে তুলনায় মৌসুমের শুরুতে পাট ক্রয় হচ্ছে খুব সামান্যই। গত বছর সরকারি সংস্থা বিজেএমসি ক্রয় করেছিল ১১.৬৪ লাখ বেল কাঁচা পাট, মোট উৎপাদনের প্রায় ১৪ শতাংশ।

সারণি ১

বাংলাদেশে পাটের উৎপাদন

সাল	আবাদি জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ বেল)	হেক্টর প্রতি উৎপাদন (বেল)	উৎপাদনের হ্রাস (-) বৃদ্ধি (+) (শতকরা হার)
২০০৭-০৮	৪.৭৩	৪৭.২৯	১০.০০	-
২০০৮-০৯	৪.৭৪	৪৯.৭০	১০.৪৮	+ ৫.০৯
২০০৯-১০	৪.৫৬	৪৯.৩৯	১০.৮৩	- ০.৬২
২০১০-১১	৮.০৩	৮৪.৬০	১০.৫৩	+ ৭১.২৯
২০১১-১২	৭.৬০	৮০.৮৩	১০.৬৩	- ৪.৪৫
২০১২-১৩	৭.৪০	৭৭.৮৭	১০.৫০	- ৩.৬৬

এ বছর অক্টোবর মাস নাগাদ বিজেএমসি ক্রয় করেছে তার অর্ধেক পরিমাণ পাট, প্রায় ৬ লাখ বেল। এটা মোট উৎপাদনের মাত্র ৭.৭ শতাংশ। অন্যরা এবার পাট ক্রয় করেছে অনেকটা ধীর গতিতে। বাংলাদেশ জুট মিল এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন এবং শিপার্স ও বেলার্স যথাক্রমে মোট কাঁচা পাটের শতকরা ১৫, ৩৬ ও ৩৫ ভাগ ক্রয় করে থাকে। কিন্তু এবার মৌসুমের শুরুতে ওরা ক্রয় করেছে খুবই কম। কারণ পুঁজির অভাব। বিজেএমসি সেদিক থেকে অনেকটা স্বচ্ছল। তাই মৌসুমের শুরুতেই কিছু পাট ক্রয় করতে পারছে। তবে মোট সরবরাহের তুলনায় বিজেএমসির ক্রয় খুবই অপ্রতুল। সে কারণে বাজারে এর তেমন প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না। নিরুপায় হয়ে কৃষক অতি নিম্ন দরে পাট বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে ব্যাপারীদের কাছে। তাদের জন্য ঘরে পাট ধরে রাখার বিড়ম্বনা বেশি। এক্ষেত্রে লাভবান হচ্ছে মধ্যমত্বভোগী ব্যাপারি, মিলমালিক ও রপ্তানিকারক ব্যবসায়ী।

পাটের আন্তর্জাতিক মূল্য নির্ভর করে বহিঃবিশ্বের কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদার ওপর। মধ্যপ্রাচ্য সংকট, বিশ্বমন্দা এবং কোনো কোনো দেশের বৈরী মনোভাবের কারণে বাংলাদেশের পাটের আন্তর্জাতিক চাহিদা সম্প্রতি তেমন বাড়ছে না এবং পাট থেকে রপ্তানি আয় অতি সম্প্রতি হ্রাস পাচ্ছে। তবে কোনো কোনো দেশে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদাবৃদ্ধির কারণে কিছু ইতিবাচক সাড়াও মিলছে। উদাহরণস্বরূপ, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে সরকার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পাটের থলে ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। কেনিয়া ও রুয়ান্ডায় পাটের বস্তার ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও দুবাই সিনথেটিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পরিবেশের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী পাটের ব্যবহার বাড়বে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের সাম্প্রতিক চাহিদা হ্রাসকে কোনোক্রমেই বড় সমস্যা বলে চিহ্নিত করা যায় না। এ সমস্যা শীঘ্রই কেটে যাবে। বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিকারী দেশ। তাই এখানকার রপ্তানিমূল্যই (এফওবি মূল্য) আন্তর্জাতিক মূল্য। বর্তমানে তা মণ প্রতি ১৮৫০ থেকে ২৪৫০ টাকা (সারণি-২)।

সারণি ২

কাঁচা পাটের রপ্তানি (এফওবি নারায়ণগঞ্জ/দৌলতপুর) মূল্য (প্রতি মণ/টাকা)

পাটের প্রকার	সর্বোচ্চ মানের	মধ্যম মানের	বি বটম	সি বটম	ক্রস বটম
সাদা	২৪৫০.০০	২৩৫০.০০	২২৫০.০০	২০০০.০০	১৮৫০.০০
তোষা	২৫০০.০০	২৪০০.০০	২৩০০.০০	২০৫০.০০	১৯০০.০০
মেস্তা	২৪৫০.০০	২৩৫০.০০	২২৫০.০০	২০০০.০০	১৮৫০.০০

সূত্র: বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন, নারায়ণগঞ্জ, ১০ অক্টোবর, ২০১২

৯ অক্টোবর প্রকাশিত দৈনিক সংবাদের রিপোর্ট অনুযায়ী স্থানীয় বাজারে পাট বিক্রি হচ্ছে ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা মণ দরে। অর্থাৎ রপ্তানির খরচ ও মুনাফা ক্রয় মূল্যের প্রায় দেড় গুণ বেশি। এটা কোনোক্রমেই যৌক্তিক নয়। এ সময় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কাঁচা পাটের দাম বাংলাদেশি মুদ্রায় মণ প্রতি ১৬৩২ থেকে ১৯৮৪ টাকা। বাংলাদেশী স্থানীয় বাজারমূল্যের প্রায় দ্বিগুণ।

পাটের উৎপাদনখরচ নির্ভর করে প্রতি ইউনিট ফলনের ওপর। ফলন বেশি হলে উৎপাদনখরচ কমে আসে। গত বছরের তুলনায় এবার পাট চাষাধীন এলাকা কমেছে। ফলনও কমেছে। অপরদিকে উৎপাদনের উপকরণখরচ বেড়েছে। স্থান ও পাত্রভেদে এবার পাটের উৎপাদনখরচ মণ প্রতি ১,২০০ থেকে ১,৬০০ টাকা। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সমীক্ষা অনুযায়ী তা ১২৫৮ টাকা। এটা পাটের চলমান উৎপাদনখরচের (ভেরিয়েবল কস্ট) সঙ্গে জমির খোয়নি মূল্য ও পারিবারিক শ্রমিকের মূল্য যোগ করা হলে তা আরো বেড়ে যাবে। এ হিসাব থেকে পাটচাষিদের লোকসানের মাত্রা বোঝা যায়।

পাট বাংলাদেশের সোনালি আঁশ। বর্তমানে দেশে পাটচাষির সংখ্যা ৪০ লক্ষ। জিডিপিতে পাটখাতের অবদান ০.২৬ শতাংশ এবং কৃষি জিডিপিতে ১.৪ শতাংশ। মোট শ্রমশক্তির ১২.৫ শতাংশ নিয়োজিত রয়েছে পাট উৎপাদনের কাজে। পাটশিল্পে জড়িত আছে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫শত শ্রমিক। এর মধ্যে সরকারি সংস্থা বিজেএমসি শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ এবং বেসরকারি সংস্থা বিজেএসএ ও বিজেএমএ মিলে শতকরা ৬০ ভাগ শ্রমিকের কর্মসংস্থান করছে। মোট রপ্তানিআয়ের শতকরা প্রায় সাড়ে ৪ শতাংশ উপার্জন করা হয় পাট রপ্তানি থেকে। তৈরি পোশাকশিল্পের পর এটি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত। পাট থেকে আহরিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় এক-চতুর্থাংশ আসে কাঁচা পাট রপ্তানি থেকে।

দেশের কৃষকদের জন্য নগদ অর্থের সংস্থান করে যাচ্ছে পাট। মহাজনদের বা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ, ছেলে-মেয়ের পড়ার খরচ, সন্তানের বিয়ে, বউ-এর শাড়ি ও গয়না, শহরে জমি কেনা সবই হয় চাষিদের পাট বিক্রির অর্থ দিয়ে।

গ্রামে ও শহরে আদিকাল থেকে পাটের জমজমাট ব্যবসা করছে অনেক মানুষ। দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে বাজার, পাটগুদাম, পাটকল ও বাণিজ্য কেন্দ্র, যাতে কর্মসংস্থান হচ্ছে অনেকের। তাছাড়া এই চরম জ্বালানি সঙ্কটের যুগে গ্রামবাংলার রান্নার কাজে চমৎকার এক পুনরোৎপাদনক্ষম জৈব জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে পাটকাঠি। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য যাচ্ছে যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, রাশিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ভারত, ব্রাজিল, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায়। তাতে আয় হচ্ছে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। সম্প্রসারিত হচ্ছে আমাদের বৈদেশিক সম্পর্ক। পাটকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি। পাকিস্তান আমল থেকে অদ্যাবধি এখানকার রাজনীতির অঙ্গনও মুখর করে রেখেছে এ দেশের পাট। পাটকে ঘিরে অতীতে অনেক স্বপ্ন দেখেছে এ দেশের মানুষ, হয়তো দেখবে ভবিষ্যতেও।

স্মরণাতীতকাল থেকেই বাংলাদেশে পাটের চাষ হয়ে আসছে। এটি এক প্রকার দ্বিবীজপত্রী আঁশযুক্ত গাছ। এর ছাল থেকে হয় আঁশ, আর ভেতরে থাকে কাঠি। প্রাচীনকালে একে বলা হত নালিতা। অনেকের মতে উড়িয়া শব্দ ‘বুট’ বা সংস্কৃত ‘জট’ শব্দ থেকে ইংরেজি ‘জুট’ শব্দের উৎপত্তি। প্রধানত দুই প্রকার পাট বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। এ দুটো হল করকরাস ক্যাপসুলারিজ (সাদা) এবং করকরাস অলিটোবিয়াস (তোষা)। ক্যাপসুলারিজ— এর আদি নিবাস চীন দেশে। চীনের ক্যান্টন নগরে নিকট বহু শতাব্দী যাবৎ সাদা পাট চাষ হয়ে আসার প্রমাণ রয়েছে। সেখান থেকেই ভারত ও বাংলাদেশে সাদা পাটের বীজ আসে এবং ক্রমে এশিয়ার অন্যান্য অনেক দেশে এর প্রসার ঘটে। এ জাতীয় পাট বন্য ও আবাদকৃত অবস্থায় আফ্রিকার বিষুবাপ্তলেও দেখা গেছে। সে কারণে অনেকের মতে এ জাতীয় পাটের আদি নিবাস আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল। অলিটোরিয়াসের আদি নিবাস ছিল মিশরে। প্রাচীনকালে মিশর ও সিরিয়ায় শাকের পরিবর্তে ব্যবহৃত হত পাট। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শুরুতে তোষা পাটের চাষ শুরু হয় মিশরে। সেখান থেকে পাটের বীজ আসে বাংলাদেশের খুলনা এবং ভারতের বর্ধমান ও ২৪ পরগণা জেলায়। অনেকে মনে করেন মালয় কিংবা শ্রীলংকা থেকে এ জাতীয় পাটের বিস্তার ঘটেছে ভারতে। তবে এ দুটো জাতের পাটই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আবাদ হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। সাদা পাট হয় নিচু জমিতে। এ পাট পানিসহিষ্ণু। এতে কাটিংস বা গোড়ার অংশ বেশি। তোষা পাট জলাবদ্ধতা সহ্যে পারে না। তাই এর চাষ হয় উঁচু ও মাঝারি জমিতে। এ পাটে কাটিংস বা গোড়ার

অংশ কম। একসময় এ দেশে উৎপাদিত অধিকাংশই ছিল সাদা পাট। এখন তোষা পাটের উৎপাদন বেশি। এছাড়া বাংলাদেশের সমস্যাবহুল মাটিতে সামান্য কিছু নিম্নমানের পাট কেনাফ (চিন ও থাইল্যান্ড এর উৎপত্তিস্থল) এবং মেস্তা (ভারতে এর উৎপত্তি) চাষ করা হয়। এদের চাষাধীন এলাকা ও উৎপাদন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সেন্ট্রাল জুট কমিটির হিসাব মতে, ১৯৫৮ সালে এদেশে সাদা পাটের আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল শতকরা ৭৫.৪৮ ভাগ এবং তোষা ২৪.৫২ ভাগ। বর্তমানে তোষা পাট শতকরা ৮৫.৬০ ভাগ, সাদা পাট শতকরা ৯.২৪ ভাগ, মেস্তা ২.৬৩ এবং কেনাফ ২.৫৩ ভাগ জমিতে চাষ করা হচ্ছে (সারণি ৩)।

সারণি ৩

২০১২-১৩ সালে বিভিন্ন জাতের পাটের অধীনে মোট জমির পরিমাণ

পাটের জাত	জমি (হেক্টর)	মোট পাট জমিতে শরিকানা (%)
দেশি	৬৯,৮৮৭	৯.২৪
তোষা	৬,৪৭,৬২৬	৮৫.৬০
কেনাফ	১৯,১৪৪	২.৫৩
মেস্তা	১৯,৮৭৫	২.৬৩
মোট	৭,৫৬,৫৩২	১০০.০০

তোষা পাটের হেক্টর প্রতি উৎপাদন ১০.৮৫ বেল এবং সাদা পাটের হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৮.৩৯ বেল (সারণি ৪)। গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি প্রায় সাড়ে ১০ বেল। কেনাফ ও মেস্তার উৎপাদনের হার পাটের গড় উৎপাদনের চেয়ে কম। উৎকৃষ্টতার দিক থেকে তোষা পাট বেশি মানসম্পন্ন। এর দৈর্ঘ্য, উজ্জ্বলতা, কোমলতা ও মসৃণতা বেশি। গোড়ার পরিমাণ কম। বাজারে এর দাম বেশি। দেশের পাট উৎপাদনকারী বিভিন্ন জেলার মাটির ধরন, বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়ার পার্থক্যের কারণে পাটের মোট উৎপাদন গুণাগুণ ও মানে তারতম্য ঘটে। পাট পচানোর ওপরও নির্ভর করে এর রং ও উজ্জ্বল্য। পরিষ্কার ও ধীরে ধীরে চলমান পানিতে পাট পচালে ও ধৌত করলে এর রং ভালো ও উজ্জ্বল হয়। ঘোলা পানিতে ও বন্ধ পানিতে পচালে ও ধৌত করলে এর রং ময়লা হয়।

সারণি ৪

২০১১-১২ সালে দেশী ও তোষা পাটের উৎপাদন

পাটের জাত	আবাদি জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ বেল)	হেক্টর প্রতি উৎপাদন (লক্ষ বেল)	মোট পাট উৎপাদনে শরিকানা (%)
দেশী	০.৯৯	৮.৩১	৮.৩৯	০.৩৫
তোষা	৬.৬১	৭১.৭২	১০.৮৫	৮৯.৬৫

এবার কৃষকদের বড় সমস্যা ছিল পাট পচানো। বর্ষার পানি দ্রুত নেমে যাওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় বৃষ্টির অভাবে ঠিকভাবে পাট জাগ দিতে পারেনি কৃষকগণ। পুকুর, ডোবা, খাল, বিল, দিঘি ও নালায় পর্যাপ্ত পানি না থাকায় এই সমস্যা হয় কৃষকদের। বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত রিবন রেটিং বা পাটের ছালকরণ ও পচানো পদ্ধতির শরণাপন্ন হয় অনেক কৃষক। এ পদ্ধতিতে পুরো গাছ না পচিয়ে কাঁচা গাছ হতে মেশিনে ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে সে ছাল পচাতে হয়। প্রয়োজনীয় পচন পানির অভাবে পাটচাষিগণ যেখানে চিরায়ত নিয়মে পাট জাগ দিতে পারছেন না এবং আঁশের মান খারাপ হচ্ছে, সেখানে ‘রিবন রেটিং’ পদ্ধতিতে তারা কম পানিতে পাটের ছাল পচিয়ে উন্নতমানের আঁশ সংগ্রহ করতে পারছেন। তবে এ পদ্ধতির সম্প্রসারণ এখনো সীমিত। আঁশ ছড়ানোর রিবনার মেশিনও অনেকের নাগালের মধ্যে নেই। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও তাদের অনেকের নেই। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে শ্রমিকের প্রয়োজন হয় বেশি। গর্ত তৈরি করে ঠিকমতো পানি ও সার দেয়ার কাজটি বেশ ঝামেলাপূর্ণ। উন্মুক্ত স্থানে গর্ত করে আঁশ ডুবিয়ে রাখলে তা চুরিরও আশংকা থাকে। তবে এ পদ্ধতিতে পাট পচাতে সময় কম লাগে, পচন অবস্থাটিও স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব। সে কারণে এ বিষয়ে কৃষকদেরকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা উচিত। একই সঙ্গে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে বড় আকারে দিঘি কেটে তা সংরক্ষণ করা উচিত। আমাদের কৃষকদের পাটচাষে একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে বীজের অপ্রতুলতা। এ দেশে প্রতি বছর প্রায় সাড়ে ৪ হাজার টন পাটবীজের দরকার হয়। এর মধ্যে পাট অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন মিলে সরবরাহ করে প্রায় দেড় হাজার টন বীজ। বাকি ৩ হাজার টন বীজ সংগ্রহ করা হয় আমদানির মাধ্যমে। একসময় দেশের কৃষকগণ মাঠের এক কোণে পাটগাছ রেখে দিয়ে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করত, এখন তা খুবই কমে গেছে। পাটগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হলে দীর্ঘ সময় ধরে জমি আবদ্ধ রাখতে হয়। তাছাড়া পাটবীজ তেতো বলে এর কোনো বিকল্প ব্যবহারও

নেই। ফলে কৃষক পর্যায়ে পাটের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ তেমন আর চোখে পড়ে না। এর প্রধান দায়িত্ব বর্তেছে এখন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর। এক্ষেত্রে বিএডিসি, পাট অধিদপ্তর ও পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে পারে। বেসরকারি বীজ ব্যবসায়ীগণও পাটবীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। মোটকথা পাটবীজ উৎপাদনে ক্রমাগতভাবে স্বয়ম্ভর হতে না পারলে মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করা কখনোই সম্ভব হবে না।

পাট গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনেক সাফল্য আছে। এ নাগাদ সাদা পাটের ২২টি, উচ্চ ফলনশীল জাত তোষা পাটের ১৪টি, কেনাফের ৩টি এবং মেস্তার ২টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করা হয়েছে। এগুলোর সম্প্রসারণ চলছে মাঠ পর্যায়ে। বর্তমানে সাদা ও তোষা পাটের গড় ফলন পৃথিবীর পাট উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশেই বেশি। গত অর্ধশতাব্দী যাবৎ এ দেশে পাটের ফলন বেড়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। এর পেছনে দেশের কৃষিবিজ্ঞানীদের এবং পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবদান অনস্বীকার্য। সম্প্রতি পাটের বংশগতি বিন্যাস (জেনম সিকুয়েন্স) উদ্ভাবিত হয়েছে। তাতে রোগ ও পোকা প্রতিরোধক আরো উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে। বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও আবহাওয়া পরিবর্তনে ফলে এ দেশের কৃষি পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এখন আমাদের এমন পাটের জাত উদ্ভাবন করতে হবে যা খরা, লবণাক্ততা ও শীতসহিষ্ণু। সারা বছর ধরে উৎপাদন-উপযোগী পাটজাত উদ্ভাবন এখন আমাদের ভাবনায় আসছে। এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে হলে পাট গবেষণা ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অনেক বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশে পাটের উৎপাদন শুরু হয় স্মরণাতীত কাল থেকেই। প্রথমে এর ব্যবহার ছিল সবজি হিসেবে। তখন পাটপাতা ছিল দরিদ্রের খাদ্য বা জিউস মেলো। প্রাচীন গ্রিকদের নিকট পাট করকরাস নামে পরিচিত ছিল। এর অর্থ চক্ষুরোগ বিনাশক। তাতে বোঝা যায় ওষুধি গুণের জন্যেও পাটের আবাদ হত। প্রাচীনকালে রচিত মহাভারতে পাটবস্ত্রের উল্লেখ থাকায় তখন থেকেই বয়নযোগ্য আঁশ হিসেবে পাটের ব্যবহারের সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যেও পাটবস্ত্রের প্রচুর উল্লেখ আছে। গৃহস্থালির কাজেও পাট ও পাটকাঠির ব্যবহার জনপ্রিয় ছিল সুদূর অতীত থেকেই। অর্থাৎ বাংলাদেশে পাটচাষ, পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন ও এর ব্যবহার এবং বাণিজ্যের ইতিহাস সুপ্রাচীন। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর বাণিজ্যিক প্রসার ঘটে অষ্টাদশ শতকে। এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইউরোপীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের পাটের আঁশ ও পাটজাত দ্রব্য। ক্রমেই পাটের বহির্বাণিজ্য বিকাশ লাভ করে।

বাংলা থেকে বিদেশে পাট রপ্তানি হচ্ছে প্রায় ২২২ বছর ধরে। ১৭৯১ সালে সর্বপ্রথম কলকাতা থেকে ১০০ টন কাঁচা পাট ইংল্যান্ডের ডাভিতে প্রেরণ করা হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে থলে প্রস্তুতের জন্য। ১৮৩২ সালে মেসার্স বেলফোর এবং মেসার্স মেলভেল কোম্পানি যন্ত্রের সাহায্যে পাট থেকে সুতা তৈরি করতে সক্ষম হয়। তখন শনের মেশিন কিছুটা অদল-বদল করে পাটের সুতা কাটা ও বোনা হয় এবং ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে পাটের কাপড় তৈরি করা হয়। ১৮৩৫ সালে মেশিনে কাটা সুতা বাজারে বের হয়। ১৮৩৮ সালে তেল ও পানি মিশিয়ে পাটের আঁশের সুতা নরম করে বাজারে বিক্রয়যোগ্য বিভিন্ন পাটপণ্য তৈরি শুরু হয়। এ সময় ইউরোপের রশি ও বস্তার বাজারে শনের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় বাংলার পাট। ১৮৫৪-৫৬ সালের ক্রিমিয়া যুদ্ধে বিদেশের বাজারে রাশিয়ার শন রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেলে পাট উপযুক্ত ও সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৮৬১-৬৫ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণে তুলা আমদানি কঠিন ও ব্যয়সাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তুলার বস্তার পরিবর্তে পাটের বস্তার কদর বেড়ে যায়। ক্রমেই ডাভি থেকে পাটশিল্প ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর সর্বত্র। ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, ইতালি, স্পেন, ব্রাজিল, আমেরিকা ও জাপানে স্থাপিত হয় অসংখ্য পাটকল। তাতে আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা পাটের চাহিদা বেড়ে যায়। এর বড় অংশের যোগানদার হয় বাংলাদেশ।

প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পাট ছিল বাংলার সমৃদ্ধ গৃহশিল্প। এ সময় বাংলার গরিব লোকেরা পাটের কাপড় পরত। এ সময় উত্তর ও পূর্ববঙ্গের মেয়েরা পাটের কাপড় তৈরি করত। হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সবাই অবসরে টেকো হাতে পাটের সুতা বুনত। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হাতে বোনা পাটপণ্য বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছিল। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাটশিল্পের বিকাশ শুরু হলে ক্রমেই হস্তচালিত তাঁতশিল্পগুলো গুরুত্ব হারায়। ওই শতাব্দীর শেষভাগে এসে তাঁতের তৈরি জিনিসের দাম খুবই হ্রাস পায়। ফলে হুমকির মুখে এসে দাঁড়ায় গ্রামীণ তাঁতশিল্প।

বাংলার মানুষ যেমনি কাঁচা পাট রপ্তানি করত বিদেশে তেমনি চিরায়তভাবে পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহার করত দেশের অভ্যন্তরে। এ দুটো কারণে অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে পাটের উৎপাদন। একসময় ধারণা করা হয় যে, কাঁচা পাট রপ্তানির পাশাপাশি এদেশের পাটকল প্রতিষ্ঠা করে কাঁচা পাট থেকে শিল্পভিত্তিক পণ্য উৎপাদন করে তা রপ্তানির মাধ্যমে আয় হবে বেশি। এ বাস্তবতা থেকে

১৯৫৫ সালে কলকাতার রিষড়ায় স্থাপিত হয় অবিভক্ত বাংলার প্রথম পাটকল। বাংলাদেশের প্রথম পাটকল ছিল বাওয়া জুটমিল, যেটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৫১ সালের ১৮ মে। এর পর ১৭০০ হেসিয়ান লুম ও ১৩০০ সেকিং লুম নিয়ে নারায়ণগঞ্জে উৎপাদন শুরু হয় পৃথিবীর বৃহত্তম জুটমিল আদমজির। ষাট-এর দশক নাগাদ এ শিল্প ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে মোট ৭৯টি জুটমিল নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। এর মধ্যে ১৯৭৪ সাল নাগাদ ১৮টিতে কার্পেট ব্যাকিং, হেসিয়ান ও সেকিং, ১৪টিতে কার্পেট বোকাং, ৩৪টিতে হেসিয়ান ও সেকিং এবং ১টিতে শুধু সেকিং— এর উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট পাটকলের সংখ্যা ২১৯টি। এর মধ্যে বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন এর অধীন ২৭টি, বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশনের অধীনস্থ ১০৬টি (৮৮টি সচল) এবং বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশনের অধীনে ৮৬টি পাটকল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিজেএসএ শতকরা ৮৫ ভাগ, বিজেএমসি শতকরা ৭০ ভাগ এবং বিজেএমএ শতকরা ৩৭ ভাগ হারে তাদের অধীনের মিলগুলোর উৎপাদনক্ষমতা কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে। সারা পৃথিবীতে এখন ৩৮৫টি পাটকল রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত ও চীনে স্থাপিত পাটকল সংখ্যাই বেশি। (সারণি ৫)

সারণি ৫
বিশ্বে পাটশিল্পের সংখ্যা

দেশ	সংখ্যা
বাংলাদেশ	২১৯
ভারত	৮০
চীন	২০
মায়ানমার	১৩
পাকিস্তান	১২
থাইল্যান্ড	১২
নেপাল	১০
ভিয়েতনাম	৪
ব্রাজিল	৪
ইরান	৩
নাইজেরিয়া	২
রুম্যানিয়া	২
মালয়েশিয়া	২
আইভরি কোস্ট	১
ঘানা	১
মোট	৩৮৫

পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে এখনো বাংলাদেশের আধিপত্য বিরাজমান। কাঁচা পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শরিকানা ৯৭ শতাংশ এবং পাটজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ৬৩ শতাংশ। বাংলাদেশি কাঁচা পাট প্রধানত রপ্তানি করা হয় ভারত, পাকিস্তান, চীন, ইউরোপ, আইভরি কোস্ট, থাইল্যান্ড এবং অন্য দেশসমূহে। অপরদিকে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয় ইউরোপ, তুরস্ক, ইরাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিরিয়া, মিশর, লিবিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, জাপান, সুদান, ঘানা এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে। বর্তমানে পাটের বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে পৃথিবীর আরো অনেক দেশে। তার কারণ, পলিথিন ও সিনথেটিক দ্রব্য পচনশীল নয়। পরিবেশের জন্য এগুলো মারাত্মক ক্ষতিকর। অপরদিকে পাট পরিবেশবান্ধব। তাই এর চাহিদা বাড়ছে বিশ্বব্যাপী। এটি চলমান থাকবে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা এবং মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে অতি সম্প্রতি এর চাহিদা কিছুটা কমেছে। এই সংকট কেটে গেলে পাটের আন্তর্জাতিক বাজার যে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও চাহিদা বৃদ্ধি করতে হবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে উৎপাদিত পাটের শতকরা মাত্র ১৫ থেকে ২০ ভাগ অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার হচ্ছে। অপরদিকে ভারতে উৎপাদিত পাট ও পাটজাত দ্রব্যের শতকরা ৮৫ থেকে ৯০ ভাগই ব্যবহৃত হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে। বাকিটা রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে। বাংলাদেশে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পণ্যে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক আইন, ২০১০ অনুমোদন করেছিল। আইনে সরকারি/বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যে ৭৫ শতাংশ পাট আছে, এমন উপাদান দিয়ে তৈরি মোড়ক ব্যবহারের বিধান করা হয়েছিল। কিন্তু দেশে পাটের ব্যাগের ব্যবহার না বেড়ে বরং কমে গেছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পণ্যের মোড়ক হিসেবে ২৬ হাজার ৫৬০ টন পাট ব্যবহার করেছিল। ২০১১-১২ অর্থ বছরে তা কমে ১৩ হাজার ৬৫০ টনে নেমে এসেছে। পক্ষান্তরে পলিথিন উৎপাদনকারী কারখানাগুলো আড়ালে আড়ালে এখনো তাদের উৎপাদন ও বিপণন কাজ যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছে। রাজধানীর লালবাগে অসংখ্য অবৈধ প্লাস্টিক কারখানা থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার টন প্লাস্টিক ব্যাগ উৎপাদিত হয়ে আসছে বাজারে। কেউ কিছু বলছেন না।

পাটের ব্যবহার মূলত প্যাকেজিংয়ের কাঁচামাল হিসেবে। আমাদের চটের ব্যাগের খ্যাতি রয়েছে বিশ্বজোড়া। পাটকাঠি গ্রামের মানুষের জ্বালানি ও ঘরের বেড়া নির্মাণের একটি বিশেষ অবলম্বন। পাটকাঠি থেকে আতশবাজি তৈরির

কারখানাও আছে চীনসহ অন্যান্য দেশে। প্রথাগতভাবে পাটের ব্যবহার হচ্ছে রশি, সুতলি, সিকা পাকানোর সুতা, হাতে তৈরি কাপড়, কম্বল, মাদুর, গালিচা এবং দেয়ালের আচ্ছাদন হিসেবে। গোয়ালঘরে, গরু বাঁধা, নৌকা ঘাটে বেঁধে রাখা, জাহাজের রশি তৈরি করা, গুন টানা ও মাছধরার কাজে পাটের দড়ি ও সুতলির ব্যবহার খুবই জনপ্রিয়। পাটের সুতা দিয়ে শাড়ি ও লুঙ্গি তৈরির বিষয়েও আমরা অবহিত। বর্তমানে শপিংব্যাগ হিসেবেও এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া কাঁচা পাট ব্যবহার করে কাগজ তৈরির পাম্প, তুলার সঙ্গে পাট মিশিয়ে মিহি সুতা, ঘরের আসবাবপত্র তৈরির জন্য জুটোপ্লাস্টিক সামগ্রী, নদী ও রাস্তার ভাঙ্গন রোধকল্পে জুট জিও টেক্সটাইল ইত্যাদির সঙ্গেও আমরা পরিচিত। পাট থেকে মূল্যবান কার্পেট তৈরির বিষয়টিও এখানে উল্লেখ করার মতো। এসব ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করা খুবই প্রয়োজন। অন্যথায় কেবলই আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নির্ভরশীল থেকে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের মূল্য স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হবে না।

দেশে ও বিদেশে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে সুদূর অতীত থেকে বাংলাদেশে পাটের আওতাধীন জমি ও উৎপাদন বেড়েছে। অনেক সময় এর উৎপাদন ব্যাহত করার জন্যও হয়েছে নানামুখি ষড়যন্ত্র। পাটচাষ বৃদ্ধির ফলে দেশে ধান উৎপাদন হ্রাস পায় এবং এর ফলে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া পাটচাষ বৃদ্ধির ফলে মশার উপদ্রব বেড়ে গিয়ে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে এবং তাতে অনেকের মৃত্যু হচ্ছে। সর্বোপরি পাট পচানোর কারণে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাতে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এ ধরনের বিভিন্ন অভিযোগ তুলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে পাটচাষ বন্ধ করার পায়তারা শুরু হয়। কিন্তু দেশের কৃষকদের নিকট পাট উৎপাদন লাভজনক ছিল বিধায় তা বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। তারপর এসেছে পাটের বিকল্প সিনথেটিক। কিন্তু তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং পরিবেশবিমুখ বলে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে পাটকে হটিয়ে দিতে পারেনি। অবশেষে শুরু হয় পাটকল বন্ধ করে দেয়ার খেলা। ২০০২ সালে ক্রমাগত লোকসানের অজুহাত দেখিয়ে বাংলাদেশে বন্ধ করে দেয়া হয় আদমজি, নিশাত ও দৌলতপুর জুটমিল। তারপরও পাট টিকে আছে, টিকে থাকবে দেশের অসংখ্য চাষির প্রধান অর্থকরী ফসল হিসেবে।

বর্তমানে পাটের মূল্যহ্রাস একটি বড় সমস্যা। তা মোকাবেলা করার জন্য কিছু জরুরি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। দ্রুত হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন পাটের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে। দেশের পাট উৎপাদনকারী কৃষকদেরকে এবং গ্রামীণ ব্যাপারীদেরকে উৎপাদিত বা ক্রয়কৃত মজুদ পাট জামানত হিসেবে রেখে দ্রুত ঋণ দিয়ে সহায়তা করা দরকার। একই সঙ্গে বিজেএমসি এবং বেসরকারি

পাটকলগুলোকে আর্থিক বরাদ্দ ও ঋণ দিয়ে কাঁচাপাট ক্রয়ে আগ্রহী করে তোলা দরকার। তারা যাতে মৌসুমশুরণতেই পাটক্রয়ে নেমে পড়তে পারে সেজন্য আগাম ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া পাটকলগুলো যাতে পুরোদমে উৎপাদনে নিয়োজিত থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি বিদেশে পাটের নতুন ক্রেতা খুঁজে বের করতে হবে। পাটশিল্পখাতে ভর্তুকি বাড়িয়ে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি উৎসাহিত করতে হবে। তাতে অভ্যন্তরীণ বাজারে কাঁচাপাট ক্রয়ে গতিশীলতা আসছে। স্বস্তি ও আস্থা ফিরে আসবে পাটচাষীদের মধ্যে।

[লেখক: কৃষি অর্থনীতিবিদ। প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট।]

পরিবেশবান্ধব পাটচাষের জন্য প্রয়োজন প্রণোদনা

আ র শা দ সি দ্দি কী

পাটের পরিচয় অর্থকরী ফসল হিসেবে। পরিবেশ—সহায়ক হিসেবে পাটজাত পণ্যের ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু পাটের ব্যবহারই শুধু নয়, পাটের আবাদও যে পরিবেশের জন্য উপকারী তা খুব কম সময়ই আলোচনায় উঠে আসে। ফলে পরিবেশ রক্ষায় পাটচাষির অবদান ধর্তব্যের বাইরেই রয়ে যায়। পরিবেশসহায়ক হিসেবে পাটজাত পণ্যের ব্যবহারকে যেভাবে উৎসাহিত করা হয়, পরিবেশবান্ধব ফসল হিসেবে পাট আবাদকারী চাষির অবদানকে সেভাবে উদ্দীপনা প্রদান করা হয় না। পরিবেশবান্ধব ফসল হিসেবে পাটের যথাযথ মূল্যায়ন না হলে পরিবেশরক্ষায় পাটচাষির অবদান উপেক্ষিত হতে বাধ্য। পাটের আবাদ পরিবেশকে বায়ুদূষণ থেকে রক্ষা করে, জমির উর্বরতা বাড়ায়। প্রতি হেক্টরে পাটের

আবাদ গড়পড়তা ২.৫ মেট্রিক টন কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নেয়, ২.০ মেট্রিক টন অক্সিজেন নিঃসরণ করে। উপরন্তু পাটচাষ কার্বন ও নাইট্রোজেন সমন্বয়ে জমির উর্বরতা বাড়ায়।

পাট উৎপাদনে অন্যান্য ফসলের তুলনায় কমমাত্রায় সার ব্যবহার করতে হয়। পরিবেশের রক্ষায় যা ইতিবাচক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাটচাষিরা জৈবসার ব্যবহার করেন। প্রণোদনা পেলে পাটচাষিরা জৈবসার ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে অধিক ভূমিকা পালন করতে পারেন। অন্যান্য তন্তুর তুলনায় পাট উৎপাদনে কম সময় লাগে। মাত্র ৪ থেকে ৬ মাসের মধ্যে পাটের বীজ রোপণ থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত উৎপাদন-চক্র সম্পন্ন করা যায়। পাট উৎপাদনের ফলে ব্যবহৃত জমির উর্বরশক্তি বেড়ে যাওয়ার কারণে একই জমিতে অন্যান্য ফসলের আবাদ ভালো হয়। একইসাথে জমিতে পোকামাকড়ের আক্রমণ এবং রোগের মাত্রা কমে যায়।

পাট প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় গড়পড়তা ১.৪২৮ মিথেন প্রতিকেজি পাট প্রক্রিয়াকরণের সময় নিঃসরিত হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাটের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাটের তৈরি আসবাব লক্ষ লক্ষ গাছের জীবন রক্ষা করতে পারে। গাছ বাঁচলে বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলবায়ুও উষ্ণতা বৃদ্ধি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

পরিবেশবাদীরা পাটজাত পণ্যের ব্যবহার উৎসাহিতকরণে যতখানি সোচ্চার, বায়ুদূষণ থেকে রক্ষা ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তায় পাটচাষির অবদানের কথা প্রচারে ততখানি নীরব। ফলে পাটের আবাদের ফলে পরিবেশ রক্ষায় পাটচাষির ভূমিকা খুব কম ক্ষেত্রেই আমলে নেয়া হয়। পরিবেশ সংরক্ষণে পাটচাষির অবদান যথাযথভাবে মূল্যায়িত না হওয়ায়, পরিবেশবান্ধব ফসল উৎপাদনকারী হিসেবে পাটচাষিরা উদ্দীপনাবঞ্চিত। উপরন্তু অর্থকরী ফসল হিসেবে পাট উৎপাদন সমূহ ঝুঁকির আবর্তে রয়েছে। পরিবেশবান্ধব ফসল উৎপাদনকারী হিসেবে আমাদের পাটচাষিরা উদ্দীপনা বা প্রণোদনার বদলে নিরন্তর নানান বিড়ম্বনা মোকাবেলা করছেন—

১. বর্তমানে বাংলাদেশের পাটচাষিদের অন্যতম সঙ্কট হল, ভালোমানের পাটবীজের অপ্রতুলতা। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের সাথে যুক্ত রয়েছে। উন্নতমানের পাট বীজ উৎপাদন, বিক্রয় বা বাজারজাতকরণে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসেনি।
২. বিএডিসি প্রয়োজনের তুলনায় এক চতুর্থাংশের চয়েও কম সরবরাহ করতে পারে। উন্নতমানের দেশীয় বীজের অপ্রতুলতার কারণে পাটচাষিরা

নিম্নমানের ভারতীয় পাটবীজ তোষা ব্যবহারে বাধ্য হন। বৈধ-অবৈধ উপায়ে ভারতীয় পাটবীজ তোষা বাংলাদেশের বাজারে অনুপ্রবেশ করছে।

৩. বীজ-সংকট সমাধান ছাড়া পাটপণ্য কিংবা পাটপ্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা অনর্থক। বর্তমানে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) পাটের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের সাথে যুক্ত রয়েছে। এসকল উন্নত জাতের পাট কৃষকপর্যায়ে চাষাবাদের জন্য উৎসাহ প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে।
৪. সেচ-সমস্যা বর্তমানে পাটচাষের অন্যতম একটি সমস্যা। সীমান্তে নদী-সংযোগস্থলে বাঁধ নির্মাণ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে কৃষকরা কাঁচা পাট প্রক্রিয়াজাতকরণের সমস্যায় ভুগছেন। পাটের উৎপাদনব্যয় বাড়ছে। পাটচাষিরা লাভের পরিবর্তে লোকসান গুনতে বাধ্য হচ্ছেন।
৫. পাটচাষিরা ঘামঝরানো ফসল সময়মতো ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতে পারেন না। ঘরোয়া বাজারে কাঁচা পাটের দাম কম হওয়ায় ভারতে চোরাচালান হয়ে যায় পাট। পাটচাষিরা উপায়হীন হয়েই পরিশ্রমের ফসল চোরাচালানীদের হাতে নামমাত্র মূল্যে তুলে দিতে বাধ্য হন।
৬. বাংলাদেশের পাটজাত পণ্যের অন্যতম আমদানিকারক দেশ ভারত। কিন্তু পাট আমদানিতে ভারত ট্যারিফ নন-ট্যারিফ আরোপ করায় ভারতে বাংলাদেশের পাটজাত পণ্যের রপ্তানি কমছে। ভারত কতটুকু যৌক্তিকভাবে ট্যারিফ নন-ট্যারিফ আরোপ করেছে সংশ্লিষ্ট মহলের তরফ থেকে তা-ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে না।
৭. পাটক্রোতাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, পাট কেনার মওসুমে পাটকল মালিকরা পুঁজির অভাবে পরিকল্পনামাফিক পাট কিনতে পারেন না। বিজেএমই ও বিজেএমসি'র ভাষ্যমতে পাট মওসুমে এক লক্ষ বেল পাট কেনার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও তারা মাত্র ১০% লক্ষ্যপূরণে সক্ষম হন।
৮. বিগত তিন বছর ধরে লাগাতার আমাদের পাট এবং পাটজাত পণ্যের বাজার নিম্নমুখী। বর্তমান সরকার সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে মোড়কজাতকরণে পাটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। তা সত্ত্বেও বিগত দু'বছরে পাটের ব্যাগের ব্যবহার কমেছে। পরিবেশবান্ধব ফসল পাটের উপর নির্ভরশীলদের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানে পাটের বাজার সম্প্রসারণ অত্যাাবশ্যক।

সাম্প্রতিককালে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে আবারও পরিবেশবান্ধব ফসল পাটের বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা ও

উদ্যোগের অভাবে বাংলাদেশের পাটের বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা অংকুরেই বিনষ্ট হচ্ছে।

বিশ্ববাজারে অন্যতম প্রতিযোগী ভারতের কাছে বাংলাদেশ পাটের বাজার হারাচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোয় লাগাতার রাজনৈতিক অস্থিরতা-সংঘাত বাংলাদেশের পাটের বাজার সংকুচিত করেছে। ফলে পাটের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, পরিবেশবান্ধব ফসল উৎপাদনকারী পাটচাষির জীবন-জীবিকাও পড়েছে হুমকির মুখে।

আশির দশকের শুরুতেও বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম উৎস ছিলো পাট। কিন্তু কৃত্রিম তন্তুর উদ্ভাবন ও ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে পাটের বাজার ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। দামে সস্তা ও সহজ ব্যবহারযোগ্য হওয়ার ফলে কৃত্রিম তন্তু দ্রুতই পাটের বাজার হাতছাড়া হয়ে যায়।

১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে রফতানি আয়ের ৯০ শতাংশই ছিল পাটের অবদান। এখন এ হার ২ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট রফতানি আয় ৩ হাজার ১২১ কোটি ডলারের মধ্যে পাটের অবদান ছিল মাত্র ৮৬ কোটি ৫৩ লাখ ডলার।

পাটদ্রব্যের বাজারমূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও কৃত্রিম তন্তুর ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের চাহিদা বাড়ছে। আমাদের দেশের পাট ব্যবসায়ীরাও নতুন করে পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। ব্যক্তিমালিকানায় গড়ে উঠেছে নতুন পাটকল। কিন্তু পরিবেশবান্ধব ফসল উৎপাদনকারীরা এসকল সম্ভাবনা সম্পর্কেও অবহিত নন।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ- সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে বাড়ছে পাটের ব্যবহার। পরিবেশ- সচেতন মানুষের কাছে আদৃত হচ্ছে পাটজাত পণ্য। তৈরি হচ্ছে প্রাকৃতিক তন্তু পাটের সম্প্রসারণের বাজার নতুন সম্ভাবনা। বিশ্বের প্রধানতম পাট উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য পাটের সোনালি অতীত পুনরুদ্ধারের প্রতিযোগিতায় शामिल হয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে পরিবেশবান্ধব ফসল হিসেবে পাটের স্বীকৃতি এবং পাটচাষিদের পরিবেশবান্ধব ফসল উৎপাদনকারী হিসেবে বিশেষ প্রণোদনা প্রদান সময়ের দাবি।

[লেখক: গবেষক, প্রাবন্ধিক। সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ লেখক ঐক্য।]

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সুপারিশ

মো. মাহবুবুল ইসলাম

সূচনা

বাংলাদেশে উৎপাদিত অর্থকরী ফসলগুলোর মধ্যে পাটের স্থান শীর্ষে। পাটের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও ব্যবহারিক উপযোগিতা ইত্যাদি বিবেচনা করে পাটকে ‘সোনালি আঁশ’ নামে অভিহিত করা হয়। কোনো বৈদেশিক বিনিয়োগ ছাড়াই পাট থেকে এককভাবে বৎসরে প্রায় ১.৫৮% জিডিপি আয় হয়। পাট একটি পরিবেশবান্ধব পচনশীল প্রাকৃতিক আঁশ যা এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতে বহুলভাবে চাষ হয়। পাট দ্রুত বর্ধনশীল ফসল, যা ১২০ দিন বয়সে কর্তন করা যায়। এই পাট ফসল, পাট আঁশ ও পাটজাতীয় দ্রব্য প্রাকৃতিক পরিবেশকে ক্ষতির হাত থেকে শুধু রক্ষাই করে না বরং এই ফসল চাষে পরিবেশ ও জলবায়ু উভয়ই সমষ্টিগতভাবে সংরক্ষিত থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর কাঁচা পাট ও পাটপণ্য রফতানি হয়, যা থেকে অর্জিত হয় মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা।

পাট বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই চাষ হয়। এ দেশে দেশি ও তোষা দুটি জাতের পাটের আবাদ হয়। এ দেশে ৭০ বা ৮০-এর দশকে ১৫-১৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাটের চাষ হত যা পরবর্তীতে কমে ৪.৫-৫.০ লক্ষ হেক্টরে নেমে আসে এবং সাথে সাথে আঁশের উৎপাদনও ২২-২৫ লক্ষ টন থেকে ৮-৯ লক্ষ টনে নেমে আসে। বর্তমানে ২০১০ সালের পর থেকে পুনরায় পাটের জমি ও আঁশের উৎপাদন বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পেয়ে ৬.০-৭.৫ লক্ষ হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে, যা থেকে বছরে আঁশ উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ১৫ থেকে ১৬ লক্ষ টন। নিম্নে গত ১৯৮১-৮৬ থেকে ২০০৬-১১ পর্যন্ত (৫ বছরের গড় ভিত্তিতে) এবং ২০০৭-০৮ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত (বছর ভিত্তিতে) পাটের উৎপাদন ও জমির পরিমাণ দেখানো হল (সারণি: ১)।

সারণি ১: গত ১৯৮১-৮৬ থেকে ২০০৬-১১ পর্যন্ত ৫ বছরের গড় ভিত্তিতে এবং
২০০৭-০৮
থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত বছর ভিত্তিতে পাটের উৎপাদন ও জমির পরিমাণ

৫ বছরের গড়	জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ টন)
১৯৮১-৮৬	৭.০২	১০.৩৫
১৯৮৬-৯১	৫.৯১	৯.৩১
১৯৯১-৯৬	৫.১৭	৮.৫৪
১৯৯৬-০১	৪.৯৮	৮.৫৭
২০০১-০৬	৪.১৮	৮.০৫
২০০৬-১১	৪.৮১	১০.০৬
বছর ভিত্তিক	জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ টন)
২০০৭-০৮	৪.৭৩	৮.৬৯
২০০৮-০৯	৪.৭৪	৮.৯৫
২০০৯-১০	৪.৫৬	৮.৮৯
২০১০-১১	৮.০৩	১৫.২৩
২০১১-১২	৭.৬০	১৪.৪১
২০১২-১৩	৬.৮১	১৩.৭১

পাট আঁশের ফলন বা উৎপাদনশীলতার উপর বিশেষজ্ঞ মতামত

পাটের উৎপাদনশীলতার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় গত ৮৭ বৎসরে বাংলাদেশের পাটের উৎপাদনশীলতা অথবা ফলন ১.৪৮-১.৫৭ টন/হে.-এর মধ্যে ছিল। এ বিষয়ে বিভিন্ন লেখক বা গবেষকের গবেষণালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মো. রকিব উদ্দিন আহমেদ (১৯৬৬) বলেছেন পাটের উৎপাদন বা ফলন-এর সাধারণ ধারণা সম্পর্কে বলতে হলে শুধু ফলন বলা যাবে না এই ফলনকে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং তিনি আরও বলেন যে শুধু গাণিতিক গড় করেই সাধারণ ফলন বলা অনেক সময় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বেঙ্গল স্টেট সরকারের ম্যানুয়েল অব রুলস (১৯২২)- এ বলা হয়েছে পাটের ফলন এমন একটা বিষয়, যা পাটের মৌসুম বা উক্ত মৌসুমের বৃষ্টিপাত পাট উৎপাদনের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো অবস্থানেই ছিল না। স্যার আজিজুল হক (১৯৩০) সালে এই বিষয়টি আরো গভীর ও গুরুত্বের সাথে তাঁর ‘ম্যান বিহাইন্ড প্লাউ’-এ বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, “কোনো উৎপাদনকারী যদি পর পর দশ বৎসর পাট ফসল চাষ করে তবুও তিনি পাটের সাধারণ উৎপাদন হিসাবে কোনো ধারণা অর্জন করতে পারবেন না”। তিনি আরো উল্লেখ করেন পাটের কোনো বৎসরের উৎপাদন বা ফলনকে অথবা কোনো একটা লম্বা সময়ের (কয়েক বৎসরের গড়) ফলনকে সাধারণ ফলন বলা খুবই কঠিন। অতএব বলা যায় পাটের ফলন কোনো একক অংক সংখ্যা না দিয়ে ফলনের একটা রেঞ্জ দেয়া ভালো। সাধারণ ফলনের রেঞ্জ এমন হবে যেন ফলনের গড় উক্ত রেঞ্জের সীমার মধ্যে থাকে। দি সিজন এন্ড ক্রপ রিপোর্ট (১৯৪৬-৪৭) (পূর্ববাংলা সরকারের)-এ বলা হয়েছে ঐ বৎসরের পাটের গড় ফলন ছিল ১.৪৯ টন/হেক্টর। কিন্তু তদানীন্তন কৃষি পরিদপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এমন যে, পূর্ববাংলায় পাটের সাধারণ ফলন ১.৬৬ টন/হে., উত্তরবঙ্গে ১.৫৭ টন/হেক্টর এবং পশ্চিমবঙ্গে ১.৪৩ টন/হেক্টর ছিল। এর চেয়ে প্রায় ১৩ বৎসর পূর্বে এন সি চৌধুরী (১৯৩৩) দেখেন এই বাংলায় পাটের সাধারণ উৎপাদনশীলতা ১.৪৮ টন/হেক্টর ছিল এবং ঐ সময় (১৯৩৩) ফিনলো (Finlow) কমিটিও একই মতামত ব্যক্ত করেন।

গত ৪১ বৎসরে পাট আঁশের সাধারণ ও উচ্চ ফলনের ব্যাখ্যা

উচ্চ ফলন বলতে আমরা জানি একটি সাধারণ ফলনের বেশি ফলন এবং এর কম হলে তাকে কম ফলন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বেঙ্গল সরকারের দি ম্যানুয়েল অব রুলস(১৯২২) প্রতিবেদনে বলা হয় প্রকৃত মৌসুম ও পরিমিত বৃষ্টিপাত পেলে পাটের উচ্চ ফলন পাওয়া সম্ভব— এর ব্যত্যয় হলে ফলন কমে যায়। এর আগে বলা হয়েছে যে, ১.৪৮-১.৫০ টন/হেক্টর-এর কাছে বা এর মধ্যে যে কোনো ফলনই হল বাংলাদেশের পাটের সাধারণ ফলন বা উৎপাদনশীলতা।

গত ৪১ বৎসরের (১৯৭২-২০১৩) ফলনের পরিমাণ থেকে দেখা যায় প্রায় ৩২ বৎসর পাটের উচ্চ ফলন পাওয়া গিয়েছে অর্থাৎ যা ১.৪৮-১.৫০টন/হেক্টর উপরে ছিল। তার মধ্যে মাত্র ৯ বৎসরের ফলন ১.০৮-১.৪০টন/হেক্টর। এই রেঞ্জের মধ্যে ছিল। সেগুলো হল ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত। এই যে সাধারণ ফলনের মাত্রার চেয়ে কম পাওয়া গেল তা স্যার হকের মন্তব্যের সাথে খুবই অস্বাভাবিক। গত ৪১ বৎসরের (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১২-২০১৩) মধ্যে পাটের উচ্চ ফলন পাওয়া যায় ২০১২-১৩ সালে ২.০১ টন/হেক্টর, এবং সবচেয়ে কম

ফলন ১.০৮টন/হেক্টর পাওয়া গিয়েছিল ১৯৭৪-৭৫ সালে। তবে দ্বিতীয় উচ্চ ফলন ১.৯৮টন/হেক্টর দেখা যায় ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ সালে এবং দ্বিতীয় সর্বনিম্ন ফলন ১.২৫টন/হেক্টর হয়েছিল ১৯৭৩-৭৪ সালে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো তা হল ১৯৭৪ সালের আগে ১৯৪১-৪২ সালে যশোহরে পাটের সর্বোচ্চ ফলন ২.১৫টন/হেক্টর হয়েছিল এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে পাবনায় সর্বনিম্ন ফলন ০.৭৭ টন/হেক্টর হয়েছিল বলে তৎকালীন জেলা ভিত্তিক মূল্যায়ন রিপোর্ট-এ প্রমাণ পাওয়া যায় (সারণি: ২)।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে পাটের উচ্চ বা নিম্ন উভয় ফলনই খুবই তারতম্য সম্পন্ন বা ফ্লাকচুয়েটিং। এই তারতম্য বৎসর থেকে বৎসরে এমনকি স্থানভেদেও প্রতীয়মান হয়। তবে কৃষিফসলের জন্য এটি অস্বাভাবিক নয়। এই উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ফলনের কৃষিতাত্ত্বিক অবস্থা বা উৎপাদন মৌসুমের আবহাওয়াগত অবস্থা। যার জন্য বৎসর বৎসর এবং স্থানভেদে কৃষিফসলের ফলনের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে একটি বিষয় মনে রাখার মতো, তা হল বাংলাদেশে পাটের ফলনের উপর একটি ধনাত্মক বিষয় আছে যেমন— সাধারণভাবে উৎপাদিত পাট বাংলাদেশে প্রায় একেবারেই দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও সবচেয়ে দুর্বল জমিতে চাষ করা হলেও এর ফলন কিস্তি তেমন কম হচ্ছে না বরং বৃদ্ধির দিকে। তাছাড়া ১৯৮১-৮২ সাল থেকে গত প্রায় ৩২ বৎসর ধরে বাংলাদেশের পাটের ফলন বা উৎপাদনশীলতা উর্ধ্বমুখি। তবে শুধু ১৯৮৪-৮৫ সালে একটু ব্যত্যয় আছে। নিম্নের ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত বার্ষিক ফলনচিত্র দেখা যেতে পারে। এখানে শুধুমাত্র ৮০-এর দশকের কয়েকটি বৎসর যেমন— ১৯৮১-৮২, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৮-৮৯ ও ১৯৮৯-৯০ সালের ফলন একটু কম ছিল। তাছাড়া ২০১৩ পর্যন্ত ফলন বেড়েই চলেছে ক্রমান্বয়ে। গত ৩২ বৎসরে ১৯৮১-৮২ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত ফলনের গড় করলে দেখা যায় তা ছিল ১.৬৯ টন/হেক্টর। এই ফলন আগেকার সাধারণ বা গড় ফলনের চেয়ে বেশি (সারণি: ২)।

পূর্ববর্তী এক গবেষকের প্রবন্ধ থেকে গত ৮০ বৎসরের পাটের ফলন-এর ইতিহাস মূল্যায়নের মাধ্যমে দেখা গেছে বাংলাদেশের পাটের সাধারণ ফলন ১.৪৮ থেকে ১.৫০ টন/হেক্টর-এর মধ্যে বা এর কাছাকাছি ছিল। তবে এই লেখাটির মাধ্যমে সাধারণ ফলন ও উচ্চ ফলন-এর পাটের বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি মূল্যায়নে দেখা যায় যদিও পাট ধীরে ধীরে দুর্বল ব্যবস্থাপনার শিকার ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল জমিতে চাষ করা ইত্যাদি সত্ত্বেও পাট ফলনের দিক দিয়ে উচ্চ মাত্রার দিকে এগিয়েছে। বিশেষ করে গত প্রায় ৩২ বৎসরে ১৯৮১-৮২-এর পর থেকে পাটের ফলন উচ্চ পর্যায়ে দিকে ধাবিত হচ্ছে (সারণি: ২)।

গত ৩২ বৎসরের (১৯৮১-৮২ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত) গড় ফলন ১.৬৯ টন/হেক্টর ছিল। এ সময়ে সবচেয়ে বেশি ফলন ২.০১ ও ১.৯৮ টন/হেক্টর পাওয়া যায় ২০১২-১৩ এবং যথাক্রমে ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ সালে এবং কম হয় ১.০৮ টন/হে. ১৯৭৮-৭৯ সালে। এগুলো বিবেচনা করলে স্পষ্ট ধারণা করা যায় এই সময় (২০০৫-০৬ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত) পাটে উচ্চ ফলনের সময় চলছে (বাংলাদেশে পাট চাষের ইতিহাসে)।

সারণি ২: পাটের বৎসর ভিত্তিক ফলন (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১২-১৩)

ক্রমিক নং	বৎসর	ফলন (টন/হে.)	ক্রমিক নং	বৎসর	ফলন (টন/হে.)
১	১৯৭২-৭৩	১.৩০	২২	১৯৯৩-৯৪	১.৬৮
২	১৯৭৩-৭৪	১.২৫	২৩	১৯৯৪-৯৫	১.৭১
৩	১৯৭৪-৭৫	১.০৮	২৪	১৯৯৫-৯৬	১.৬০
৪	১৯৭৫-৭৬	১.৩৬	২৫	১৯৯৬-৯৭	১.৭৩
৫	১৯৭৬-৭৭	১.৩২	২৬	১৯৯৭-৯৮	১.৭৮
৬	১৯৭৭-৭৮	১.৩১	২৭	১৯৯৮-৯৯	১.৭৮
৭	১৯৭৮-৭৯	১.৩৯	২৮	১৯৯৯-	১.৭৬
				২০০০	
৮	১৯৭৯-৮০	১.৪০	২৯	২০০০-০১	১.৮২
৯	১৯৮০-৮১	১.৩৯	৩০	২০০১-০২	১.৭৮
১০	১৯৮১-৮২	১.৫২	৩১	২০০২-০৩	১.৮২
১১	১৯৮২-৮৩	১.৫৮	৩২	২০০৩-০৪	১.৯৩
১২	১৯৮৩-৮৪	১.৬৮	৩৩	২০০৪-০৫	১.৮০
১৩	১৯৮৪-৮৫	১.৪১	৩৪	২০০৫-০৬	১.৯৮
১৪	১৯৮৫-৮৬	১.৫৩	৩৫	২০০৬-০৭	১.৯৮
১৫	১৯৮৬-৮৭	১.৬৩	৩৬	২০০৭-০৮	১.৮০
১৬	১৯৮৭-৮৮	১.৭১	৩৭	২০০৮-০৯	১.৮৯
১৭	১৯৮৮-৮৯	১.৫৩	৩৮	২০০৯-১০	১.৯৫
১৮	১৯৮৯-৯০	১.৬০	৩৯	২০১০-১১	১.৮৯
১৯	১৯৯০-৯১	১.৬৪	৪০	২০১১-১২	১.৯০
২০	১৯৯১-৯২	১.৬৩	৪১	২০১২-১৩	২.০১
২১	১৯৯২-৯৩	১.৭৭			

সারণি ৩: উৎপাদনশীলতা পর্যায় এর ফ্রিকোয়েন্সি ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬-৯৭ (২৫ বৎসর) ও ১৯৮৫-৮৬ থেকে ২০১২-১৩ সাল (২৬ বৎসর)

ক্রমিক নং	উৎপাদনশীলতা পর্যায় (টন/হেক্টর)	ফ্রিকোয়েন্সি		মন্তব্য
		২৫ বৎসর	২৬ বৎসর	
১।	১.০০-১.১০	১	-	গত ২৫ বৎসরের গড় উৎপাদনশীলতা ১.৫১ (টন/হে.)
২।	১.১০-১.২০	-	-	
৩।	১.২০-১.৩০	২	-	
৪।	১.৩০-১.৪০	৫	-	
৫।	১.৪০-১.৫০	২	-	গত ২৬ বৎসরের গড় উৎপাদনশীলতা ১.৬৯ (টন/হে.)
৬।	১.৫০-১.৬০	৫	৩	
৭।	১.৬০-১.৭০	৬	৫	
৮।	১.৭০-১.৮০	৪	৯	
৯।	১.৮০-১.৯০	-	৬	
১০।	১.৯০-২.০০	-	৪	
১১।	২.০০-২.১০	-	১	

এই উচ্চ ফলন সময় লক্ষ করলে বর্তমান সময়ে পাটের সাধারণ ফলন সম্পর্কে পুনরায় ভাবার দরকার আছে বা সময় এসেছে। এ জন্য অপর একটি ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল বিবেচনা করার সুযোগ আছে (সারণি: ৩)। গত ২৫ বৎসরে (১৯৭২-৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬-৯৭) গড় ফলন ১.৫১ টন/হেক্টর যে পর্যায়ে পড়ে তা হল ১.৫০-১.৬০ টন/হেক্টর, তা ছিল মোট ৫ বার। এই পর্যায়ের নিচে গত ২৫ বৎসরে আছে ১০ বার এবং এর চেয়ে উপরে উচ্চ ফলন ছিল ১০ বার। অন্য দিকে পরবর্তী ২৬ বৎসরের (১৯৮৫-৮৬ থেকে ২০১২-১৩) গড় ফলন ১.৬৯ টন/হেক্টর যার উৎপাদনশীলতা পর্যায় হল ১.৬০-১.৭০ টন/হেক্টর, তা ছিল মোট ৫ বার। উক্ত সময়ে ফলন এই মাত্রার নিচে ছিল মাত্র ৩ বার এবং উপরে ছিল মোট ২০ বার।

এই চিত্র থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে গত ২৫ বৎসরে (১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৯৬-৯৭) পাটের বার্ষিক উৎপাদনশীলতা বা ফলন বেশি সময় ছিল ১.৬০-১.৭০ টন/হেক্টর-এর মধ্যে। কিন্তু গত ২৬ বৎসরে (১৯৮৫-৮৬ থেকে ২০১২-১৩) উক্ত ফলন ছিল ১.৭০-১.৮০ টন/হেক্টর-এর মধ্যে ছিল ৯ বার। অতএব বলা যায় বাংলাদেশে পাটের ফলন এখন উচ্চমুখী এবং সাধারণ ফলন এই ১.৭০-১.৮০ টন/হেক্টর-এর মধ্যবর্তী বা কাছাকাছি হবে।

পাটের ফলনে কৃষিতত্ত্ব

বর্তমানে পাটের এই উচ্চ ফলন বা উৎপাদনশীলতার জন্য অবশ্যই পাট আবাদে চাষি ও পাট গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত পাটবিজ্ঞানী ও কৃষিবিদরা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। কারণ পাটের জমি দুর্বল হলেও উন্নত জাত, উন্নত চাষাবাদ প্রযুক্তি, উন্নত পচন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির সমন্বয়ে আজকের এই উচ্চ ফলন প্রাপ্তিতে সহায়তা হয়েছে। বাংলাদেশের উদ্ভাবিত জাতগুলোর ফলনশীলতা অনেক বেশি যেমন— ৪.৫০টন/হে.-এর উপরে। তবে গবেষকরা মাঠে সচরাচর ৩.০০-৩.৫০টন/হে. আঁশ পেয়ে থাকেন। কিন্তু কৃষকপর্যায়ে এই ফলন শুধু ফরিদপুর ও তার আশপাশের কিছু এলাকায় পাওয়া যায়। সারা বাংলাদেশের চিত্র এক নয়। অন্যান্য স্থানে ১.৯০টন/হে. পাওয়াই কঠিন। পাটের ফলনের জন্য যে বিষয়গুলো প্রয়োজন সেগুলো হল সময়মত বপন, সময়মতো কর্তন ও আন্তরবর্তী পরিচর্যা। পরিমিত পাতলাকরণ। বেশি পাতলা করলে গাছ মোটা হয়ে আঁশের মান খারাপ হয়। কম পাতলা করলে গাছ খুবই চিকন হয়ে ফলন কম হয় আঁশ ছাড়ানো কঠিন হয়। তাই যেন পরিমিত পাতলা অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৪-৫ লক্ষ গাছ রাখার ব্যবস্থা করা, তাহলে ফসলের মাঠে গাছের উচ্চতাও ভালো হবে প্রায় ৩.৫ মিটার এবং ব্যাস হবে ১৬-১৮ মিলিমিটার। যা থেকে ভালো মানের অধিক আঁশের ফলন পাওয়া সম্ভব। পাট পচন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় মানসম্পন্ন আঁশ উৎপাদনের জন্য। বেশি পচলে আঁশ নষ্ট হয়। কম পচলে আঁশ ছাড়ানোর অভাবে ফলন কম হয়। পচনের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার না করলে আঁশ কালো ও নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব পাটের ফলন উর্ধ্বমুখি রাখতে হলে পাটের কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার দিকে সমধিক বিশেষ দৃষ্টি প্রদান একান্ত প্রয়োজন।

দুই.

পাট তথা সোনালি আঁশ চাষে বাংলাদেশ এক বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ আছে। পাটচাষের মাধ্যমে বাংলাদেশ লক্ষ লক্ষ কৃষক ও কলকারখানার শ্রমিক জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে জীবন ধারণ করে থাকেন। এক সময় পাট ছিল এদেশের একমাত্র এবং প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ফসল। ১৯৬৯-৭০ সালে বাংলাদেশ ৮৬৯ হাজার হেক্টর জমি থেকে ১৩৬৬ হাজার টন পাট আঁশ উৎপাদিত হোত। পরবর্তীতে ১৯৯০-৯১ সালে পাটে জমি ছিল কমে ৫৮৪ হাজার হেক্টরে চলে আসে এবং তা থেকে ৯৬২ হাজার আঁশ উৎপাদন হয়। তবে ২০১০-১১ সালে পাটের জমি পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে ৭০৮ হাজার হেক্টরে উন্নীত হয়, যা থেকে আঁশ পাওয়া যায় ১৫২৬ হাজার টন। যা বর্তমানে কম-বেশি চলমান আছে। পোদ্দার, ১৯৯২-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বলা যায় পাটের চাষ, বাজার ব্যবস্থাপনা এবং পাটপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য জীবিকা নির্বাহ বা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। পাট ও পণ্য থেকে বাংলাদেশ সরকার বহু রেভিনিউ উপার্জন করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও সামাজিকতায় পাট বিক্রির নগদ টাকা কাজে লাগে এবং গ্রামীণ ব্যবসা পরিচালনা সহজ ও দ্রুততর করে। মোট কথা পাটকে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য বা আয় এবং অর্থনৈতিক পরিমাপক হিসেবে গণ্য করা চলে।

পাট আঁশে বাজারব্যবস্থাপন পস্থা বা মার্কেটিং চ্যানেল

গত ২০০০-০৩ সালের মনিরঞ্জামান ও অন্যদের প্রতিবেদনে দেখা যায় পাটের বাজার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পস্থায় বা চ্যানেলে সেই সময় বাংলাদেশের কাঁচা পাটের প্রায় শতকরা ৯৩ ভাগ আঁশ কৃষকপর্যায় থেকে আড়তদারদের মাধ্যমে ক্রয় করা হত। সেই সময় বাজারের অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলো ফরিয়া বা ব্যাপারি-এর চেয়ে অনেক কম পাট কৃষকপর্যায় থেকে ক্রয় করে। প্রথম কথা হল বাংলাদেশের গ্রামপর্যায়ে কাঁচা পাটের আঁশ বাজার ব্যবস্থাপনায় পাঁচ প্রকার বাজার পস্থা বা মার্কেটিং চ্যানেল কার্যকর পাওয়া যায়। যেমন—

- ১। কৃষক- ফরিয়া- কাঁচা বেলার- পাকা বেলার অথবা রপ্তানিকারক- পাটকল অথবা বিদেশি ক্রেতা
- ২। কৃষক- ব্যাপারি- কাঁচা বেলার- পাকা বেলার অথবা রপ্তানিকারক- পাটকল বা বিদেশি ক্রেতা
- ৩। কৃষক- কাঁচা বেলার- পাকা বেলার অথবা রপ্তানিকারক- পাটকল বা বিদেশি ক্রেতা

৪। কৃষক- ফরিয়া- পাকা বেলার অথবা রপ্তানিকারক- পাটকল অথবা বিদেশি ক্রেতা এবং

৫। কৃষক- ব্যাপারি- পাটকল- পাকা বেলার- বিদেশি ক্রেতা

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে কৃষক তার পাট আঁশ গ্রামের হাটে ফরিয়া বা ব্যাপারির কাছে বিক্রি করে। তারপর ফরিয়া তার বাছাইবিহীন আঁশ ব্যাপারির নিকট বিক্রি করে যে কিনা বেশ বড় আকারের পরিমাণ পাট আঁশ নিয়ে ব্যবসা করে থাকেন। ব্যাপারিরা তার পাট কাঁচা, পাকা বেলার এমনকি পাটকলেও অনেক সময় বিক্রি করে থাকে। কাঁচা বেলার বা সাধারণত পাট আঁশ কৃষক, ফরিয়া, ব্যাপারির নিকট থেকে ক্রয় করে এবং বেল আকারে বাঁধাই করে থাকে কাঁচা বেল তৈরি করে। যার ওজন হয় ১৫০ কেজি। এই কাঁচা বেল করা পাট আঁশ তারপর বিভিন্ন ধাপের দালালের/ব্রোকারের মাধ্যমে পাকা বেলার যারা রপ্তানি করে থাকেন তাদের কাছে এবং অনেক সময় সরাসরি পাটকল মালিকদের কাছে বিক্রি হয়। এর মধ্যে আবার এক ধরনের স্থায়ী কাঠামো ধারার ব্যবসায়ী আছে যাদের আড়তদার বলা হয়। তাদের হাটে বা বাজারে বড় ধরনের পাটগুদাম আছে তারা কমিশনিক এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, যাদের কাজ হল পাট আঁশ ব্যবসায়ীদের সাথে বেলার/রপ্তানিকারক বা পাটকল মালিকদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দেখা যায়। এদের বাঁধাধরা এবং আগে থেকে ঠিক করা কমিশন প্রদান করতে হয়।

পাকা বেলার বা রপ্তানিকারকেরা অনেক সময় ফরিয়া বা কাঁচা বেলার থেকে কাঁচা পাট বেল ছাড়া বা কাঁচা বেল আকারে ক্রয় করে থাকে। রপ্তানিকারকরা বাজার পন্থার সর্বোচ্চ স্থানে কাজ করে অর্থাৎ টারমিনাল মার্কেট। তারা খোলা পাট ডিলারের নিকট থেকে এবং বেল বাঁধাই অবস্থায় কাঁচা এবং পাকা বেলারদের নিকট থেকে ক্রয় করে থাকেন। এই রপ্তানিকারক বা পাকা বেলার বা তাদের বেল করা পাট দালালের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের পাটকলগুলোর কাছে বিক্রি করে এবং পাকা বেলার বিদেশি ক্রেতাদের নিকট বিক্রি করে অর্থাৎ রপ্তানি করে থাকে। অন্যদিকে বিদেশি ক্রেতারা যেমন কাঁচা পাট রপ্তানিকারকদের নিকট থেকে ক্রয় করে তেমনি আবার বিভিন্ন পাটকল থেকে প্রক্রিয়াজাত করা পাটপণ্যও ক্রয় করে।

বাজারব্যবস্থাপনা চ্যানেলের বিভিন্ন কর্মপরিধি

বাংলাদেশে উৎপাদিত কাঁচা পাটের খুব সামান্য অংশই কৃষকের ঘরে তার খুবই নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাখা হয়। যা দিয়ে গৃহস্থালী দড়ি, সিকা, কাছি ইত্যাদি তৈরি হয়। তা ছাড়া সমস্ত পাটই বাজারব্যবস্থা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে

শেষপর্যন্ত দেশ-বিদেশের পাটকলগুলোতে পৌছে। কাঁচা পাটের বাজারপদ্ধতিতে বিভিন্ন ধাপের বাজারব্যবস্থাপনা চ্যানেল লক্ষ করা যায় যেমন— প্রাথমিক পর্যায়ে, মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং সর্বশেষ ধাপ বা টারমিনাল বাজার পাটের এই কাঁচা বাজার পদ্ধতির মধ্যে উৎপাদনকারী হিসেবে কৃষক বিক্রেতা হলেও এই পণ্য বিক্রয়ে আরো বেশ কয়েকটি মধ্যস্থতাকারী প্রতিযোগী বিক্রেতা আছে বা ঐ বিক্রয়ে মৌসুমে তাদের উদ্ভব হয়। এই প্রতিযোগীরা হলেন— ফরিয়া, ব্যাপারি, আড়তদার, কাঁচা বেলার, পাকা বেলার, রগুনিকারক, পাটকল প্রতিনিধি বা মালিক, দালাল, আন্তর্জাতিক দালাল এবং বিদেশি ক্রেতা।

পাট আঁশ উৎপাদনকারী কৃষক শুধুমাত্র প্রাথমিক ধাপের বাজারব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে যুক্ত। কাঁচা পাটের বাজারব্যবস্থাপনা শুরুই হয় কৃষকপর্যায়ে থেকে। প্রথম পর্যায়ে মৌসুম শুরু অথবা যে কোনো সময় কৃষক তার পাট ফরিয়া এবং ব্যাপারির নিকট ঘর থেকে অথবা বাড়ির কাছাকাছি কোনো হাটে বিক্রি করে। অনেক সময় এর ব্যত্যয়ও দেখা যায়। কোনো কোনো বড় উৎপাদনকারী কৃষক তার পাট সরাসরি কাঁচা বেলার এবং পাটকল প্রতিনিধির কাছেও বিক্রি করে। তবে সাধারণত কোনো কৃষককে সচরাচর পাকা বেলার বা বেল করে সরাসরি পাট বিক্রি করতে দেখা যায় না। ফরিয়ারা সাধারণত অল্প অল্প পরিমাণ পাট কৃষকের ঘরে ঘরে অথবা বাজার থেকে ক্রয় করে। তাদের কোনো ব্যবসায়িক লাইসেন্স থাকে না।

ফরিয়াদের কোনো পরিমিত গুদাম না থাকায় তারা তাদের ক্রয়কৃত পাট খুবই দ্রুততার সাথে অন্য ব্যাপারির কাছে বিক্রি করে দেয়। তার যদি কোনো সমস্যা হয় তখন এরা কিছুদিনের জন্য তাদের অস্থায়ী গুদামে বা ঘরেই ক্রয়কৃত পাট গুদামজাত করে। এদের জন্য দুই ধরনের বিপদ থাকে— একটা কাঁচা পাটের অপরটা বাজারে মূল্য কম-বেশির। পাটের সমস্যা হল আগুন, নষ্ট হওয়া বা ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি অন্যদিকে বাজারের সমস্যা হল মূল্য কমে যাওয়া। তবে কাঁচা বা পাকা বেল তৈরিকারকদের এই ভয় থাকে না কারণ তারা ব্যবসায়িক লাইসেন্স থাকায় তাদের ক্রয় করা পাটের ইনস্যুরেন্স করা থাকে।

ব্যাপারি হল পাটের আসল ব্যবসায়ী। এদের ব্যবসায়িক লাইসেন্স আছে, সেল বাজারে অফিস, গুদাম সবই থাকে। এরা বড় পরিমাণের আঁশ নিয়ে ব্যবসা করে। এরা কাঁচা পাট বাছাই ছাড়া কৃষক ও ফরিয়াদের নিকট থেকে ক্রয় করে থাকে। পরে এরা কাঁচা, পাকা বেলার এবং পাটকলে তাদের পাট বিক্রি করে। বেশিরভাগ বেপারি আড়তদারদের মাধ্যমে এবং কিছু ব্যাপারি সরাসরি বেলারদের কাছে তাদের ক্রয়কৃত পাট বিক্রি করে।

কাঁচা বেলার কৃষক, ফরিয়া এবং ব্যাপারিদের থেকে পাট ক্রয় করে এবং পরে তা বেল আকারে প্রক্রিয়াজাত করে। আবার এদের মধ্যে অনেকে একে অপরের কাঁচা বেল প্রক্রিয়া করা বেল ক্রয় করে পরের ধাপে বেশি মুনাফার জন্য। এদের এই বাজারকে মধ্যম স্তরের বাজার বলে। এই স্তরে বাজারে কাঁচা পাটের ব্যবসায়িক মান নির্ণয় হয় গ্রেড আকারে বাছাই-এর মাধ্যমে এই পর্যায়ে ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক ভিত্তি আছে। স্থায়ী কাঠামো এবং কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগকৃত থাকে। এখানে কাঁচা বেলারদের প্রত্যেকের গুদাম থাকতে হয়। এই পর্যায়ে থেকে কাঁচা বেল করা পাট পরবর্তীতে পাকা বেলার অথবা রপ্তানিকারক এবং পাটকলে দালালদের মাধ্যমে বিক্রি করে থাকে।

পাট আঁশের বাজারে আড়তদারদের একটা বড় ভূমিকা থাকে। এদের উপজেলা ও টারমিনাল বাজার পর্যায়ে অফিস/ব্যবসায়িক স্থায়ী কাঠামো থাকে। এরা হল পূর্ব নির্ধারিত কমিশন এজেন্ট। আঁশ বাজারব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় বা চ্যানেলে আড়তদাররা একটা উচ্চ মাত্রার ব্যবসায়ী তবে সংখ্যায় খুবই কম। পাটের ছোট ব্যবসায়ীদের হাত থেকে পাট আঁশ বেল আকারে এরাই সর্বশেষ বাজার পর্যায়ে পৌঁছায় একটা নির্ধারিত কমিশন রাখার মাধ্যমে। এরা অনেক সময় আর্থিক সংস্থান তৈরিকারক এবং আঁশ গুদামজাত করার সুবিধাদি সরবরাহ করে থাকে। এরাই পাটের বাজার ব্যবস্থাপনায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মধ্যস্থতা তৈরি করে এবং নিজের একটা নির্ধারিত কমিশন রাখে। আড়তদারদের কমিশন সাধারণত ব্যাপারিদের কাছে থেকে বেশি হয় কিন্তু বেলার বা রপ্তানিকারকদের নিকট পাট বিক্রিতে এদের কমিশন কম হয়ে থাকে। অনেক তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় দেখা গেছে আড়তদাররা ফরিয়া বা ব্যাপারিদের চেয়ে অনেকটা বেশি পরিমাণ পাট আঁশ কৃষকদের নিকট থেকে ক্রয় করে।

পাকা বেলাররা সাধারণত ফরিয়া এবং কাঁচা বেলার থেকে খোলা পাট বা কাঁচা বেল করা পাট ক্রয় করে থাকে। তারা অনেক সময় আড়তদারদের মধ্যস্থতায় ব্যাপারিদের নিকট থেকে পাট ক্রয় করে। এখানে খোলা পাট বা অবাছাইকৃত পাট বাছাই সম্পন্ন করে প্রেস যন্ত্রের সাহায্যে মানসম্মতভাবে এবং গ্রেড মোতাবেক পাট বেলের আকার দেওয়া হয়। এই বেল আকারে রপ্তানি সম্পন্ন হয়ে থাকে যা পৃথিবীর সব দেশের জন্য মান একই। বড় পাকা বেলাররা অনেক সময় অন্য পাকা বেলারদের থেকেও পাকা বেল ক্রয় করে দালালদের মাধ্যমে কম দামে এবং তা রপ্তানি করে বেশি মূল্যে। পাকা বেলার এবং রপ্তানিকারক একই প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে। এরা নিচের ধাপ থেকে পাট ক্রয় করে আবার দেশে পাটকলগুলোতে সরবরাহ করে এবং সাথে সাথে রপ্তানিও করে। পাটের বাজারে দেশি—বিদেশি ব্রোকার/দালালদের সাথে এই পাকা বেলার/রপ্তানিকারকদের সমঝোতা হয় এবং

পাটের দেশি-বিদেশি বাজারব্যবস্থাপনা সচল থাকে। তবে একটা কথা বলা যায় যে সব রপ্তানিকারক পাকা বেলার কিন্তু সব পাকা বেলার রপ্তানিকারকের ভূমিকায় থাকে না।

বাজারব্যবস্থাপনা চ্যানেল উন্নয়নে করণীয়

এককথায় বলা যায় বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ পাটের বাজারব্যবস্থাপনা পন্থার সাথে জড়িত। এমন বলা যেতেই পারে যে বর্তমান বাজার পদ্ধতি পাটের আঁশের জন্য খুব কৃষক-সহায়ক নয়। গত ২০০২-২০০৩ সালের এক পাটের বাজার সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বেশিরভাগ উৎপাদিত পাট (৪২%) কৃষকরা পাট কাটার পর শুকানোর সাথে সাথে বিক্রি করে দেয় এবং শতকরা ৪০ ভাগ আঁশ তারা পরে বিক্রির জন্য রেখে দেয় এবং ক্রয় দিক বিবেচনায় শতকরা ৯৩ ভাগ পাট আড়তদাররা ক্রয় করে এবং ফরিয়া এবং ব্যাপারিরা ক্রয় করে এর চেয়ে কম পরিমাণ ৮৭%। এই সমীক্ষাটি করা হয়েছিল রংপুর, ফরিদপুর ও যশোর জেলার বিভিন্ন পাটের বাজারে। পাটের বাজারখরচ ও পাটের মূল্যেও ভিন্নতা পাওয়া যায় এলাকা ও ক্রেতাদের ভিন্নতার উপর। তবে একটা বিষয় এই সমীক্ষা স্পষ্ট হয় যে কৃষকেরা আঁশের মান অনুযায়ী মূল্য পায় না এবং এই মানটি নির্ধারিত হয় মাধ্যমিক বাজার ব্যবস্থার সময়। তাছাড়া মূল্য নির্ধারণে কৃষকের কোনো ভূমিকা থাকে না। মূল্য নির্ধারণে ভূমিকা না থাকায় কৃষকরা সাধারণত আঁশের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে এই অংশে অনেক কাজ করার প্রয়োজন। ছোট ছোট এলাকা কেন্দ্রিকতা থেকে পাটের বাজারব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া দেশের আরো বৃহৎ পরিসরে আনা জরুরি। অসম বাজারব্যবস্থা পদ্ধতিকে বাধা দিয়ে উন্নত বাজারব্যবস্থাপনা চ্যানেলের জন্য সুবিধা তৈরি করে পাটের প্রান্তিক কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কৃষকপর্যায়ে পাটের মান অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা জরুরি। পাটের মূল্য নির্ধারণে কৃষকের ভূমিকা থাকতে হবে। প্রাথমিক বাজারব্যবস্থাপনায় মূল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যা সাধারণত মাধ্যমিক পর্যায়ে ঘটে থাকে। সর্বোপরি পাটের বাজারব্যবস্থাপনা চ্যানেলকে উন্নত ও কৃষকবান্ধব করতে হলে জরুরি ভিত্তিতে পরিবহনের অপ্রাপ্যতা ও অব্যবস্থাপনা এবং উচ্চ ভাড়া পাট আঁশ বাজারব্যবস্থাপনা পন্থার সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী বা ক্রেতা-বিক্রেতাদের জন্য একটা বড় সমস্যা, যার প্রতি আশু দৃষ্টি প্রদান প্রয়োজন। (বাজারব্যবস্থাপনা পন্থা বা চ্যানেল বিষয়ক একটি গবেষণা প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত)

তিন.

বাংলাদেশে উৎপাদিত অর্থকরী ফসলগুলোর মধ্যে পাটের স্থান শীর্ষে। পাটের ব্যবহারিক উপযোগিতা, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করে পাটকে ‘সোনালি আঁশ’ বলে অভিহিত করা হয়। এক সময় বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পাট রফতানি হত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, অর্জিত হত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। বর্তমান সরকার দেশের পরিবেশ বিপর্যয় ও জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে দেশে পলিথিন উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটজাত দ্রব্য ব্যবহারে দেশবাসীকে উৎসাহিত করায় পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। এ দেশে মূলত তোষা এবং দেশি এই দুই ধরনের পাট চাষ করা হয়ে থাকে। পাট, কেনাফ ও এ জাতীয় অন্যান্য আঁশ ফসল সংক্ষেপে জেএএফ (JAF: Jute and Allied Fibres) নামে পরিচিত। আট থেকে দশ মিলিয়ন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাট ও এ জাতীয় আঁশ ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ ছাড়াও হাজার হাজার লোক পাট গবেষণা, প্রক্রিয়াকরণ, পাটপণ্য উৎপাদন, পরিবহন ও ব্যবসার সাথে জড়িত। দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ৫-৬% আসে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশে পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের একমাত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান। মূলত ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) আওতায় ঢাকায় জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে পাটের গবেষণা শুরু হয়। ১৯৫১ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) স্থলে পাকিস্তান সেন্ট্রাল জুট কমিটি (PCJC) গঠিত হয় যার সদর দপ্তর ছিল ঢাকায়। ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সেন্ট্রাল জুট কমিটি-এর অধীনে পাট গবেষণাগার স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে অ্যাক্টের মাধ্যমে (সংশোধিত হয় ১৯৯৬ সালে) প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। বিজেআরআই তিনটি গবেষণা পরিদপ্তর যথা (১) পাটের কৃষি গবেষণা (২) পাটের কারিগরি গবেষণা এবং (৩) পাট ও তুলার মিশ্রণে পণ্য উৎপাদন গবেষণা পরিদপ্তর নিয়ে কাজ শুরু করে। চাহিদা অনুযায়ী উন্নতমানের পাটবীজের অভাব দীর্ঘদিনের যা অধিক পরিমাণে উন্নত মানের পাট উৎপাদনের অন্যতম অন্তরায় হিসেবে কাজ করে আসছে। এ সমস্যা নিরসনে এফএও/এডিবি (FAO/ADB)- এর সুপারিশক্রমে একনেক (ECNEC)- এর অনুমোদনে উচ্চ ফলনশীল পাটবীজ উৎপাদন ও বিতরণের লক্ষ্যে বিজেআরআইতে একটি নতুন ‘পাটবীজ বিভাগ’ স্থাপিত হয় ১৯৭৬ সালে। সে সময় থেকেই বিজেআরআই মানসম্মত পাটবীজ উৎপাদন ও সরবরাহে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। কিন্তু গত

১৯৮৮ সালে তৎকালীন সরকারের নির্বাহী আদেশ বলে ‘পাটবীজ বিভাগ’কে বিএডিসিতে স্থানান্তর করা হয়।

কৃষি পরিদপ্তরে পাটের কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা, কারিগরি পরিদপ্তরে শিল্পে পাট ও পাট জাতীয় তন্তুর বহুমুখী ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা এবং জেটিপিডিসি নামে পরিদপ্তর পাট আঁশের সাথে তুলা, রেশম, পশম, পলিয়েস্টার ইত্যাদি সংমিশ্রণে বহুমুখী প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের গবেষণা হয়। এ ছাড়াও কৃষকদের সময়-উপযোগী চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবেক পাটের অঞ্চলভিত্তিক কৃষি গবেষণার জন্য মানিকগঞ্জে পাটের কৃষি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং রংপুর, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ ও চান্দিনা চারটি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র এবং তারাবো, মনিরামপুর, পটুয়াখালী ও দিনাজপুর চারটি উপকেন্দ্র রয়েছে। উল্লেখ্য যে, পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের দেশি-বিদেশি বীজ সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য জিন ব্যাংকেটি বিজেআরআইতে ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিজেআরআই এর কারিগরি গবেষণাকে সহায়তা ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বিগত ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ‘জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্টস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি)’ নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে। ফলে পাটের কারিগরি গবেষণার সামর্থ্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষি গবেষণায় প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য

- পাট ও সমশ্রেণির আঁশ ফসলের কৃষি ও অর্থনৈতিক গবেষণা, ব্যবস্থাপনা এবং আঁশজাত ফসল উৎপাদন এবং গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।
- উন্নতমানের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতাসহ পাটবীজ উৎপাদন, পরিচালনা, পরীক্ষণ, সরবরাহ এবং সীমিত আকারে উন্নত মানের পাটবীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও নির্বাচিত চাষি, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এজেন্সির নিকট বিতরণ।
- মৌলিকুলার বায়োলজি ও বায়োটেকনোলজি কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নত মানের পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা পরিচালনা এবং পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের সর্বপ্রকার জার্মপ্লাজম জিন ব্যাংকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- পাট ও সমশ্রেণির আঁশ ফসল ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র এবং খামার স্থাপন।

- পাট ও সমশ্রেণির আঁশ ফসল চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে পাটের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং পাটচাষীদের প্রশিক্ষণ এবং পাট সংক্রান্ত কৃষি গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্পর্কে পাট সংশ্লিষ্ট জনশক্তির প্রশিক্ষণের আয়োজন করা ।

পাটের কৃষি গবেষণায় অর্জিত সাফল্য

বর্ধিত জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে অধিক পরিমাণ উর্বর জমি খাদ্য-শস্য চাষের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, পাটের উর্বর আবাদি জমির পরিমাণ কম এবং ক্রমাগত প্রান্তিক ও অনূর্বর জমিতে পাট আবাদ স্থানান্তরিত হলেও জাতীয় গড় উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে । সময়োপযোগী ও প্রচলিত শস্যক্রমের সাথে মানানসই তোষা পাট জাত উদ্ভাবন করার ফলে দেশে দেশি, তোষা পাট ও অন্যান্য আঁশ ফসলের চাষের হার যথাক্রমে ৭০ঃ২৫ঃ০৫-এর স্থলে বর্তমানে প্রায় ১০ঃ৮৫ঃ০৫ অনুপাতে এসে দাঁড়িয়েছে । পাটের কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

স্ব-পরাগায়িত ফসল হওয়ার কারণে পাটের প্রাকৃতিক জেনেটিক বৈচিত্র্য খুবই সংকীর্ণ (Narrow), ফলে সনাতন ব্রিডিং পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল নতুন জাত উদ্ভাবন কষ্টসাধ্য এবং ক্রমেই তা দুঃসাধ্যে পরিণত হচ্ছে । বিজেআরআই প্রতিষ্ঠান পর থেকে মোট ৪৪টি পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের জাত উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করা হয়েছে । তন্মধ্যে ২০টি (৯টি দেশি পাট, ৬টি তোষা পাট, ৩টি কেনাফ ও ২টি মেস্তা) উন্নত জাত কৃষকপর্যায়ে ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করা হচ্ছে । দেশে পাটআবাদি জমির পরিমাণ কমে যাওয়ায় এবং পাটচাষ ক্রমাগত অনূর্বর ও প্রান্তিক জমিতে স্থানান্তরিত হলেও পাটের জাতীয় গড় উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে । বিজেআরআই বিজ্ঞানীগণ সম্প্রতিকালে আরো দুইটি দেশি ও তোষা পাটের জাত অবমুক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করেছে যার প্রথমটি হল বিজেআরআই দেশি পাট-৮ যা মৃদু লবণাক্ত সহনশীল (০৪ থেকে ০৯ ডিএস/মিটার), আগাম পরিপক্ব (দ্রুতবর্ধনশীল), মোজাইক রোগ সহিষ্ণু ও উচ্চফলনশীল । এর কাণ্ড হালকা লাল, মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের শেষপর্যন্ত বপন করা যায় এবং আঁশের মান খুবই ভাল । এ জাতটি লবণ-সহিষ্ণু হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকায় সফলভাবে চাষ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় । খাদ্যশস্য উৎপাদনক্ষম জমির সাথে প্রতিযোগিতা কমিয়ে নতুন নতুন এলাকায় পাটকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে । অন্যটি হল বিজেআরআই তোষা পাট-৬ । এ জাতটিও আগাম পরিপক্ব (দ্রুতবর্ধনশীল) ও উচ্চফলনশীল । আঁশের মান ভালো এবং রং উজ্জ্বল সোনালি । এ জাতটি নাবীতে বা দেরিতে বপন করেও মাত্র ১০০-১১০ দিন বয়সে কাটা যাবে । এটি আগাগোড়া

প্রায় একই রকম এবং লম্বায় ৪-৫ মিটার হয়ে থাকে। তা ছাড়া জাত দুটিতে রোগ-বালাই কম, সে কারণে চাষিদের খরচও কম হবে। প্রতি হেক্টর জমিতে এ দুটি জাতের ফলন প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন টন অর্থাৎ বিঘাতে প্রায় সাড়ে ১২ মন। দেশে বর্তমানে পাটের জাতীয় গড় ফলন ২.০১ টন/হেক্টর, পক্ষান্তরে কৃষক পর্যায়ে বিজেআরআই উদ্ভাবিত জাতসমূহের গড় ফলন ৩.০ টন/হেক্টর। যদিও বিজেআরআই উদ্ভাবিত জাতসমূহের সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ৪.৫০-৫.৫০ টন/হেক্টর। অর্থাৎ সারাদেশে বিজেআরআই-এর জাতসমূহের আবাদ সম্প্রসারণ করা গেলে এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাষ সম্ভব হলে দেশে পাটের মোট উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে। সেইসাথে পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধির যে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রতিটি জাতের কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা (বীজ বপন ও কর্তনের সঠিক সময় নির্ধারণ, বীজের হার নির্ধারণ, আগাছা দমন, গাছ পাতলাকরণ ইত্যাদি), সারের মাত্রা, বালাই ব্যবস্থাপনা এবং পাট আঁশ পচনের সঠিক সময় নিরূপণ ইত্যাদি প্রযুক্তি সংক্রান্ত নির্দেশনাও প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতি হেক্টরে নির্ধারিত সময়ে অধিক, উন্নতমানের পাট এবং এ জাতীয় ফসলের আঁশ উৎপাদন, প্রান্তিক এবং অপ্রচলিত (লবণাক্ত, পাহাড়ি, চরাঞ্চল) জমিতে আবাদোপযোগী উন্নত তোষা, দেশি, কেনাফ ও মেস্তা জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে দেশে আবাদি জমির পরিমাণ কম এবং ক্রমাগত প্রান্তিক, নিকৃষ্ট জমিতে পাট আবাদ স্থানান্তারিত হলেও জাতীয় গড় উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার প্রথম ও প্রধান বিষয় হল জমি নির্বাচন ও কর্ষণ। যেহেতু পাটের বীজ খুব ছোট আকৃতির তাই পাটচাষের জমি মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি নির্বাচন করতে হয় ও খুব মিহি করে কর্ষণের প্রয়োজন হয়। পাট ফসলের জন্য বপন সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি উদ্ভাবিত উন্নত জাতের জন্য প্রকৃত বপন সময় নির্ধারিত করা হয়েছে। এর ব্যত্যয় হলে পাট ফসলে আগাম ফুল আসার সম্ভাবনা থাকে যার ফলে ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া সময়মত পাট কাটার উপরও অনেককিছু নির্ভর করে। দেরিতে পাট কাটলে ফলন বেশি হলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাই তোষার জন্য ১০০-১১০ দিন ও দেশির জন্য ১১০-১২০ দিন কর্তনের প্রকৃত সময় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আগাছা দূর করা ও গাছ পাতলা করার জন্য অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী পদ্ধতি দুটি নিড়ানি (২০ ও ৩০ দিনে) এবং একটি আঁচড়া ৪৫ দিনে তার সাথে ৬০-৭০ দিনে একটি টানা বাছ ও ৮০-৯০ দিনে একটি কাটা বাছের ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত ফলন পাওয়ার জন্য সঠিক মাত্রায় ও

সময়মতো সার প্রয়োগের গুরুত্ব অত্যধিক। সে হিসেবে দেশি তোষার জাতওয়ারী সারের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ক্রমাগত জমির জৈব উপাদানের ঘাটতি, জমির উর্বরতা শক্তির ক্রমহ্রাসকে মোকাবিলা করার জন্য প্রচলিত মাত্রায় সার ব্যবহারের পরিবর্তে জাত ও জমিভিত্তিক সুনির্দিষ্ট সারের মাত্রা নির্ধারিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

একাদিক্রমে এক ধরনের ফসল আবাদ করে জমির পুষ্টির ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করা এবং একই ধরনের রোগবলাইয়ের প্রাচুর্য দমন করার জন্য ফসল ক্রমের উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। ফসল নিবিড়তা বৃদ্ধি করে প্রতি হেক্টর জমিতে অধিক ফসল ফলানো ও মুনাফা অর্জনের জন্য কৃষকপর্যায়ে পাটভিত্তিক শস্য পর্যায়ক্রম উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণার মাধ্যমে বেশ কয়েকটি লাভজনক টেকসই পাটভিত্তিক শস্যক্রম উদ্ভাবন করেছে। যেমন: পাট-মসুর+সরিষা, পাট-রোপা আমন-গম, পাট-রোপা আমন-ছোলা, পাট-রোপা আমন-পেঁয়াজ, পাট-রোপা আমন-সবজি (বেগুন/মিষ্টি কুমড়া), পাট-রোপা আমন-মুগ/কলাই/ছোলা, পাট-রোপা আমন-আলু, পাট-রোপা আমন-ভুট্টা, পাট-রোপা আমন-আলু+ডাটা, পাট-রোপা আমন-ছোলা+গম, পাট-রোপা আমন-আলু+তামাক, পাট-রোপা আমন-খেসারি, পাট-রোপা আমন-তামাক, পাট-মুলা-গম+মসুর, পাট-মুলা-আলু+লাল শাক+মিষ্টি কুমড়া। উল্লেখিত পাটভিত্তিক শস্যবিন্যাসে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফসলসহ সাথী ও মিশ্র ফসলের চাষ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে শস্যের নিবিড়তা, প্রবৃদ্ধি ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত শস্য পর্যায়গুলোতে শস্যের উৎপাদনখরচ বেশি হলেও খরচের তুলনায় লাভও অনেক বেশি হয়।

বাংলাদেশ পাট পচনের সময় প্রায় সকল পাট আবাদি এলাকায় পানির তীব্র অভাব দেখা দেয়। ফলে কৃষক উন্নত জাতের পাট উৎপাদন করলেও পচন পানির অভাবে নিম্নমানের পাট উৎপাদিত ও বাজারজাত হচ্ছে। এ অবস্থা নিরসনকল্পে স্থানোপযোগী এবং স্বল্প পানিতে পচানোর জন্য উন্নত পাট পচন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। সরাসরি পাটগাছ পচানো, পাটের ছাল পৃথক করে পচানো এবং একান্তই পানি না থাকলে বা উৎপাদন অধিক হলে পৃথককৃত পাটের কাঁচা ছাল শুকিয়ে সংরক্ষণ এবং পরবর্তী সময়ে তা পচিয়ে উন্নত আঁশ উৎপাদন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা হয়েছে। পাটের পোকামাকড় দমনে বিদেশ- নির্ভরতা কমিয়ে পরিবেশবান্ধব উদ্ভিজ্জ বা দেশজ প্রাকৃতিক কীটনাশক ব্যবহার কৌশল এবং কীটনাশক উদ্ভাবন করা হয়েছে। কাঁচা অবস্থায় পাটগাছ থেকে ছাল পৃথকীকরণের জন্য বাঁশ অথবা লোহার তৈরি এক প্রকার সেমি মেকানিক্যাল রিবনার উদ্ভাবন করা হয়েছে। রিবনারের সাহায্যে প্রথমে পাটগাছ থেকে কাঁচা অবস্থায় ছাল পৃথক করে

অল্প পানিতে পচানোর মাধ্যমে উন্নতমানের আঁশ উৎপাদন করা যায়। যেসব এলাকায় পাট পচানোর পানির স্বল্পতা আছে সেসব এলাকায় পাট পচানোর জন্য রিবন রেটিং পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী। ছোট ছোট চাড়ির মধ্যেও কাঁচা ছাল পচানো যায় বা পলিথিনের ছোট চৌবাচ্চা তৈরি করেও পাট পচানো যায়।

ভেষজ উপাদান দ্বারা বীজ শোধন ও সাদা মাকড় দমনের জন্য (ক) কাঁচা রসুন বাটা ১২.৫০% অর্থাৎ ১২৫ গ্রাম রসুনের পেস্ট ১ কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে পাটবীজ শোধন ও চারার মড়ক রোগ দমন হয় এবং (খ) নিমপাতার রসের ১ঃ২০ অনুপাতে পানির দ্রবণ/মিশ্রণ ব্যবহার করে পাটের সাদা মাকড় দমন করা যায়।

পাটবীজের জন্য পরনির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে স্বল্পাকারে কৃষক পর্যায়ে পাটবীজ উৎপাদন পদ্ধতি ও নাবী পাটবীজ উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। দেশে পাটবীজের অভাব দূরীকরণে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বীজ উৎপাদনের জন্য “নাবী পাটবীজ উৎপাদন” প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। স্বাভাবিক নিয়মে মার্চ-এপ্রিল মাসে পাটবীজ বপন করে ফসলের একটি অংশ বীজ উৎপাদনের জন্য রেখে দেয়া হয়। এ পদ্ধতিতে বীজ উৎপাদনে প্রায় ১০ মাস সময় লাগে। এত দীর্ঘ সময়ে গাছ মাঠে থাকার ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পোকামাকড়ের আক্রমণ ইত্যাদি বাধা অতিক্রম করে পাটগাছ থেকে যে বীজ পাওয়া যায় তার গুণগত মান খারাপ হয় এবং পরিমাণে অনেক কম হয়। ফলে বীজ উৎপাদনের এ প্রচলিত পন্থা অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক। বিজেআরআই উদ্ভাবিত নাবী পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতিতে মার্চ-এপ্রিলের পরিবর্তে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বীজ বপন করে ডিসেম্বরের মধ্যে বীজ সংগ্রহ করা যায়। এ পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টরে প্রায় ৬০০-১০০০ কেজি উন্নত মানের পাটবীজ উৎপাদিত হয়। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে বীজ ছিটিয়ে বোনা ও চারা রোপণ করার পদ্ধতি ছাড়াও গাছের ডগা কেটে রোপন করা যায়। এভাবে বীজ উৎপাদন পদ্ধতি কৃষকপর্যায়ে লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে এবং কৃষকরা পাটবীজকে একটি ফসল হিসেবে গণ্য করছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পাট, বিশেষ করে কেনাফ ও মেস্তা জার্মপ্লাজম সংগ্রহ এবং তা মূল্যায়ন করে উত্তরোত্তর পাট এবং এ জাতীয় আঁশ ফসল উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলছে। এর ফলে প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও জাতীয় গড় পাট আঁশ উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের দেশি-বিদেশি বীজ সংরক্ষণের জন্য বিশ্বের একমাত্র জিন ব্যাংকে বর্তমানে পাট, কেনাফ ও মেস্তার প্রায় ৫৯৭৮টি জার্মপ্লাজম সংরক্ষিত আছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ জার্মপ্লাজমের ক্যারেক্টারাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে। সংরক্ষিত জার্মপ্লাজমসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ

থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত জামপ্লাজমসমূহ উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাটের জীবনরহস্য আবিষ্কার এবং পাটের কাণ্ডপচা রোগ প্রতিরোধী পাটজাত উদ্ভাবনের নিমিত্তে পাটসহ বিশ্বের পাঁচ শতাধিক উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকারক ছত্রাক *Macrophomina phaseolina*- এর জীবনরহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত এ তথ্যকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে কাণ্ডপচা রোগ-প্রতিরোধী পাটজাত উদ্ভাবনের গবেষণা এগিয়ে চলছে। এছাড়া গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে কৃষিপ্রযুক্তির নানা বিষয়ে ৫০টিরও বেশি বই ও লিফলেট প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে About Jute Seed Research, পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, Handbook on Agricultural Technologies of Jute, Kenaf and Mesta crops, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক ও উপ-কেন্দ্রসমূহের পরিচিতি (গবেষণা কার্যক্রম ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ), পাট, Jute Seed Technology ইত্যাদি অন্যতম।

বর্তমানে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম

পাটচাষের উন্নয়ন ও পাট আঁশের বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে স্বল্প খরচে অধিক উৎপাদনসহ লাভজনক ভাবে উচ্চ ফলনশীল পাট উৎপাদন ও উন্নতমানের পাট আঁশ উৎপাদনের সমন্বয়যোগী ও অঞ্চলভিত্তিক আধুনিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তি কৃষকের মাঠে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়।

- সাধারণ প্রজনন পদ্ধতি, মৌলিকুলার-বায়োলজি এবং বায়োটেকনোলজি কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে পাট, কেনাফ ও মেস্তার উন্নতমানের পাটের জাত, কৃষিতাত্ত্বিক ও সার ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি, পাটভিত্তিক শস্যপর্যায় ও শস্যক্রম ইত্যাদি উদ্ভাবন, পাটের রোগ ও পোকামাকড় দমনে প্রাকৃতিক কীটনাশক ব্যবহার- কৌশল এবং কীটনাশক উদ্ভাবন, স্থানোপযোগী এবং স্বল্প পানিতে পচানোর জন্য উন্নত পাট পচন পদ্ধতি উদ্ভাবন, রিবনারের সাহায্যে পাটগাছ থেকে কাঁচা অবস্থায় ছাল পৃথক করে অল্প পানিতে পচানোর উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন, জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত পাট, কেনাফ ও মেস্তার জামপ্লাজমসমূহের ক্যারেক্টারাইজেশন সম্পন্ন করা ইত্যাদি বিষয়ের উপর কৃষিক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত গবেষণা কার্যক্রম বিজেআরআই-এর ঢাকা কেন্দ্রীয় অফিসের বিভিন্ন গবেষণাগারে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত গবেষণা খামারসমূহে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।
- উন্নতমানের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতাসহ প্রজনন পাটবীজ উৎপাদন, পরিচালন, পরীক্ষণ, সরবরাহ এবং সীমিত আকারে উন্নতমানের পাটবীজ

(টিএলএস) উৎপাদন, সংগ্রহ ও নির্বাচিত চাষি, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং অনুমোদিত এজেন্সির নিকট বিতরণ করা হচ্ছে।

- কৃষি পরিদপ্তরের গবেষণা তথ্যভিত্তিক বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন, বৈজ্ঞানিক জার্নাল, বই, নিউজ লেটার, মনোগ্রাফ, বুলেটিন, লিফলেট এবং বিভিন্ন তথ্যসমূহ সময়মতো প্রকাশ করা হচ্ছে।
- পাট ও সমশ্রেণির আঁশ ফসলের চাষের উন্নত প্রযুক্তি/পদ্ধতি সম্পর্কে সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মাঠকর্মী এবং চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

পাটের কৃষি গবেষণার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যচাহিদা পূরণের জন্য পাটের জমি খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য ছেড়ে দিতে হচ্ছে এবং পাটচাষ অনুর্বর ও প্রান্তিক জমিতে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এ অবস্থায় দেশে পাট উৎপাদন স্থিতিশীল রাখতে সমুদ্র উপকূলবর্তী লবণাক্ত অঞ্চলে পাট চাষ সম্প্রসারণ এবং লবণাক্ততা- সহিষ্ণু পাটজাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া থানায় একটি পাট গবেষণা

উপ-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে অথচ কোনো জনবল সংস্থান করা হয়নি। পণ্যভিত্তিক (Product Oriented) ও কাগজের মণ্ড তৈরির জন্য সারা বছর চাষ উপযোগী পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের জাত উদ্ভাবন করা। বিভিন্ন বায়োটিক (রোগজীবাণু ও পোকামাকড়) এবং এবায়োটিক (স্বল্প তাপমাত্রা, খরা ইত্যাদি) প্রতিকূলতা সহনশীল পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা। অনুর্বর জমি ব্যবহারের জন্য কাঁটাবিহীন মসৃণ কাণ্ডবিশিষ্ট কেনাফ ও মেস্তার জাত উদ্ভাবন করা। জীবপ্রযুক্তি (বায়োটেকনোলজি) ব্যবহারের মাধ্যমে রোগজীবাণু ও পোকামাকড় সহনশীল উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের জাত উদ্ভাবন করা। গবেষণায় এবং কৃষকের মাঠে ফলনের পার্থক্য হ্রাস করে পাটের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা। পাটের উৎপাদনখরচ হ্রাস এবং স্থানোপযোগী (লোকেশন স্পেসিফিক) পাট পচন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।

জাতীয় বীজ কর্মসূচির সহায়তার জন্য সরকারি ও বেসরকারি বীজ উৎপাদন ও বিপণন প্রতিষ্ঠানকে চাহিদা অনুযায়ী প্রজনন বীজ সরবরাহ করা। পাটবীজের অভাব দূরীকরণে পর্যাপ্ত পরিমাণ পাটের মান ঘোষিত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করা। বর্তমানে ফরিদপুর, যশোহর ছাড়াও বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে ব্যাপক পাটের আবাদ হয়। কিন্তু উক্ত রাজশাহী অঞ্চলের পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের দেখাশোনা করার কোনো কেন্দ্র সেখানে নেই। অতএব উক্ত এলাকায় বিজেআরআই-এর একটি নতুন গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা। জমির

পরিমাণ না বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ফলন প্রাপ্তির জন্য দেশে পাট আঁশ ও বীজ উৎপাদনের সর্বাধিক উপযোগী এলাকা/জমি নির্বাচন করে, তাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণের যোগান ও ব্যবহার নিশ্চিত করা। প্রজনন ও মান ঘোষিত পাটবীজের চাহদা মেটাতে বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বীজ উৎপাদনের বিকল্প আধুনিক প্রযুক্তি কৃষকপর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা। যাতে কৃষক তার নিজের বীজ নিজে উৎপাদন করে সঠিক সময়ে ব্যবহার করতে পারে। মাঠপর্যায়ে গবেষণা ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ জোরদার করে পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের আধুনিক প্রযুক্তিসমূহের সফল প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। উৎপাদিত পাট কৃষকপর্যায়ে স্বল্পকালীন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। যাতে তারা ন্যায্য দাম পান। উন্নত মানের পাটবীজ উৎপাদন ও বিতরণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ-এর পাশাপাশি একটি বীজ বিভাগ নতুন ভাবে স্থাপন করা জরুরি প্রয়োজন।

বিজেআরআই-এর প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক/উপ-কেন্দ্রসমূহের গবেষণার জমিতে অন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভৌত কাঠামো (রাস্তা, ভবন ইত্যাদি) নির্মাণ অবিলম্বে বন্ধ করে গবেষণার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা। নতুন উপ-কেন্দ্র পটুয়াখালী-এর জন্য বিজ্ঞানী সহ ১১ জনের জনবল সৃষ্টি করা। বিজেআরআই-এর পাটের কৃষি পরীক্ষা স্টেশন, মানিকগঞ্জের প্রধানের পদ সিএসও, সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের প্রধানের পদ পিএসও এবং উপ-কেন্দ্র সমূহের প্রধানের পদ এসএসও করা জরুরি প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম আঁশ বর্জনের ফলে পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক আঁশ পাটের চাহিদা দেশে ও বিশ্ববাজারে বর্তমানে বাড়ছে। নিরন্তর উন্নত গবেষণার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বর্তমানে দক্ষ জনশক্তিসহ আধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যা অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পূর্বের ন্যায় সাহায্য করতে সক্ষম হবে।

পাটের কৃষি গবেষণা উন্নয়নে সুপারিশ

বর্তমানে বিশ্বে পরিবেশ-সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকরা পাটের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে। ফলে কৃষক আবার পাটচাষে উৎসাহিত হচ্ছে এবং আবাদি জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি না পেলেও পাটচাষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করায় একক আয়তনে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সার্বিকভাবে পাটের উন্নয়ন শুধুমাত্র উন্নতমানের অধিক পরিমাণ আঁশ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে না। কারণ পাট একটি শিল্পজাত পণ্য হওয়ায় এর উৎপাদন থেকে শুরু করে শিল্পে ব্যবহার, পণ্য উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানি ইত্যাদি কার্যক্রমে বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/মন্ত্রণালয় জড়িত। সুতরাং পাটের

সার্বিক উন্নয়নের জন্য আন্তঃপ্রতিষ্ঠান ও আন্তঃমন্ত্রণালয়ের জোরালো মধ্যে সমন্বয় অপরিহার্য। এমতাবস্থায় উল্লেখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের সাথে সাথে সরকারিভাবে বাজার ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নিতে পারলে পাট গবেষণা তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।

শেষ কথা

সত্তর বা আশির দশকের তুলনায় বর্তমানে পাট আবাদে জমি কমেছে। তখন বাংলাদেশে দেশি পাট চাষ হত, কিন্তু বর্তমানে তোষা পাটের আবাদে মাত্রা অধিক। দেশি তুলনায় তোষা আগাম বপনযোগ্য এবং অধিক ফলনক্ষম। তাই উন্নত জাত, উন্নত পরিচর্যা ও আবাদ পদ্ধতি এবং সর্বোপরি পৃথিবীতে প্রাকৃতিক আঁশের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় পাটের প্রতি কৃষকের যত্ন ইত্যাদি ধণাত্মক বিষয়গুলো পাটের পক্ষে থাকায় পূর্বের তুলনায় জমি কমে গেলেও উচ্চ ফলনের উর্ধ্বগতি পাটের উৎপাদনকে আবার প্রয়োজনীয় মাত্রায় আনার প্রয়াস পাচ্ছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

[লেখক: কৃষিবিদ। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।]

পাটখাতের উন্নয়নে নীতি নির্ধারণ

কা ও সা র র হ মা ন

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে পাটের চাষ ও এর ব্যবহার চলে আসছে। বিগত দু'শ বছরের অধিক সময় ধরে বহু চড়াই-উত্রাই-এর মধ্যে দিয়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পাট এ অঞ্চলের মানুষের অতিপরিচিত অর্থকরী ফসল। দেশি ও তোষা দু' প্রজাতির পাটগাছের ছাল থেকে আহরিত আঁশের নাম পাট, যা বাংলাদেশের সোনালি আঁশ নামে সমধিক পরিচিত। শিল্পবিপ্লবেব সময় মূলত ফ্লাক্স এবং হেম্প-এর স্থান দখল করে পাটের যাত্রা শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিশ্বের ৮০ শতাংশ পাট বাংলাদেশে উৎপাদিত হত। আর আশির দশকের শুরুতেও বাংলাদেশের শীর্ষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য ছিল পাট। এরপর থেকে সিনথেটিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর পেরে উঠে না পাট। ফলে দ্রুত বাজার হারাতে থাকে। অথচ ১৯৮০-৮১ অর্থবছরেও রপ্তানি আয়ে পাট ও পাটপণ্যের অবদান ছিল ৬৮ শতাংশ। ১৯৯০-৯১ সালে যা ছয় শতাংশে নেমে আসে।

তবে আশার কথা হল উন্নত দেশগুলোতে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাট আবার ফিরে আসছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে বিশ্বে আবার বাড়ছে পরিবেশবান্ধব পাটপণ্যের চাহিদা। বিশেষ করে জাতিসংঘ ২০০৯ সালকে আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক তন্তু বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করার পর পাট আবার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ফলে কাঁচাপাট ও প্রচলিত পাটপণ্য ছাড়াই মোট রপ্তানিতে বহুমুখী পাটপণ্যের রপ্তানি আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ছয় শতাংশ।

পাট বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। দেশের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাটের সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে দেশে ১২ থেকে ১৪ লাখ একক জমিতে পাটচাষ হয় এবং বছরে পাট উৎপাদিত হয় ৫০

থেকে ৬০ লাখ বেল। জিডিপিতে পাটখাতের অবদান প্রায় পাঁচ শতাংশ। জাতীয় কর্মসংস্থানেও পাট ও পাটখাতের অবদান ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। সর্বোপরি পাট শুধু আমাদের অর্থনীতিকেই সমৃদ্ধ করছে না, একটি নবায়নযোগ্য ফসল হিসেবে পাট দেশের জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায়ও অনন্য ভূমিকা রাখছে।

তবে পাট ও পাটপণ্যের চাহিদা বাড়লেও পাটচাষিরা তার কোনো সুফল পাচ্ছেন না। ন্যায্যমূল্য থেকে তারা যুগ যুগ ধরে বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছেন। আবার আমাদের বহুমুখী পাটপণ্যের যতটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তা পুরোপুরি আমরা কাজেও লাগাতে পারছি না। পাট ও পাটের উন্নয়নের সরকারের নীতি আছে; কিন্তু তার বাস্তবায়নে নেই। সরকারও এ খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে এগিয়ে আসছে না। ফলে পুরো পাটখাতেই এক ধরনের হতাশাজনক চিত্র বিরাজ করছে। এ হতাশা কাটিয়ে কী করে পাটখাতকে চাঙ্গা করে তোলা যায় সে ব্যাপারে ভাববার সময় এসেছে।

পাটখাতের গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত কয়েকটি ইস্যু

বিভিন্ন আলোচনায় পাটখাতের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত ইস্যু উঠে এসেছে। এগুলো হল—মানসম্পন্ন পাটবীজের নিশ্চয়তা, বহুমুখী পাটপণ্যের সম্প্রসারণ, পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, বিজেআরআই উদ্ভাবিত পাটপণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ, প্রচলিত জুট মিলগুলোর বিএমআরআই এবং পাটের মান বৃদ্ধিতে পানি সংকটের অবসান।

কর্মপদ্ধতি

গোল্ডেন ফাইবার : সাসটেইনবল লাইভলিহুডস ফর জুট প্রোয়ার্স এন্ড প্রডিউসারস ইন বাংলাদেশ' এবং জুট : অ্যান ইকো-ফ্রেন্ডলি অলটারনেটিভ ফর এ সাসটেইনবল ফিউচার' প্রকল্পের আওতায় এই অবস্থানপত্র তৈরি করা হয়। অবস্থানপত্রটি তৈরির মেথোডোলজি হচ্ছে পাট ও পাটপণ্য নিয়ে বিভিন্ন গবেষণাপত্র স্টাডি এবং এ খাতের সঙ্গে জড়িত স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা। তার ভিত্তিতে প্রথম একটি মূল প্রবন্ধ তৈরি করা হয়। পাশাপাশি মূল প্রবন্ধটি নিয়ে পাট সচিব, পাট প্রতিমন্ত্রী ও পাটমন্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা হয়। সেইসব আলোচনার প্রেক্ষিতেই এ অবস্থানপত্রটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

ইস্যু ১: কৃষক নিশ্চয়তা চায় মানসম্পন্ন পাটবীজের

দেশের পাটবীজের চাহিদা ৫ থেকে ৬ হাজার টন। এর মধ্যে দেশে উৎপাদিত হয় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ। বিএডিসি দেয় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ। আর ২০ শতাংশ

যোগান দেয় কৃষক নিজে। অবশিষ্ট ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ বীজ ভারত থেকে আসে। ভারত থেকে আসা বীজের মধ্যে কিছু বীজ আমদানি হয়। বাকিটা আসে চোরাই পথে। আমদানিকৃত বীজ ভারতের সিড বোর্ডের সার্টিফাইডকৃত। তবে চোরাই পথে আসা বীজের কোনো সার্টিফিকেট নেই। অনেক সময় এ বীজ ভালো বীজের সঙ্গে মিশিয়ে কৃষকের কাছে বিক্রি করা হয়। এ নিম্ন মানের বীজ ব্যবহার করার কারণে ভালো চারা গজায় না। পাটের মানও ভালো হয় না।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) পাট গবেষণার শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৪৩ টি পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করেছে। এ সকল উন্নত জাতই এখন কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদ করা হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভালো পাট উৎপাদনের জন্য ভালো বীজ প্রয়োজন। আর ভালো মানের বীজ পাটের ফলন ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক সমীক্ষা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত ২০০১-০২ সালে তুলনায় ২০০৫-০৬ সালে পাটে মোট আবাদি জমির পরিমাণ ৮.২৯ শতাংশ করেছে। কিন্তু মোট উৎপাদন ৩.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গড় ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.৫০ শতাংশ। পাটচাষে বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল জাত, আধুনিক প্রযুক্তি এবং উৎপাদন কলাকৌশলের ব্যবহারের ফলে এ বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। সময়োপযোগী ও প্রচলিত শস্যক্রমের সাথে মানানসই আগাম বপনযোগ্য তোষা পাটজাত উদ্ভাবন করার ফলে বেশি ও তোষা পাটচাষের অনুপাত সত্তর দশকের ৭০:৩০-এর স্থলে বর্তমানে প্রায় ২০:৮০ অনুপাতে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভালো মানের পাট উৎপাদনের জন্য মানসম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল বীজের প্রয়োজন। আর এ বীজ পেতে হলে আমদানির পরিবর্তনের চাহিদার সম্পূর্ণ পাটবীজ দেশেই উৎপাদন করতে হবে। কিন্তু দেশের চাহিদা অনুযায়ী পাট বীজ উৎপাদন কি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক?

পাটবীজ উৎপাদন করতে হলে রবিমৌসুমে পাটচাষ করতে হবে। কৃষক কি রবি মৌসুমে বেশি মুনাফা ক্যাশ ক্রপ বাদ দিয়ে পাটবীজ উৎপাদন করবে? আবার সেই বীজ কি কৃষক বিক্রি করতে পারবে?

এমনিতেই বীজ উৎপাদন সময়সাপেক্ষ ও ঝামেলার কাজ। ফলে কৃষক পাটবীজ উৎপাদন করতে চায় না। তার ওপর তারা কখনোই রবি মৌসুমে ধানচাষ বাবদ দিয়ে পাটবীজ চাষ করবেন না। রবিমৌসুমে পাটবীজ উৎপাদন করতে হলে তার জমিটি ১১ মাস সময় বীজের জন্য ব্যস্ত রাখতে হবে। এই সময়ে কৃষক তিন থেকে চার বার সবজি চাষ করতে পারে। আবার একরে পাটবীজ পাওয়া যায় ২০০

থেকে ৩০০ কেজি। ফলে চাহিদা অনুযায়ী পাটবীজ করা এত জমি আমাদের কোথায়? ভারতের মহারাষ্ট্রে শুধু পাটবীজ উৎপাদন করা হয়। তাদের প্রচুর জমি আছে, সেটা তারা পাটবীজ উৎপাদনের জন্য কাজে লাগাতে পারে; কিন্তু আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আবার উৎপাদিত বীজের খরচও একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক কেজি পাটবীজ উৎপাদন করতে খরচ পড়ে ২৫ থেকে ৩০০ টাকা। আর সরকার সেটা ভর্তুকি দিয়ে বিক্রি করে ১২০ টাকায়। এ মূল্যে কৃষক কখনোই তার উৎপাদিত তার উৎপাদিত পাটবীজ বাজারে বিক্রি করতে পারবে না।

কেউ কেউ বলছেন, তার চেয়ে পাটবীজ আমদানি করাই আমাদের জন্য অধিক লাভজনক। তবে এক্ষেত্রে আমদানির পুরো বীজই যাতে মানসম্পন্ন হয় সে ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। পাশাপাশি বীজ উৎপাদনে আমাদের হিস্যার পরিমাণ আরও বাড়তে হবে। তা নাহলে কোনো কারণে ভারত কোনো বছর পাটবীজ দিতে না পারলে ওই বছর আমাদের পাটচাষ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। এজন্য চাহিদার অন্তত ৫০ থেকে ৬০ ভাগ বীজ দেশে উৎপাদন করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও বীজ উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। কৃষক যাতে নিজের বীজ নিজে উৎপাদনে উৎসাহিত হয় সে জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে কৃষককে ইনসেন্টিভ দিতে হবে বীজ উৎপাদনের জন্য। দেশে বীজ উৎপাদনে অংশ বাড়লে শুধু পাটের উৎপাদনই বাড়বে না, বৈদেশিক মুদ্রাও সাশ্রয় হবে।

বর্তমানে দেশে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে মূলত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) পাটবীজ উৎপাদন করছে। পাট অধিদফতরসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কিছু পরিমাণ পাটবীজ উৎপাদন করতেও তা অত্যন্ত সীমিত। যা দিয়ে দেশের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা কেন্দ্র কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি গবেষণা কেন্দ্রের শত শত একর জমি রয়েছে। সরকার এই জমি পাটবীজ উৎপাদন কাজে লাগাতে পারে। এক্ষেত্রে বিজেআরআইয়ের দায়িত্ব হবে শুধু পাটবীজ উৎপাদন। বিএডিসি সেই বীজ কিনে নিয়ে ডিলারের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে বিপণন করবে। এতে দেশের পাটবীজের উৎপাদন বাড়বে এবং ভারতের ওপর পাটবীজের নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমে আসবে।

এক্ষেত্রে যে কাজগুলো করা জরুরি:

১. সরকারি সংস্থা তথা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে (বিএডিসি) পাটবীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরও জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। দেশে পাটবীজের চাহিদার অন্তত ৫০ ভাগ বীজ বিএডিসিকে উৎপাদন করতে হবে।

২. সরকারকে পাটবীজ উৎপাদনে সরকারি সংস্থাগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরও উৎসাহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে কৃষকের কাছ থেকে পাটবীজ কেনার 'বাই-ব্যাক গ্যারান্টি' দিতে হবে। যারা পাটবীজ উৎপাদন করছে সরকার তাদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেবে। কৃষক পাটবীজ উৎপাদন করবে। সরকার বেশি দামে ওই বীজ কিনে নিয়ে আবার কম দামে কৃষকদের কাছে বিক্রি করবে। এভাবে ভর্তুকি দিলে কৃষক পাটবীজ উৎপাদনে আগ্রহী হবে। নিম্নমানের পাটবীজের সমস্যা কেটে যাবে।
৩. উৎপাদিত ও আমদানিকৃত পাটবীজ মানসম্পন্ন কিনা তা যাচাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. পাটবীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদনকে গুরুত্ব দিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খরা-বন্যা সহনশীল জাত উদ্ভাবন করতে হবে। পাটবীজ শুধু উৎপাদন করলেই চলবে না, উৎপাদিত বীজ যাতে সময়মতো সুলভমূল্যে চাষিদের কাছে পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. দেশে পাটবীজের অভাব দূরীকরণে বিজেআরআই পাটবীজ উৎপাদনের জন্য 'নাবী পাট বীজ উৎপাদন' প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। নাবী পদ্ধতিতে মাত্র ৩-৪ মাসে দ্বিগুণ (প্রায় ৭০০ কেজি/হে) ফলন পাওয়া যায়। কৃষকপর্যায়ে এ প্রযুক্তি খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বীজের ঘাটতি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। 'নিজের বীজ নিজে করি' এই স্লোগান নিয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাষিদের পাটবীজ চাষে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রত্যেক পাটচাষি যাতে অন্তত এক শতাংশ জমিতে পাটবীজ উৎপাদন করে সরকারকে সে ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. রবিমৌসুমে অন্তত ১০ শতাংশ পাটবীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ মৌসুমে অন্যান্য ফসলের সঙ্গে কৃষককে বীজের জন্য কিছু পরিমাণ পাটচাষে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে বিএডিসি ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরকে উদ্যোগ নিতে হবে।
৭. বিজেআরআইয়ের ঢাকায় কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছাড়াও মানিকগঞ্জে পাটের কেন্দ্রীয় কৃষি পরীক্ষণ স্টেশন এবং রংপুর, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ ও চান্দিনায় (কুমিল্লা) চারটি আঞ্চলিক পাট গবেষণা কেন্দ্র এবং তারাবো (নারায়ণগঞ্জ), মনিরামপুর (যশোর) ও কলাপাড়ায় (পটুয়াখালী) তিনটি পাট গবেষণা উপকেন্দ্র এবং নসিপুরে (দিনাজপুর) একটি প্রজনন বীজ উৎপাদন খামার রয়েছে। এসব কেন্দ্রে রয়েছে শত শত একর জমি। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে অন্তত পাঁচ একর পরিমাণ জমিতে পাটবীজ উৎপাদন এবং উৎপাদিত বীজ বিএডিসির মাধ্যমে চাষিদের মাঝে বিতরণ করা যেতে পারে।

৮. ভারতের মহারাষ্ট্রে উৎপাদিত পাটবীজের অন্যতম ক্রেতা বাংলাদেশ। বিএডিসি ও বেসরকারি কোম্পানি ওই বীজ আমদানি করে। আমদানিকৃত ওই বীজ যেন মানসম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।
৯. পাটমৌসুমে সীমান্ত অঞ্চলে চোরাইপথে প্রচুর পাটবীজ আসে। কিন্তু বাজারে গিয়ে কৃষক বুঝতে পারে না কোন বীজ আসল, কোনটা নকল। তাই বাজারপর্যায়ে পাটবীজের মানযাচাইয়ের ব্যবস্থা করা দরকার।
১০. উদ্বৃত্ত পাটবীজ পরবর্তীতে কোনো কাজে আসে না। তাই উদ্বৃত্ত পাটবীজের বিকল্প ব্যবহার উদ্ভাবন করতে হবে।
১১. দেশে পাটের চাহিদা নিরূপণ করে প্রতি বছর পাট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।
১২. আগাম চাষ-উপযোগী পাটবীজ উদ্ভাবন করা।

ইস্যু ২: আশা জাগাচ্ছে বহুমুখী পাটপণ্য

স্বাধীনতার পর আমাদের অন্যতম বহুমুখী পাটপণ্য ছিল কার্পেট। এ শিল্প প্রায় ১৫ বছর টিকে ছিল। ডিজাইন পরিবর্তনসহ অন্যান্য কারণে একের পর এক কার্পেট কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। সত্তরের দশকের শেষদিকে শুরু হয় অপর বহুমুখী পণ্য পাটসুতা। ২০০০ সাল পর্যন্ত এ শিল্প দাপটের সঙ্গে চললেও বর্তমানে এ সুতার আন্তর্জাতিক বাজারও পড়তির দিকে।

২০০০ সালের শুরুতে বহুমুখী পাটপণ্যের প্রসার শুরু হয়। কিন্তু বড় মিলগুলো পাটের এ বহুমুখিকরণে এগিয়ে আসেনি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা (এসএমই) পাটের এ বহুমুখিকরণে এগিয়ে এসেছে। এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশে বহুমুখী পাটপণ্য তৈরি হচ্ছে। নতুন নতুন উদ্যোক্তা যুক্ত হচ্ছে এই পাটপণ্য তৈরির সঙ্গে। ফলে ধীরে ধীরে প্রসার ঘটছে এ সম্ভাবনাময় খাতের। বর্তমানের দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পাট থেকে কাগজ, কাঠ, ট্রাভেল ব্যাগ, হ্যান্ডব্যাগ, কুশন, ল্যাম্পশেড, টেবিলক্লথ গার্ডেনিং র‍্যাঞ্জ, নকশা করা শপিংব্যাগ, লন্ড্রিবাস্কেট, ফ্লোরম্যাট ও বিভিন্ন ধরনের ঘর সাজানোর উপকরণ ও পোশাক তৈরি করছে। কিছু কিছু উদ্যোক্তা মানসম্পন্ন পাটপণ্য তৈরি করে বিদেশেও রপ্তানি করছে।

বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় পাটপণ্য বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে। ফলে পাটের ব্যবহার শুধু বস্তা, চট, দড়ি আর কার্পেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং পাট এখন ফ্যাশন ও বিলাসী পণ্যের কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহার হচ্ছে। বর্তমানে পাট দিয়ে নানা ধরনের ইয়ার্ন ফাইবার ও ফেব্রিক জাতীয় শতাধিক পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। ফাইবার জাতীয় পণ্যের মধ্যে রয়েছে জুট কম্পোজিটস, পেপার, পেপার প্রোডাক্টস, পাল্প, মেডিকেয়ার টেক্সটাইলস, নন-ওভেন প্রোডাক্টস উইপস,

সেলুলোজ, বন্ডিং মেটেরিয়ালস, ফ্লোর টাইলস, সিএমসি, এমসিসি, টেকনিক্যাল ফাইবারস, প্যানেলস, সিটস ইত্যাদি। ইয়ার্ন জাতীয় পাটজাত পণ্যের মধ্যে রয়েছে ডায়েড ইয়ার্ন, ফাইনার ইয়ার্ন, পলিসড ইয়ার্ন, ফেসি ইয়ার্ন, কোর ইয়ার্ন, ফিউজড ইয়ার্ন, কেবল ইয়ার্ন, নিটেট ব্যাগ, হামক, স্যাভেল, জুতা, জুতার বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি। এছাড়া পাটের তৈরি ফেব্রিক জাতীয় পণ্যের মধ্যে রয়েছে চেকড ফেব্রিক, লাইট ফেব্রিক, ডিজাইনড ফেব্রিক, ট্রিটেট ফেব্রিক, লেমিনেটেড ফেব্রিক, ইউনিয়ন ফেব্রিক, প্রিন্টেড ফেব্রিক, গিফট রঙ, সুটকেস, ব্রিফকেস, সেমিনার ব্যাগস, ফাইলস, ফোল্ডার ইত্যাদি।

তাই বাংলাদেশের উদীয়মান রপ্তানিকার হাট বহুমুখি পাটপণ্য। পাটকে কেন্দ্র করে আবার যে সোনালি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তা এই বহুমুখি পাটপণ্যকে ঘিরেই। পরিবেশের ক্ষতির কারণে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার কমানো হচ্ছে। কয়েকটি দেশ প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহারের ওপর বাড়তি কর আরোপ করেছে। কয়েকটি দেশ প্লাস্টিক ব্যাগ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা করেছে। ফলে পরিবেশ-সচেতনতার কারণে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাটের ব্যাগ ও অন্যান্য পাটজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। বিশ্বে শুধুমাত্র শপিংব্যাগেরই মাল্টি বিলিয়ন ডলারের বাজার রয়েছে। এতে রপ্তানিআয় বাড়ছে প্রতিবছরই। আবার দেশেও পাটপণ্যের চাহিদা বাড়ছে। সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের মানুষও পাটের নানা পণ্য ব্যবহার করছে। বিদেশের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে বাড়ছে পাটপণ্যের চাহিদা। ফলে বহুমুখি পাটপণ্যের বিরাট সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এ বাজারের একটি অংশ ধরতে পারলে বাংলাদেশ থেকে বিলিয়ন ডলারের পাটপণ্য রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এ সম্ভাবনার কারণে দেশেও বাড়ছে পাটপণ্য তৈরির ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সংখ্যা। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে বাংলাদেশে যে পণ্যটি সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয় সেটি হল পাট। আর এ কারণেই নতুন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আগ্রহ পাটের প্রতি।

বহুমুখি পাটপণ্য তৈরির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো (এসএমই) প্রধান সমস্যার পড়ে কাঁচামাল নিয়ে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাটপণ্য তৈরি করতে অল্প পরিমাণে কাঁচামাল প্রয়োজন। বড় মিলগুলো স্বল্প পরিমাণে কাঁচামাল বিক্রি করতে চায় না। এজন্য সবচেয়ে বেশি সুপারিশ এসেছে কাঁচামাল ব্যাংক স্থাপনের ব্যাপারে। এ ব্যাপারে পাট নীতিতেও কাঁচামাল ব্যাংক স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। যেখানে এ ব্যাংক বড় মিলগুলো থেকে কাঁচামাল কিনে জমা রাখবে। সেখান থেকে এসএমই উদ্যোক্তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁচামাল কিনে নেবে।

জুট ডাইভার্সিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জিডিপিসি) ইতিমধ্যে দেশের ছয়টি স্থানে কাঁচামাল ব্যাংক করেছে। এর মধ্যে একটি ঢাকায় বিজেআরআই ভবনে।

অপরগুলো টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, রংপুর, নরসিংদী ও যশোরে স্থাপন করা হয়েছে। এগুলো এখন পূর্ণ উদ্যমে কাজ করছে। এখান থেকে চাহিদা অনুযায়ী উদ্যোক্তারা কাঁচামাল নিতে পারছে। ঢাকায় কাঁচামাল ব্যাংকে প্রতি মাসে ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকার কাঁচামাল বিক্রি হয়। ঢাকার বাইরেরগুলোতে এক থেকে দুই লাখ টাকার কাঁচামাল বিক্রি হয়।

ঢাকায় বিজেআরই ভবনে স্থাপিত কাঁচামাল ব্যাংককে পাটপণ্য বহুমুখিকরণ সেবা কেন্দ্র বলা হয়। এটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা গেছে, কেন্দ্রটিতে অনেক ধরনের কাঁচামাল রয়েছে। এখান থেকে বিনা লাভে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে কাঁচামাল বিক্রি করা হয়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস সময় হচ্ছে এ কেন্দ্রের পিক সময়। সারাবছর ধরে এলেও, এই সময়টাতে উদ্যোক্তারা কাঁচামাল নিতে বেশি আসে। প্রতি মাসে ১০০ থেকে ১৫০টি প্রতিষ্ঠান এখান থেকে কাঁচামাল ক্রয় করে।

তবে এসব কেন্দ্র থেকে একসঙ্গে বেশি পরিমাণে কাঁচামাল পাওয়া যায় না। বড় অর্ডার পেলে উদ্যোক্তাদের দৌড়াতে হয় মিলগুলোর কাছে। মিলগুলোতে লাইন দিয়ে কাঁচামাল নিতে হয়। আবার নেয়ার পর দেখা যায়, ওই কাপড়ের মাঝখানে ছেঁড়া-ফাটা থাকে। তাই বহুমুখি পাটপণ্য তৈরির জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সময়মতো মানসম্পন্ন কাঁচামালের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ কেন্দ্রে যারা কাজ করছেন তাঁদের পর্যবেক্ষণ হল— নতুন নতুন উদ্যোক্তারা এখন বেশি আসছে পাটপণ্য তৈরি করতে। বিশেষ করে যারা আগে লেদার বা সিনথেটিকের পণ্য তৈরি করত তারাও এখন পাটপণ্য তৈরি করতে এখান থেকে কাঁচামাল নিতে আসছে। আবার স্থানীয় বাইং হাউসগুলোর মাধ্যমে গার্মেন্টসগুলোও তৈরি পোশাকের পাশাপাশি পাটপণ্য রপ্তানির দিকে যাচ্ছে। এটাকে কাজে লাগাতে পারলে বিদেশে বহুমুখি পাটপণ্যের চাহিদা ব্যাপক বেড়ে যাবে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাঁচামাল সংকট দূর করার জন্য সরকারের পাশাপাশি এসএমই উদ্যোক্তারা তাদের সংগঠনের মাধ্যমেও কাঁচামাল ব্যাংক স্থাপন করতে পারে। এতে বহুমুখি পাটপণ্যের আরও প্রসার ঘটবে। এজন্য এসএমই সংগঠনকে জোরদার করতে হবে। ইতিমধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জুট ডাইভারসিটি ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠনের রেজিস্ট্রেশনের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে।

আবার সরকার বিজেএমসি'র কর্ণফুলী জুট মিলে এসএমই'র জন্য একটি কাঁচামাল ব্যাংক করার ঘোষণা দিয়েছে। দ্রুত এ ঘোষণা বাস্তবায়ন করা উচিত।

পাটের দামের ওপর কাঁচামালের দাম নির্ভর করে। দাম বেশি হলে এসএমই সেই কাঁচামাল দিয়ে পণ্য তৈরি করে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রি করতে পারবে না। এজন্য সরকার ওই মূল্যের ওপর ভর্তুকি বা ব্যাকোয়ার্ড লিংকজের জন্য ইনসেন্টিভ দিতে পারে। অবশ্য সরকার বর্তমানে বহুমুখি পাটপণ্যের উন্নয়নে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পর্যন্ত ইনসেন্টিভ দিচ্ছে। তবে এই নগদ সহায়তা যথেষ্ট নয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ডিজাইন উন্নয়ন, পণ্যের মান যাচাই, মার্কেট এক্সেস, পণ্যের প্রচার ইত্যাদি প্রয়োজন। এসব ব্যাপারে সরকারকে সহায়তা দিতে হবে। পাঁচ থেকে দশ বছর এ সহায়তা দিলে এ খাতটি দাঁড়িয়ে যাবে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা নতুন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, সরকার বহুমুখি পাটপণ্যের উদ্যোক্তাদের কেন সহায়তা দেবে? সরকার পাটের এসএমইকে সহায়তা দেবে এ কারণে যে, এ খাতে কর্মসংস্থান এবং মূল্য সংযোজন অনেক বেশি। বিদেশে এক টন কাঁচাপাট বিক্রি করলে দাম পাওয়া যায় ৭০০ ডলার। এক টন সুতা বিক্রি করলে পাওয়া যায় এক হাজার ডলার। আর এক টন বহুমুখি পাটপণ্য রপ্তানি করলে পাওয়া যায় পাঁচ হাজার ডলার।

বাংলাদেশ জুট ডাইভারসিটি ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের তথ্যমতে, এক টন সুতা তৈরি করতে প্রতি মাসে গড়ে ৫-৭ জন লোক লাগে। প্রচলিত পাটকলে এক টন বস্তা তৈরি করতে প্রতি মাসে গড়ে ১০-১২ জন লোক লাগে। আর প্রতি মাসে এক টন বহুমুখি পাটপণ্য তৈরি করতে লোক লাগে ২০ থেকে ৫০ জন। অর্থাৎ রপ্তানি আয় ও কর্মসংস্থানের অপার সুযোগ রয়েছে বহুমুখি পাটপণ্য শিল্পে।

বর্তমানে দেশে পাটের নানারকম জিনিস তৈরি হচ্ছে। বিদেশেও এসব বহুমুখি পাটপণ্যের প্রচুর অর্ডার আছে। কিন্তু সহায়তার অভাবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা তা সরবরাহ করতে পারছে না। এজন্য বহুমুখি পাটপণ্য উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে (এসএমই) নীতিগত সহায়তা দেয়া দরকার। নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির জন্য উৎসাহিত করা উচিত।

তবে কাঁচামালের চেয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এখন সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ভুগছে পাটপণ্যের নতুন ডিজাইন, পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ, পণ্য বাজারজাতকরণ নিয়ে। এক্ষেত্রে সরকারের নীতিসহায়তা জরুরি প্রয়োজন। এ সমস্যা সমাধানে সরকারকে কেন্দ্রীয়ভাবে এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পাটপণ্য বাজারজাতকরণে ব্যবস্থা নিতে হবে। যাতে পণ্য উৎপাদন করে তাদের বিক্রির জন্য বসে থাকতে না হয়। সরকার বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোকে এ ব্যাপারে কাজে লাগাতে পারে। আবার দেশে পাটপণ্যের ব্যবহার বাড়াতে জেলায় জেলায় মেলার আয়োজন করতে

পারে। যাতে মানুষ জানতে পারে দেশে পাটের কী ধরনের পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারকে পাটপণ্য ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিশেষ করে সরকারি অফিস-আদালতে পাটপণ্যের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রচার পেলে দেশেই পাটপণ্যের বিরাট বাজার গড়ে ওঠতে পারে।

বিদেশে পাটপণ্যের একক মেলা করার মতো যথেষ্ট পণ্য এখন দেশে তৈরি হচ্ছে। জেডিপিসি দুই বছর আগে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে বিদেশে একক পাটপণ্যের মেলা করার প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে। কিন্তু এটি এখনও কার্যকর হয়নি। বিদেশে বাংলাদেশি পাটপণ্যের একক মেলা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ করা উচিত।

পাটপণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত এসএমইগুলো ঋণসমস্যায়ও ভুগছে। তাদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

বহুমুখি পাটপণ্যের প্রসারে প্রচারের অভাবকে বাধা হিসেবে মনে করা হচ্ছে। নতুন উদ্যোক্তারা যারা আসছে, তারা আগে এ বিষয়টি জানত না। তাছাড়া পাট দিয়ে কী কী ধরনের পণ্য তৈরি হয় সেটাও অনেকে জানে না। তাই ঢাকার কাঁচামাল ব্যাংকে বিভিন্ন উদ্যোক্তার তৈরি নানা পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে, যাতে নতুন উদ্যোক্তারা এসে দেখতে পায় পাট দিয়ে কী কী ধরনের পণ্য তৈরি করা যায়। বহুমুখি পাটপণ্যের প্রসার ঘটাতে হলে যারা এখন পাটপণ্য উৎপাদন করছে তাদের নিয়ে ঘন ঘন মেলার আয়োজন করতে হবে। পাটপণ্যের প্রসার হলে মিলগুলো আরও বেশি করে কাঁচামাল উৎপাদন করতে পারবে। এতে কাঁচামালের দাম কমে গেলে উৎপাদিত পাটপণ্যের দামও কমে আসবে। তাই উৎপাদিত বহুমুখি পাটপণ্যের প্রচার ও প্রমোশনের জন্য সরকারের আলাদা কর্মসূচি ও বাজেট বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

দেশেই এসএমই উদ্যোক্তাদের সব ধরনের কাঁচামাল আছে। এগুলোর অনেককিছু বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো-ছিটানো। এগুলো এক ছাতার নিচে নেই। কাঁচামালের মধ্যে এসএমই'র চাহিদা হল কাপড়, ডাইং ও লেমিনেশন সুবিধা। এগুলো এককেন্দ্রিক করার উদ্যোগ নেই। এসএমই বড় উদ্যোক্তাদের নিজেদের ডাইং করার সুবিধা আছে। কিন্তু ছোট উদ্যোক্তাদের কাপড় ডাইং করতে হলে নরসিংদীতে এক ডাইং কারখানায় গিয়ে লাইন দিতে হয়।

আবার পাটপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক্সেসরিজ প্রাপ্তিরও সমস্যা আছে। পাটপণ্যের জন্য বোতাম, চেইন, বকলেস ইত্যাদি এক্সেসরিজের প্রয়োজন হয়। এসব এক্সেসরিজ মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য করতে হবে। এগুলোকে এক ছাতার নিচে আনতে পারলে উদ্যোক্তারা সুবিধা পাবে। এতে উৎপাদিত পাটপণ্যের দামও কমে আসবে। এক্ষেত্রে কাঁচামাল প্রাপ্তির ছাতা হিসেবে বিজেএমসি কাজ করতে

পারে। কারণ বিজেএমসি'র এ সুবিধা আছে। নতুন উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। জেডিপিসি নিয়মিতভাবে এ প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। কিন্তু সমস্যা হল তাদের স্বীকৃত কোনো প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল/মডিউল নেই। নিজেরা আনঅফিসিয়ালি একটি ম্যানুয়েল তৈরি করে নিয়েছে। তাই দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরির জন্য সরকার অনুমোদিত ম্যানুয়েল দরকার। এটা জরুরি ভিত্তিতে সরকারকে করতে হবে। জেডিপিসি গবেষণার ক্ষেত্রে বিজেআরআইয়ের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে।

পাটপণ্য বাজারজাতকরণের প্রধান সমস্যা হল এর মূল্য। সিনথেটিকের চেয়ে দাম বেশি হওয়ায় মানুষ এই পণ্যকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করছে না। উৎপাদিত পাটপণ্য বাজার-উপযোগী করতে হবে। প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে এমন পাটপণ্যই উৎপাদনের প্রতি জোর দিতে হবে।

জুট জিও টেক্সটাইলের সম্ভাবনা

জুট জিও টেক্সটাইল বড় জুটমিলগুলোর জন্য পাটপণ্য বহুমুখিকরণের অপার সম্ভাবনা নিয়ে আসছে। জুট জিও টেক্সটাইলের ব্যবহার বাড়তে বর্তমানে কমন ফান্ড ফর কমোডিটিজের (সিএফসি) অর্থায়নে পাঁচ বছর মেয়াদে ভারত ও বাংলাদেশে একটি আন্তঃদেশীয় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল দেশে-বিদেশে জুট জিও টেক্সটাইলের বাজার সম্প্রসারণ করা।

এ প্রকল্পের আওতায় দুই দেশেই জুট জিও টেক্সটাইল উৎপাদন করে তা ব্যবহার করা হচ্ছে। এ জুট জিও টেক্সটাইল মূলত ব্যবহার করা হচ্ছে মাটির ক্ষয় রোধে নদীর পাড়, রাস্তার স্লোপ, পাহাড়ের স্লোপ প্রভৃতি স্থানে। বাংলাদেশে সেনাবাহিনী, সড়ক ও জনপথ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড পরীক্ষামূলকভাবে এই জুট জিও টেক্সটাইল ব্যবহার করছে। বর্তমানে জনতা জুট মিল এই জিও টেক্সটাইল উৎপাদন করে সরবরাহ করছে।

এটি অনেকটাই সফলতা অর্জন করতে চলেছে। এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে দুই দেশের জুট মিলগুলোর জন্য বহুমুখি পাটপণ্য উৎপাদনের দুয়ার খুলে যাবে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে জুটমিলগুলো বিদেশে রপ্তানি করতে পারবে।

সংগঠনের অধিকার চায় উদ্যোক্তারা

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও বাজার উন্নয়নে নিজেদের কোনো সংগঠন নেই। বর্তমানে পাট খাতে পাঁচটি সংগঠন আছে। কিন্তু এগুলোতে তারা সদস্য হওয়ার শর্ত পূরণ করে না। এক্ষেত্রে একটি সংগঠন তাদের বহুমুখি পাটপণ্যের উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করতে পারে। গত কয়েক বছর ধরে রপ্তানি উন্নয়ন

ব্যুরো আয়োজিত ফার্নিচার মেলায় পাটের এসএমই উদ্যোক্তারা অংশ নিচ্ছে। এতে তারা বেশ ভালোই সাড়া পাচ্ছে। কিন্তু নিজেদের কোনো সংগঠন না থাকায় তারা এককভাবে পাটপণ্যের মেলার আয়োজন করতে পারছে না।

নতুন উদ্যোক্তাদের পাটপণ্য তৈরির ক্ষেত্রে বেশ আগ্রহ আছে। এ আগ্রহের কারণ হল এ শিল্পের সব কাঁচামাল হাতের নাগালের মধ্যে। পুঁজি বিনিয়োগও অনেক কম। তাই এ আগ্রহকে কাজে লাগাতে হলেও সংগঠনের খুব প্রয়োজন। পাটপণ্যের বহুমুখিকরণে সাহায্য করতে অনেক বিদেশি এনজিও এবং সংস্থা ফান্ড নিয়ে বসে আছে। তারা প্রচলিত জুটমিলকে সাহায্য করতে চায় না। তারা মনে করে, ওখানে সাহায্য করা মানে তাদের অর্থ পানিতে যাওয়া। তারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে চায়। কিন্তু সংগঠনের অভাবে ওই অর্থ গ্রহণ করা যাচ্ছে না। ওই অর্থ নেয়া গেলে নতুন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ডিজাইন উন্নয়ন, বাজারজাতকরণে সাহায্য করা যেত।

তবে বহুমুখি পাটপণ্যের উদ্যোক্তাদের জন্য একটি সতর্কবাণী হল—বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বহুমুখি পাটপণ্য উৎপাদন করতে হবে। বাজার-উপযোগী নয়, এমন পণ্য উৎপাদন করে কোনো লাভ হবে না। যে পণ্য নিয়ে বাজারে প্রতিযোগিতা করা যাবে, কেবল সেই পণ্যই উৎপাদন করতে হবে। এমন পণ্য তৈরি করতে হবে যাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে।

জোর করে পাটপণ্যের ব্যবহার বাড়ানো যাবে না। এজন্য মানুষকে সচেতন করতে হবে। সচেতন করতে হবে। এ সচেতনতার জন্য প্রয়োজন পাটপণ্যের প্রচার। প্রচারের জন্য জেলায় জেলায় মেলা করার পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারি অফিসে পাটপণ্য ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সরকারের মাইন্ডসেট পরিবর্তন। বিশেষ করে সরকারের মন্ত্রীদের পাটবিরোধী বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

ইস্যু ৩: পাটের ন্যায্যমূল্যই পারে চাষিদের বাঁচাতে

‘চাষি বাঁচলে পাট বাঁচবে’ এটিই আসলে এখন পাট পুনরুজ্জীবনের মূল স্লোগান হওয়া উচিত। পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে আগে চাষিদের বাঁচাতে হবে। আর চাষিদের বাঁচাতে হলে তাদের উৎপাদিত পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। গত দুই (২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪) অর্থবছরে চাষি পাটের দাম পায়নি। ফলে তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হলে চাষিদের পাটের ভালো দাম দিতে হবে। মনে রাখতে হবে- চাষি বাঁচলেই পাট বাঁচবে।

কীভাবে পাটের এই ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা যায়? এর সহজ উপায় হল পাটের বাজারে সরকারের হস্তক্ষেপ। প্রতি মৌসুমে পাট উঠার আগে পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া। যেমনটি সরকার ধান ও গমের ক্ষেত্রে করে থাকে। এবার বোরো মৌসুমে সরকার ২০ টাকা কেজি দরে ধান, ৩১ টাকা কেজি দরে চাল এবং ২৭ টাকা কেজি দরে গম কিনবে। এভাবে সরকার পাটের দামও নির্ধারণ করতে পারে।

চাষিদের উৎসাহিত করতে ভারতে প্রতি বছরই সরকার পাটের সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ করে দেয়। এ বছর (২০১৪ সালে) ভারতে প্রতি কুইন্টাল পাটের দাম ২,৩০০ রুপি নির্ধারণ করা হয়েছে। ভারতের মতো বাংলাদেশেও কৃষকদের মিনিমাম প্রাইস সাপোর্ট দিতে পাটের সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ করা উচিত। পাটের এই মূল্য নির্ধারণে ফার্মার্স অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে। এতে পাটের বাজারে সরকার নির্ধারিত দামে একটি প্রভাব পড়বে। যা চাষিদের ন্যায্যমূল্য পেতে সহায়তা করবে।

চাষিদের মতে, নিম্নমানের পাটের দাম ১৫০০-১৬০০ টাকা হলে চাষিরা মূলধন তুলতে পারে। অন্যথায় তাদের লোকসানে পড়তে হয়। তাই চাষিদের দাবি, ‘সরকারের উচিত পাটের সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দেয়া’। তারা নিম্নমানের পাটের দাম ২০০০ টাকা বেঁধে দেয়ার দাবি জানিয়েছে। কারণ হিসেবে তারা বলছে, উচ্চমান ও নিম্নমান— উভয় মানের পাট আবাদের খরচ প্রায় কাছাকাছি পড়ে। কিন্তু পানিসংকটের কারণে পাটের মান হেরফের হয়। বছরের শুরুতে পাটের সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দেয়া উচিত। তা না হলে চাষিরা পাটচাষ থেকে সরে যাবে।

কে পাটের দাম নির্ধারণ করবে এ নিয়ে প্রশ্ন আছে। এ প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে জাতীয় মূল্য কমিশন। অনেক দেশেই এ ব্যবস্থা আছে। মূল্য কমিশন হলে শুধু পাটই নয়, সব ফসলেই কৃষক সুবিধা পাবে। তাই কৃষিপণ্যের ন্যায্য ও লাভজনক মূল্য নির্ধারণ, উৎপাদক-ভোক্তা স্বার্থ রক্ষা এবং মধ্যস্থত্বভোগীদের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচাতে জাতীয় মূল্য কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। এটা বেশি প্রয়োজন ছোট ও মাঝারি কৃষকদের জন্য। কারণ তারা বড় কৃষকদের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তবে পাটের এই মূল্য নির্ধারণের ইস্যুটি নিয়ে বিতর্ক আছে। মিলমালিকদের মতে, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পাটের মূল্য নির্ধারণের কোনো সুযোগ নেই। মান অনুযায়ী বাজারই পাটের মূল্য নির্ধারণ করবে। তা সত্ত্বেও কৃষকের স্বার্থ বিবেচনা করলে মান অনুযায়ী পাটের দাম ১০০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা হতে পারে বলে মনে করেন মিল মালিকরা।

চাষিদের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার জন্য মিলমালিকরা মধ্যস্বত্বভোগীদের দায়ী করেছে। মধ্যস্বত্বভোগীরা কারসাজি করে দাম কমিয়ে পাট মজুদ করে। একেক মধ্যস্বত্বভোগী মৌসুমে দুই থেকে তিন লাখ টন করে পাট কিনে মজুদ করে রাখে। এটা বন্ধ করা গেলে চাষিরা পাটের ভালো দাম পেতে পারে। তবে হঠাৎ করে মধ্যস্বত্বভোগীদের পাটের বাজার থেকে সরিয়ে নেয়া ঠিক হবে না, আবার মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এটা সম্ভবও নয়। কারণ পাট কাটার মৌসুমে মিলগুলো একযোগে পাট কিনতে মাঠে নামতে পারে না। ব্যাংক বা সরকার আগে থেকে অর্থ বরাদ্দ করে না। ফলে কাউকে না কাউকে পাটের বাজারে ভূমিকা রাখতে হবে। হঠাৎ করে মধ্যস্বত্বভোগীদের পাট কেনা বন্ধ করে দিলে মৌসুমের শুরুতে নতুন পাট নিয়ে চাষিরা বিপাকে পড়বে।

কৃষকের পাটের ন্যায্য দাম না পাওয়ার আরও একটি কারণ হচ্ছে মিলগুলো সরাসরি বাজার থেকে পাট কেনে না। তাদের পক্ষে মধ্যস্বত্বভোগীরা পাট কেনে। ফলে পাটের দাম বাড়লে তার সুফল পায় ওই মধ্যস্বত্বভোগীরা। এ ব্যাপারে সরকারকেই নীতিগত কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

বাজারে পাটের বড় ক্রেতা বিজেএমসি। তাই বিজেএমসি যাতে ন্যায্যমূল্যে পাট ক্রয় করে সরকারকে সে নির্দেশনা দিতে হবে। পাশাপাশি মৌসুমের শুরুতে বাজারে যখন দাম কম থাকে তখন বিজেএমসি পাট কিনে রাখতে পারে এবং দাম বাড়লে তা বিক্রি করতে পারে। এতে বিজেএমসি যেমন লাভবান হবে, তেমনি লাভবান হবে কৃষক।

পাটের মূল্য নির্ধারণ ছাড়া বিকল্প কী?

১. পাট কেনার জন্য মিলগুলো ব্যাংক থেকে সময়মতো ঋণ পায় না। সময়মতো ঋণ পেলে মিলগুলো পাট কিনবে, তখন চাষিরা দাম পাবে। তাই চাষিদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হলে মিলগুলোকে সময়মতো পাট কেনার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য সময়মতো অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
২. আরেকটি বিকল্প হতে পারে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ। বাংলাদেশে এটি একটি নতুন ধারণা। উন্নত দেশে এ ধরনের এক্সচেঞ্জ ভালোভাবে কাজ করলেও, আমাদের দেশে কতটা কার্যকর হবে তা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। এটা সময়ের ব্যাপার। তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, এ এক্সচেঞ্জে যে পাট কেনাবেচা হবে সেই পাট ফান্ড ম্যানেজার (যারা কমোডিটি এক্সচেঞ্জে কেনাবেচা করেন) মৌসুমের আগেই মাঠ থেকে কিনে নেবে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় কৃষক তার পাট মাঠ থেকেই আগাম বিক্রি করে দিতে পারবে।

এটা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যই মঙ্গলজনক হবে। তবে এ কেনাবেচায় পাটের মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হবে সেটা মুখ্য বিষয়। এ এক্সচেঞ্জ সত্যিকার অর্থে কার্যকর হলে পাট নিয়ে কৃষকের দুঃখ ঘুচে যেতে পারে।

৩. পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হলে চাষিদের সংগঠিত হতে হবে। পাট উৎপাদন এলাকাগুলোয় চাষিদের সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়েও এ সংগঠন হতে পারে। এতে তাদের উৎপাদিত পাটের মূল্য ও দাবি-দাওয়া নিয়ে দরকষাকষির অধিকার বাড়বে। আবার এ সংগঠনগুলোর কাজ হবে মৌসুমে পাট কিনে মজুদ করে রাখা এবং দাম বাড়লে তা বিক্রি করে দেয়া। এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব হবে সংগঠনগুলোকে পাট কেনার জন্য স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং পাট মজুদের গুদাম নির্মাণে সহায়তা প্রদান। সরকারের পক্ষে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) মতো সংস্থা চাষিদের এ সংগঠনগুলোকে সহায়তা প্রদান করতে পারে। সেইসঙ্গে মিলগুলো যাতে সময়মতো পাট কেনে, সরকারকে সে উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলে মৌসুমে কৃষককে কম দামে পাট বিক্রি করতে হবে না।

আশার কথা

ইতিমধ্যে পাটচাষিদের সংগঠন গড়ে ওঠেছে। শুধু তাই নয়, সংগঠন করার পর পাটচাষিদের অবস্থাও পাল্টে যাচ্ছে। আগে চাষিরা ফড়িয়াদের কাছে জিম্মি ছিল। তাদের কারসাজির মুখে পানির দামে পাট বিক্রি করে দিত। কিন্তু সংগঠন করার পর এখন চাষিরা শক্তিশালী হয়ে ওঠেছে। তারা এখন আত্মনির্ভরশীল হতে শুরু করেছে। ফলে তাদের এখন ফড়িয়াদের মুখাপেক্ষী কম হতে হচ্ছে।

ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলা থেকে গড়ে উঠেছে চাষিদের ‘বাংলাদেশ জুট প্রডিউসার এসোসিয়েশন’। প্রতিটি উপজেলায় গঠিত হয়েছে এ সংগঠনের শাখা। আবার ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ—এই দুই জেলা মিলিয়ে গড়ে উঠেছে আঞ্চলিক সমিতি। বর্তমানে এই দুই জেলায় পাটচাষিদের মোট ১৭২টি সংগঠন গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি সংগঠনের পুঁজি গড়ে ওঠেছে এক লাখ টাকা থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত। অসহায় পাটচাষিরা তাদের সংগঠন থেকে স্বল্প সুদে অর্থ নিয়ে সংকট-সময় পার করতে পারছে। ফলে তাদের আর মৌসুমের শুরুতে কম দামে পাট বিক্রি করতে হচ্ছে না। সেই পাট মজুদ করে রেখে পরে বেশি দামে বিক্রি করতে পারছে। চাষিরা এখন স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেছে। এভাবে সারাদেশে চাষিদের সংগঠন গড়ে উঠলে ফড়িয়াদের চক্র ভেঙে যাবে। তখন চাষিদের আর পানির দরে পাট বিক্রি করতে হবে না।

ইস্যু ৪: বিজেআরআই উদ্ভাবিত পাটপণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ কি সম্ভব?

দেশে পাটের বহুমুখিকরণের একমাত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)। এ প্রতিষ্ঠানটি পাটের কারিগরি গবেষণায় এ পর্যন্ত ৪০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে ২৩টি প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক সাফল্য হল—দেশের চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানিযোগ্য পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে সম্প্রতি পাটবস্ত্র তৈরির জন্য চিকন সুতা উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন। পাটকে তুলার সঙ্গে ব্লেন্ড করে এ সুতা উৎপাদন করা হয়েছে। এ সকল সুতার মধ্যে রয়েছে, ৮, ১০, ১৫, ২০ কাউন্টের সুতা। বিজেআরআই ৫০ ভাগ তুলা ও ৫০ ভাগ পাটকে সফলভাবে মিশ্রণ করে সুতা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে।

এখন পাট ও তুলার মিশ্রণে দেশেই তৈরি হচ্ছে ডেনিম, সার্টের কাপড়, পর্দার কাপড়, বেড শিট, শাড়ি প্রভৃতি পণ্য। এমনকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি বিশেষ ধরনের জামদানি শাড়ি পরেন। সেটিও পাটবস্ত্রের তৈরি।

পাটের কারিগরি গবেষণার উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে অগ্নিরোধী পাটজাত বস্ত্র, রুট-প্রুফ জুট নার্সারি পট, পাট উল এবং পাটজাত শোষক তুলা ও স্যানিটারি ন্যাপকিন। এ প্রযুক্তিগুলো সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়েছে। এ ছাড়া নিম্নমানের পাটের মানোন্নয়ন, মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন, স্বল্প খরচে ওষুধে ক্যারিয়ার দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত মাইক্রোক্রিস্টালাইন সেলুলোজসহ অন্যান্য মূল্যবান উপজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং এক্ষেত্রে ব্যবহৃত মেশিন উন্নয়ন করা হয়েছে। কিন্তু মূল সমস্যা হল এ প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভাবিত পণ্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের কোনো মডেল নেই। যদিও বিজেআরআই এর কারিগরি গবেষণায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্ভাবিত পণ্যাদি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন ও বাজারজাত করার লক্ষ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে তারা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ শুরু করেছে, যা দ্বারা প্রকারান্তরে পাটশিল্পের নবদিগন্ত উন্মোচিত হবে।

বিজেআরআইয়ের নিজের উদ্ভাবিত পাটপণ্য নিজেদের পক্ষে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের সুযোগ নেই। আবার বিজেআরআইয়ের গবেষণায় উদ্ভাবিত পণ্য কীভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করা হবে সে ব্যাপারেও কোনো গাইডলাইন নেই। ফলে তাদের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বসে থাকতে হয়। প্রচলিত

মিলগুলো তাদের মাইন্ডসেট থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারছে না। তারা মনে করে, বিজেআরআই যে পণ্য উদ্ভাবন করেছে তা ব্যয়বহুল। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে না। ফলে তারা ঝুঁকি নিয়ে এসকল পণ্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনে এগিয়ে আসে না। এজন্য একটি গাইডলাইন থাকা দরকার বিজেআরআই উদ্ভাবিত পাটপণ্যগুলো কীভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করা যায়।

এ ব্যাপারে করণীয়গুলো সুপারিশ আকারে তুলে ধরা হল

১. বিজেআরআই কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায়। আবার তাদের উদ্ভাবনীগুলো বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের আওতায়। তাই তাদের উদ্ভাবিত পণ্য যাতে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের মিলগুলো উৎপাদনে এগিয়ে আসে সেজন্য সরকারকে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। জুটকে কটন মিলে নিয়ে কটন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এতে দেশে কটন আমদানি হ্রাস পাবে। সাশ্রয় হবে বৈদেশিক মুদ্রা।
২. উদ্ভাবিত পণ্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনক করতে হলে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে উদ্ভাবিত পণ্য ব্যয়বহুল হওয়ায় বেসরকারি উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসবে না। এজন্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তি উন্নয়নে আরও কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি প্রযুক্তি উন্নয়নে দ্বিতীয় দফায় কাজ হলে উৎপাদন খরচ কমে আসবে। তখন বেসরকারি উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসবে। যেমন— বিজেআরআই জুট ও কটনের মিশ্রনে এক ধরনের সার্টিং-সুয়টিং তৈরি করেছে। প্রতি গজ কাপড়ের উৎপাদন খরচ পড়েছে ২৫০ টাকা। সেই কাপড় বিক্রি হয়েছে প্রতি গজ ৫০০ টাকা। বাজারে এ কাপড়ের চাহিদা আছে। কিন্তু কাপড় নেই।
৩. নতুন উদ্যোক্তারা বহুমুখি পাটপণ্য উৎপাদনে বেশি আগ্রহী। কিন্তু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এই পাটপণ্য তৈরি করতে হলে বড় বিনিয়োগের প্রয়োজন। পাট মিলগুলো নিয়ে তিজ্ঞ অভিজ্ঞতার কারণে ব্যাংকগুলো পাটবস্ত্র তৈরির প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে না। এ ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ জরুরি। এক্ষেত্রে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। বহুমুখি পাটপণ্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে। তাহলেই বেসরকারি উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসবে।
৪. আন্তর্জাতিক বাজার অনুযায়ী পণ্য ও ডিজাইন উদ্ভাবন করতে হবে। বিজেআরআই যে পণ্যগুলো উদ্ভাবন করবে, সেগুলো সহজে স্বল্প খরচে

উৎপাদনযোগ্য হতে হবে। ব্যয়বহুল পণ্য উদ্ভাবন করলে তা যেমন বাজার পাবে না, তেমনি আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না।

৫. বিজেআরআই আসলে কী কী পাটপণ্য উদ্ভাবন করেছে সেগুলো উদ্যোক্তারা জানে না। এজন্য বিজেআরআই প্রতি বছর তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী করতে পারে। এসএমই উদ্যোক্তারা সেই প্রদর্শনী ঘুরে যেন তাদের পছন্দসই পণ্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের জন্য বেছে নিতে পারে।
৬. বিজেআরআই যে যন্ত্রপাতি দিয়ে গবেষণা করে সেগুলো ৫০-এর দশকের। গত ৬০ বছরেও এগুলোর বড় ধরনের কোনো আপ-গ্রেডেশন হয় নি। তাই উন্নত গবেষণার জন্য আধুনিক ও যুগোপযোগী মেশিনপত্র দরকার।
৭. গবেষণার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এ খাতটি বরাবরই বাংলাদেশে অবহেলিত। বর্তমান সরকার গবেষণার জন্য অর্থ দিচ্ছে। কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। গবেষণাকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করে পর্যাপ্ত বরাদ্দে ব্যবস্থা করতে হবে।
৮. গবেষণার জন্য জনবল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। বিজেআরআই এতদিন একটি প্রকল্পের আওতায় পাটপণ্য নিয়ে গবেষণা করেছে। প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পর ৪/৫ বছর এ গবেষণা বন্ধ ছিল। বর্তমানে এ গবেষণা কার্যক্রমটি রাজস্ব বাজেটে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এ সময় অনেক যন্ত্রপাতি যেমন নষ্ট হয়ে গেছে, তেমনি অনেক জনবলও চলে গেছে। তাই গবেষণার জন্য তরুণ উদ্যমী গবেষক নিয়োগ করা জরুরি।
৯. উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বাজারজাতকরণের জন্য বিজেআরআইয়ে কোনো মার্কেটিং বিভাগ নেই। বিজেআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বেসরকারি খাতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের জন্য সংস্থায় দ্রুত মার্কেটিং বিভাগ চালু করতে হবে।
১০. গবেষণায় উৎসাহিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষিবিজ্ঞানীদের প্রণোদনা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। এ ঘোষণা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।
১১. গবেষণাকাজে গতি আনতে বিজ্ঞানীদের সময়মতো প্রমোশনের ব্যবস্থা করতে হবে। সেইসঙ্গে বিজ্ঞানীদের দেশে ধরে রাখতে আকর্ষণীয় বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।
১২. পাটখাতের আরেকটি সমস্যা হল— পাট, বস্ত্র ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। পাটের উন্নতি করতে হলে এই তিন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

ইস্যু-৫: বিএমআরই ছাড়া প্রচলিত জুটমিলগুলোর বিকল্প নেই

বর্তমানে দেশে মোট ২৪৭টি জুট মিল আছে। এ মিলগুলো আবার দুটি খাতে রয়েছে। সরকারি খাতের মিলগুলো বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের (বিজেএমসি) অধীনস্থ। এ কর্পোরেশনের আওতায় মিল রয়েছে ২৭টি প্রচলিত জুটমিল। আবার বেসরকারি খাতে দুই ধরনের জুটমিল রয়েছে। কিছু প্রচলিত জুটমিল ও কিছু পাটসুতা তৈরির জুটমিল। বেসরকারি খাতে প্রচলিত জুটমিল রয়েছে মোট ১২৬টি। এগুলো বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশনের অধীনস্থ। আর পাটসুতা তৈরির ৯৪টি জুটমিল রয়েছে বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশনের আওতায়।

সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রচলিত জুটমিলগুলোর সমস্যা একই ধরনের। এগুলোর সমস্যা পুরনো যন্ত্রপাতি, দক্ষতার অভাব, দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব, পণ্য বাজারজাতকরণের অভাব এবং অর্থের অভাব। এগুলোর বেশিরভাগ মিলই ৫০-৬০ বছরের পুরনো। অনেক আগেই এগুলো কর্মক্ষমতা হারিয়েছে। আবার সবার আর্থিক অবস্থাও একরকম নয়। বিশ্ব বাজারেও প্রচলিত পাটপণ্যের চাহিদা ক্রমান্বয়ে কমছে। ফলে প্রচলিত জুটমিলগুলোর সময় ফুরিয়ে আসছে। এখন দুয়ার খুলছে বহুমুখি পাটপণ্যের।

তবে পাটসুতা উৎপাদনকারী জুটমিলগুলো লাভজনক। মূলত আশির দশক থেকে এ মিলগুলোর যাত্রা শুরু। তুলনামূলকভাবে এগুলো আধুনিক এবং সময়ে সময়ে উদ্যোক্তারা প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের মিলগুলোর সংস্কার করেছে। ফলে এগুলোর বিএমআরই- জনিত কোনো সমস্যা নেই। এদের সমস্যা পাটসুতার ওপর প্রদত্ত ভর্তুকি নিয়ে। সরকার একদিকে তাদের ভর্তুকি ১০ শতাংশ থেকে ৭.৫ শতাংশে কমিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে সরকারের কাছে তাদের রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি বাবদ প্রায় পাঁচশ' কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। ফলে তারা আর্থিক সংকটের মধ্যে আছে। এই টাকা ছাড় করলেই তাদের আর্থিক সংকট কেটে যাবে।

সরকারি জুটমিল : বিজেএমসির জুটমিলগুলোর সমস্যা হল মিলগুলোতে দক্ষ জনবল নেই। নেই দক্ষ ব্যবস্থাপক। আবার যন্ত্রপাতিগুলোও পঞ্চাশ বছরের পুরনো। ফলে মিলগুলোর উৎপাদনক্ষমতা যেমন কমছে, তেমনি মানসম্পন্ন পণ্যও উৎপাদন করতে পারছে না।

বিজেএমসি'র মিলগুলো শুধু শুধু বিএমআরই করে লাভ হবে না। নতুনভাবে দক্ষতা তৈরির জন্য এ মিলগুলোকে ব্যাপকভাবে বিএমআরই করতে হবে। এ বিএমআরই করতে হবে যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী। বিশ্বে এখন প্রচলিত পাটপণ্যের দিন চলে যাচ্ছে। শুধু প্রচলিত বস্তা তৈরি করলে আর চলবে না। তাই

বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী পাটপণ্য উৎপাদন করার উপযোগী করে মিলগুলোকে বিএমআরই করতে হবে।

অবশ্য বিজেএমসি কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে কর্ণফুলী জুট মিলকে লিজগ্রহীতার কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে মিলটিকে বহুমুখি পাটপণ্য উৎপাদনের দিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এই মিলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বহুমুখি পাটপণ্যের কাঁচামাল তৈরি করা হবে।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মিলগুলোর বিএমআরই করার জন্য বিজেএমসি সরকারের কাছে ১০৮৪ কোটি টাকা চেয়েছে। এ বিএমআরই'র উদ্দেশ্য হচ্ছে- বিদ্যমান জুটমিলগুলোকে বিএমআরই করে বহুমুখি পাটপণ্য উৎপাদনের উপযোগী করা। তবে সেই প্রস্তাব সরকার ফেরত পাঠিয়েছে। তারা অল্প অল্প করে মিল বিএমআরই করতে বলেছে। সে অনুযায়ী, বিজেএমসি পুনরায় ১৯৪ কোটি টাকার নতুন প্রস্তাব পাঠিয়েছে। ওই টাকা পেলে ৫-৭ টি মিল বহুমুখি পাটপণ্য উৎপাদনের জন্য বিএমআরই করা হবে। বিশ্ব এখন বহুমুখি পাটপণ্যের দিকে ঝুঁকছে। বিজেএমসি সে পথেই যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকার বিজেএমসি'র জন্য একটি ফান্ড গঠন করতে পারে। যখন যে মিলের আপগ্রেডের জন্য অর্থের প্রয়োজন হবে সেখানে ফান্ড থেকে টাকা দেয়া হবে। কোনো মিলের আপ-গ্রেডের জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তবে শুধু বিএমআরই করলেই হবে না, দক্ষতার সঙ্গে মিল চালানোর জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপকেরও প্রয়োজন হবে। এ ছাড়া দক্ষ ও যোগ্য লোকদের সরকারি জুট মিল ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ দিতে হবে।

বেসরকারি জুট মিল : বেসরকারি খাতের বিজেএমএ'র পুরনো মিলগুলোর অবস্থাও করণ। নতুন প্রজন্ম মিলগুলো সঠিকভাবে চালাতে পারছে না। এসব জুটমিলের বেশিরভাগেরই আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই। যাদের আছে তারা নিজেরাই মেনটেনেন্সের মাধ্যমে সময়ে সময়ে আপ-গ্রেড করছে। তাই বেসরকারি খাতের জুট মিলগুলোও যাতে যুগের চাহিদা অনুযায়ী বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করতে পারে সেজন্য মিলগুলোর আপগ্রেডেশন করতে সরকার ৫-৬ শতাংশ সুদে অর্থের ব্যবস্থা করতে পারে। পারফরমেন্সের ভিত্তিতে এ অর্থ ব্যবহার করতে দেয়া যায়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই ফান্ড ইউটিলাইজেশন সঠিক হতে হবে।

বিজেএমএ মনে করে পাটশিল্পকে বাঁচাতে এ মুহূর্তে তিনটি পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। এগুলো হল-

১. বেসরকারি পাটমিল্লের পুরনো ঋণসহ সুদ ব্লকড করা, বকেয়া রপ্তানি ভর্তুকির সম্পূর্ণ টাকা ছাড় দেয়া;

২. বিলম্ব না করে এখনই বাধ্যতামূলক পাটের বস্তা ব্যবহার আইন বাস্তবায়ন শুরু করা; এবং
৩. চলতি মূলধন ঋণের একটি অংশ রপ্তানি ঋণ হিসেবে বিবেচনা করে সামগ্রিক পাটশিল্পের ঋণের সুদের রেয়াতি হার নির্ধারণ করা ।

বেসরকারি জুটমিলগুলো খেলাপি ঋণের ভারে জর্জরিত । সরকার বিজেএমসি'র মিলগুলোর পুরনো দেনা মাফ করে দিয়েছে । বেসরকারি মিলগুলোর পুরনো দেনাও রাইট অফ করে দেয়া উচিত, যাতে মিলগুলো নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করতে পারে ।

ভর্তুকি দেয়া ছাড়া দেশের পাটশিল্পকে টিকিয়ে রাখা যাবে না । আর এ খাতকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এ কারণে যে, এ খাতের সঙ্গে দেশের প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ জড়িত । বিপুলসংখ্যক কর্মসংস্থান করেছে এ খাত । বরং ভর্তুকি দিলে এ খাতের মাধ্যমে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব । তবে কীভাবে দেবে, কি পরিমাণ ভর্তুকি দেবে তা স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে নির্ধারণ করা যেতে পারে । বেসরকারি পাটকলগুলো এখনো প্রচলিত পাটপণ্যই উৎপাদন করছে । তবে কেউ কেউ যুগের চাহিদা মিটিয়ে পাটপণ্য বহুমুখিকরণের চেষ্টা করছে । যেমন কোনো কোনো জুটমিল একেবারে ফেলে দেয়া পাট দিয়ে জুট টার্ব তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করছে । উন্নত দেশগুলো স্বাস্থ্যসচেতন হওয়ায় এখন তারা আর সিনথেটিক টার্ব ব্যবহার করছে না । ফলে তারা পাটের তৈরি ন্যাচারাল টার্ব ব্যবহার করছে । তবে বড় মিলগুলোতে এই বহুমুখি পাটপণ্য উৎপাদন খুবই নগণ্য পর্যায়ে । পাটশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এখন বেসরকারি মিলগুলোকেও প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি বহুমুখি পাটপণ্য উৎপাদনে যেতে হবে । এজন্য জুটমিলগুলোর বড় ধরনের বিএমআরই প্রয়োজন । আর এ বিএমআরই'র জন্য প্রয়োজন স্বল্প সুদের ঋণ । এজন্য সরকার ৭ শতাংশ সুদে বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল বা এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ) থেকে অর্থায়ন করতে পারে । এক্ষেত্রে নির্ধারিত সুদের বাইরে যে সুদ থাকবে তা সরকার বহন করবে । যখন যে মিলের আপ-গ্রেডের জন্য অর্থের প্রয়োজন হবে সেই ফান্ড থেকে অর্থ নেবে । সেখানেও বিশেষজ্ঞ কমিটি নির্ধারণ করবে কোনো মিলের আপগ্রেডের জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন । তবে উভয় ক্ষেত্রেই আপ-গ্রেডেশন বা বিএমআরইএ'র জন্য ফান্ড বা ঋণ ব্যবহারে পূর্ণ স্বচ্ছতা থাকতে হবে । এ অর্থ যাতে অন্য খাতে ডাইভার্ট না হয় সেটা জোরালোভাবে তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে ।

বাধ্যতামূলক পাটের বস্তা ব্যবহার : শুধু বিদেশের ওপর দেশের পাটপণ্যের বাজার নির্ভর করে থাকলে চলবে না। দেশেও পাটপণ্যের একটি বিশাল বাজার আছে। সে বাজারকে কাজে লাগাতে হবে। এজন্য দেশের অভ্যন্তরে পাটপণ্য ব্যবহার বাড়াতে হবে। খাদ্যশস্য সংরক্ষণে পাটের বস্তা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে। ভারত ১৯৮৭ সালে পাটের বস্তায় ধান, চাল, গম, ভুট্টা সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করেছে। ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারেই পাটপণ্যের বিশাল বাজার গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও খাদ্যশস্য সংরক্ষণে পাটের বস্তা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে আইন হয়েছে। সর্বশেষ এ আইন কার্যকরেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখনো অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের বস্তার ব্যবহার শুরু হয়নি। অথচ দেশের অভ্যন্তরে বাধ্যতামূলক পাটের বস্তা ব্যবহার আইন বাস্তবায়ন হলে উৎপাদিত বস্তার অন্তত ২০ থেকে ৩০ ভাগ দেশেই ব্যবহৃত হবে। এতে রপ্তানি কমলেও লাভবান হবে দেশের পাটশিল্প।

ইস্যু-৬ : পাটের মান বৃদ্ধিতে পানিসংকটের অবসান জরুরি

প্রচলিতভাবে দেশে পাট আবাদ হত বোরো মৌসুমে। কিন্তু পাটচাষ অলাভজনক হয়ে উঠায় কৃষক বোরো মৌসুমে ধান বাদ দিয়ে পাটচাষে অনাগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে পাট আবাদের জমির পরিমাণ অর্ধেকেরও নিচে নেমে আসে। এ অবস্থায় বিজ্ঞানীরা চৈত্রমাসে পাট আবাদের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেন। তখন কৃষক আবার পাটচাষে আগ্রহী হয় এবং পাট আবাদের জমির পরিমাণও দ্বিগুণ বেড়ে যায়। চৈত্র মাসে বোনা পাট কাটতে হয় বর্ষায়, কিন্তু বর্ষায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় ওই সময়টাতে দেখা দেয় তীব্র পানিসংকট। আবার পানির অভাবে পাটের জমিতে কৃষক সেচও দিতে পারে না। ফলে পাট কাটার পর চাষিরা পাট ভেজানো নিয়েও প্রতি বছরই পানিসংকটে পড়ে। এতে পানির অভাবে পাটের মান কমে যাচ্ছে। আবার দূরদূরান্তে নিয়ে পাট ভেজাতে গিয়ে বেড়ে যাচ্ছে কৃষকের উৎপাদন খরচও।

পাটচাষ ও পাট ভেজানোর জন্য পানিসংকট এখন কৃষকের কাছে ‘মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট অল্প পানিতে বা চৌবাচ্চায় পাট ভেজানোর জন্য রিবন রেটিং পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু এ পদ্ধতিটিও সর্বপ্রচারিত নয়। ফলে দেশে পাটের মান দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এ অবস্থার দ্রুত অবসান না করলে দেশে মানসম্পন্ন পাটের উৎপাদন দুরূহ হয়ে পড়বে। আর মানসম্পন্ন পাট পাওয়া না গেলে পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনাও হয়ে পড়বে দুষ্কর।

প্রচলিত পদ্ধতি, আর রিবন রেটিং পদ্ধতি যে পদ্ধতিতেই পাট ভেজানো হোক না কেন এজন্য দরকার পানি। আর পানির ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে।

চাষিরা বলছে, পাটের দাম নির্ভর করে পানির ওপর। যেখানে বেশি পানি পাওয়া যায়, সেখানে পাটের মান ভালো হয়। দামও ভালো পাওয়া যায়। শ্রমিকখরচ কমে যায়। ফলে চাষিরা লাভবান হয়। আর যেখানে পানি পাওয়া যায় না, সেখানে পাটের মান খারাপ হয়। দামও কম পাওয়া যায়। কিন্তু উৎপাদনখরচ প্রায় একই পড়ে।

এ জন্য যেসকল সুপারিশ পাওয়া গেছে সেগুলো হল-

১. রেললাইন বা বড় রাস্তার পাশে ডোবা বা নালাগুলো পুনঃখনন করে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আবার ভরাট হওয়া খালগুলোও পুনঃখনন করে সরকার পানির প্রবাহ বাড়াতে পারে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য বা একশ' দিনের কর্মসূজন কর্মসূচির আওতায় এ খালগুলো খনন করা উচিত। এতে শুধু পাটই নয়, সব ফসলই সেচসুবিধা পাবে। সেই সঙ্গে নৌপরিবহনেও গতি আসবে।
২. পাট ভেজানোর জন্য রিবন পদ্ধতিটি আধুনিক। এতে পাটের মানও ভালো হয়। এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। রিবন রেটিং পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার করতে হবে। পাটচাষিদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে এ পদ্ধতি ব্যবহারে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে চাষিদের এ পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরেশোরে করা উচিত।
৩. দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি খাস জমি রয়েছে। এসকল জমিতে পুকুর কেটে চাষিদের জন্য পানির উৎস সৃষ্টি করতে হবে। যাতে কৃষক কেন্দ্রীয়ভাবে এসকল উৎসে পাট ভেজাতে পারে। এটা করা গেলে চাষিদের যেমন খরচ বাঁচবে ও কষ্ট লাঘব হবে, তেমনি ভালো হবে পাটের মান। চাষিরা পাটের ভালো দাম পাবে এবং তাদের অভাব দূর হবে। সরকার তার কাজের বিনিময়ে খাদ্য, টাকার বিনিময়ে কাজ কিংবা ১০০ দিনের কর্মসূজন কর্মসূচির আওতায় এ পুকুর খনন করতে পারে।

শেষকথা : পাট শুধু অর্থনীতিতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে না, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বিরাট ভূমিকা রেখে চলেছে। শিল্পায়নের দ্রুত বিকাশের ফলে উন্নত দেশগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ করে পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করছে। সেই কার্বন শোষণ করে বৈশ্বিক উষ্ণতাহ্রাসেও ভূমিকা রাখছে পাট।

পাট ফসলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ ক্ষমতা ০.২৩ থেকে ০.৪৪ মিলিগ্রাম/বর্গমিটার/এস। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১০০ দিন সময়ের মধ্যে এক হেক্টর পাটের ফসল বাতাস থেকে ০.৩৪ মিলিগ্রাম/বর্গমিটার/এস মাত্রায় প্রায় ১৪.৬৬ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে সক্ষম হয়, যার জন্য বলা যায়, পাট ফসল বায়ুম-লের দূষিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে বায়ুমণ্ডলকে পরিশোধিত করছে। পৃথিবীকে সহায়তা করছে তার পরিবেশ রক্ষায়। আবার প্রতি হেক্টর পাট ফসল ১০০ দিন সময়ে ১০.৬৬ টন অক্সিজেন ত্যাগ করে বায়ুমণ্ডলকে শুদ্ধ করে। এই মাত্রায় বাংলাদেশের চাষকৃত পাট ফসল তার মোট চাষ এলাকার বায়ুমণ্ডল থেকে প্রতি বছর ১০০ দিনে প্রায় ৯১ লাখ ১৫ হাজার টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ এবং প্রায় ৫৯ লাখ টন অক্সিজেন ত্যাগ করে।

পাটগাছের পাতা আবহাওয়া থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং আবহাওয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমানোর মাধ্যমে যেমন ‘গ্রিন হাউস প্রভাব’ থেকে পরিবেশ রক্ষায় সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করছে, তেমনি পাটপাতা সবজি হিসেবে এবং সাথে সাথে ঔষধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। এ ছাড়াও উর্বরতা বৃদ্ধিতে সবুজ সার তৈরির জন্য পাটের পাতার অবদান অপরিসীম। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের আবহাওয়ায় পরিবর্তন ঘটায় পাটচাষও সমস্যায় পড়ছে। বর্তমানে জুলাই-আগস্ট মাসে দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অত্যধিক বৃষ্টির কারণে জমিতে জো থাকে না। ফলে কৃষক পাটবীজ বপন করতে পারে না। এতে পাটচাষ বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। আবার পাটবীজ উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে।

সাধারণত পাটবীজ উৎপাদন করতে হলে পাটগাছকে আরও ৪/৫ মাস জমিতে রেখে দিতে হয়। এতে পাটবীজ উৎপাদিত হতে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস লেগে যায়। ফলে পাটবীজ যখন পরিণত অবস্থায় আসে তখন প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহের কারণে পাটগাছ কোল্ড ইনজুরিতে পড়ে। এতে পাটবীজ নষ্ট হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন পাটবীজের ওপর নেতিবাচক ফেলছে।

সবমিলিয়ে পাটগাছ ও পাটের আঁশের নিজস্ব শক্তি এ দেশের পরিবেশ প্রকৃতি ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সাথে একাত্ম হয়ে আছে। তবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পাটচাষ ও পাটশিল্প লাভজনকভাবে চালু রাখতে হলে দক্ষ ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই। পাট নিয়ে নানাবিধ হতাশার মাঝেও নতুন করে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। সেটা হল দেশে-বিদেশে বহুমুখি পাটপণ্যের চাহিদা ও ব্যবহার বাড়ছে। বাংলাদেশ পাটের এ বহুমুখিকরণের মাধ্যমে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারে। এজন্য প্রয়োজন সরকারি নীতির কার্যকর পরিবর্তন।

তথ্যপঞ্জি

১. পাট নীতি ২০১১ ।
২. পাট কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ ।
৩. পলিসি রিসার্চ ফর জুট থ্রোয়ার্স এন্ড জুট ক্রাফট প্রোডাক্টস ।
৪. বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)
৫. বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন ।
৬. খন্দকার মোখলেসুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার ।
৭. মেজর জেনারেল (আব.) হুমায়ুন খালেদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন ।
৮. বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন ।
৯. ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ ।
১০. শাহেদুল ইসলাম (হেলাল), বহুমুখি পাট উদ্যোক্তা ও প্রেসিডেন্ট, প্রস্তাবিত বাংলাদেশ জুট ডাইভারসিটি ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন ।
১১. একেএম শাহাদাত হোসেন, সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জুট প্রডিউসার এসোসিয়েশন ।
১২. ফণী ভূষণ চৌধুরী, সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ।
১৩. মির্জা আজম, প্রতিমন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ।
১৪. মুহাম্মদ ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক, মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ।

[লেখক: নগর সম্পাদক, দৈনিক জনকণ্ঠ । প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম ।]

নদীভাঙ্গন প্রতিরোধে পাটের ব্যবহার

ম. ইনামুল হক

বাংলার সমভূমি এশিয়ার কয়েকটি বড় নদনদী, যথা ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও মেঘনা নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত। এইসকল নদী ও তাদের উপনদীগুলো চীন, নেপাল, ভূটান ও ভারত থেকে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এদের অববাহিকাগুলোর মোট আয়তন ১৭,৪৯,০০০ বর্গ কিলোমিটার (বাংলাদেশে ১.৪৮,৪০০ বর্গকিলোমিটার)। এই এলাকায় প্রতি বছর গড়ে ১৩৫০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার জলসম্পদ সৃষ্টি হয়, যার ৭৫% জল বাহির থেকে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করে সাগরে গিয়ে পড়ে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর প্রবাহের মাধ্যমে এই জলসম্পদ আসে এবং এর সাথে আসে ১৭০০ মিলিয়ন টন পলি প্রতি বছর (বাংলাদেশে ১৪০০ মিলিয়ন টন, পশ্চিমবঙ্গে ৩০০ মিলিয়ন টন)। গঙ্গা নদী ও এর উপনদীগুলোর উৎপত্তি হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণ ঢাল ও মধ্যভারতের উচ্চভূমি থেকে; ব্রহ্মপুত্র নদ ও তার উপনদীগুলোর উৎপত্তি হিমালয় পর্বতমালার উত্তর ঢাল এবং দক্ষিণ ঢাল থেকে; মেঘনা নদী ও এর উপনদীগুলোর উৎপত্তি নাগা পাহাড়, লুসাই পাহাড়, এবং মেঘালয়ের উচ্চভূমি থেকে।

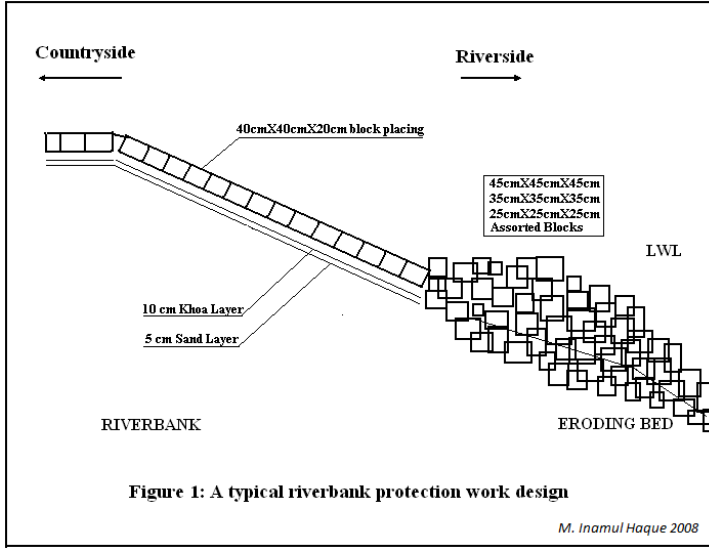
বঙ্গীয় সমতলের অধিকাংশ নদ-নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার উপনদী অথবা শাখা নদী। বাংলার উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর দিকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপনদীসমূহের অবস্থান। বাংলার দক্ষিণ দিকে এই দু'টি নদীর শাখানদীসমূহের অবস্থান। বাংলার উত্তর-পূর্বের অংশে মেঘনা নদীর উপনদীগুলোর অবস্থান। এছাড়াও বাংলার সমভূমিতে কিছু স্বাধীন নদী পশ্চিমে ছোটনাগপুর থেকে উৎপন্ন হয়ে এবং পূর্বে লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে সরাসরি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে।

বাংলাদেশ নদীবহুল দেশ। সুদূর অতীতকাল থেকেই এদেশের গ্রাম ও শহরগুলো নদীতীরে অবস্থিত। বাংলাদেশ আবার বঙ্গোপসাগরের পলিমাটির দেশ। তাই এদেশের নদীগুলোর গতিপথ সদা পরিবর্তনশীল। এই কারণে বাংলার অনেক

নদীই ভাঙ্গনপ্রবণ হওয়ায় এর তীরের অধিবাসীগণ প্রতিবছর ভাঙ্গনের শিকার হয়ে জানমাল হারাচ্ছে ও বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। নদীভাঙ্গনের ফলে অনেক শহর, বন্দর অতীতে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। তাই বাংলাদেশের নদীগুলোর অনেক স্থানেই নাম 'কীর্তিনাশা'। নদীভাঙ্গন প্রতিরোধ কাজে হয়তো সূদূর অতীতে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হত, বর্তমানে তার কোনো প্রমাণ অবশিষ্ট নেই। অতীতের বন্দরগুলো ভাঙ্গনে আক্রান্ত হলে পরিস্থিতি মেনে নিয়েই হয়তো অন্যত্র পুনঃস্থাপিত হত। শহর গড়ে উঠত ঐসকল নদীর তীরে যেসকল নদীতে ভাঙ্গন কম। কিন্তু জনবসতি বৃদ্ধি পাওয়া, সিমেন্ট কংক্রিটের মতো প্রযুক্তির উদ্ভাবন বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের মানুষকে প্রকৌশল জ্ঞানের আলোকে ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে উৎসাহী করে। চাঁদপুর ও সিরাজগঞ্জ বন্দর, যেখানে রেলের শেষ প্রান্ত ছিল নদী তীরসংলগ্ন ঘাট, তা ভাঙ্গনের সাথে স্থান পরিবর্তন করা যেত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে সেখানে সিমেন্ট কংক্রিট ব্লক ফেলার মাধ্যমে ভাঙ্গন প্রতিরোধ শুরু হয়। এই প্রতিরোধ কার্যক্রম এখনও চলছে। আমরা এখন দেশের বহু বহু বন্দর ও শহরকে পাথর কিংবা সিমেন্ট কংক্রিট ব্লক দিয়ে মুড়ে ভাঙ্গন প্রতিরোধ করছি।

বাংলাদেশে জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন, এই চারটি মাস জুড়ে বাংলা পঞ্জিকার বর্ষা ও শরৎকাল, যা অবিরাম বৃষ্টি আর বন্যার কাল। আগাম বন্যা হয় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে, স্থানীয়ভাবে, কালবৈশাখী বৃষ্টির কারণে, পাহাড়ি অঞ্চলে; যেখানে একটি উপত্যকায় বৃষ্টির পানি সংগৃহীত হয়ে নদীতীরের এলাকা হঠাৎ ভাসায়। কালবৈশাখী বৃষ্টি সমতলে বন্যা করে না বরং তাপদক্ষ তৃষ্ণার্ত ভূমিকে জলসিক্ত করে ফসল বোনার জন্যে উপযুক্ত করে। তবে নদীতে বন্যার সাথে সাথেই শুরু হয় নদীতীরের ভাঙ্গন। নদীতীরের যেসকল স্থানে শহর বা জনপদ বা শিল্প কলকারখানা বা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা আছে, সরকারিভাবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সেসকল স্থানে নদীভাঙ্গন প্রতিরোধ করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

কিন্তু নদীভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজটি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং দুর্নীতিযুক্ত। যেসকল প্রতিরোধ কাজ করা হয় তার অনেকগুলো ব্যর্থ হয়ে নদীগর্ভে চলে যায়। অভিযোগ আসে ঠিকমতো কাজ হয়নি বা ভাঙ্গন প্রতিরোধে যথেষ্ট মালামাল পড়েনি। প্রকৃত অবস্থা এই যে, যেসকল স্থানে প্রতিরোধ ব্যবস্থা টিকে থাকে তার অনেকগুলো স্থান আদৌ নদীভাঙ্গনের শিকার নয়। তাই সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন এসে যায়, নদীভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা সফল করা সত্যিই সম্ভব কিনা? নদীভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা যথাসম্ভব ব্যয়-কার্যকর করা যায় কিভাবে? আমার মতে, এইসকল প্রতিরক্ষা কাজে যেসব মালামাল ব্যবহৃত হয় তা সকল ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলেও পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার অধিকতর সুফল দিতে পারে।



নদীভাঙ্গন প্রতিরক্ষা কাজে শ্রোতের আঘাতে নদীভাঙ্গন স্থায়ীভাবে রোধ করতে সাধারণত যা করা হয় তা হল, শীতকালে সর্বনিম্ন পানি সমতার নিচে বড়-ছোট কংক্রিটের ব্লক মিশিয়ে স্তূপ করে ফেলা হয়। এরপর ঐ স্তূপের ধার ঘেঁষে নদীর পাড়ে তীর পর্যন্ত ব্লক পেতে দেয়া হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন শ্রোতে নদীর তলার মাটি খেয়ে যাবে তখন স্তূপের ব্লকগুলো গড়িয়ে পড়ে অভেদ্য দেয়াল তৈরি করবে। নদীর পাড়ে ব্লক পাতার কারণ ঢেউয়ের আঘাতে যেন মাটি সরে না যায়। এই একই ধরনের কাজ নদীর প্রবাহপথ পরিবর্তনের জন্য নির্মিত স্পার বা গ্রইনের বেলাতেও করা হয়। কাদামাটির নদীতীরে পাড়ের চুইয়ে আসা ঝরনার পানির চাপে পাড় ধস, উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার ভাঁটার নদীতে শ্রোত এবং পানি ওঠা নামার কারণে পাড়ভাঙ্গন, জলোচ্ছাস ও নৌপথে যান চলাচলের কারণে সৃষ্ট ঢেউয়ের আঘাতে পাড়ের ভাঙ্গন ইত্যাদি রোধের জন্য প্রায় একই ধরনের পাড় প্রতিরক্ষা কাজ হাতে নেয়া হয়। কিন্তু অনেক কাজই ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার মূল কারণ খুঁজলে দেখা যাবে, ঠিকমতো ডিজাইন, সময়মতো নির্মাণ ও সঠিক মালামালের ব্যবহার না হওয়ার কারণেই মূলত তা হয়েছে।

নদীভাঙ্গন প্রতিরক্ষার জন্য কোনো নদীতে শ্রোতের ভাঙ্গন আছে তা নির্ণয় করা খুবই সহজ। যদি নদীর পানিতে বালি বা পলি থাকে তাহলে সে নদীতে ভাঙ্গন আছে। যদি নদীর পানিতে কাদা থাকে থাকে তাহলে সে নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে। যে নদীর পানিতে বালি, পলি বা কাদা নেই সেই নদীতে ভাঙ্গন হলে সেটা ঢেউয়ের

জন্য হচ্ছে। এই টেউ যন্ত্রচালিত নৌকা, স্পিডবোট বা লঞ্চের জন্য হয়। পরিষ্কার পানির নদীতে অনেক সময় ভারী পাড়ের জন্য ভাঙ্গন হয়। বাংলাদেশের নদীভাঙ্গন প্রতিরোধ কাজগুলো উনিশশ ষাটের দশক থেকেই চলে আসছে। বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ ও চাঁদপুর শহরকে রক্ষার জন্যে আজ পর্যন্ত শত শত কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলছে। বলা যায় নদী-তীরবর্তী প্রায় প্রতিটি জেলা শহর এমনকি অনেক নদীবন্দরকে রক্ষার জন্যে বাপাউবো'র চলমান প্রকল্প আছে। এইসকল প্রকল্পে ব্যবহৃত মালামালের মধ্যে রয়েছে বালি, খোয়া, ইট বা সিমেন্টের ব্লক, পাথরের ব্লক, সিনথেটিক ব্যাগ ও সিনথেটিক চাদর। নদীর ঢাল সমান করে ৪ ইঞ্চি বালির উপর ৬ ইঞ্চি খোয়া বিচিয়ে মাটির ভেতরে জমা পানি চুইয়ে বেরানোর ফিল্টার হিসেবে ব্যবহার হয়। অনেক সময় বালির উপর সিনথেটিক চাদর বা জিওটেক্সটাইল চাদর বসিয়ে এই কাজ করা হয়। এবং তার উপরেই ইট বা সিমেন্টের ব্লক বা পাথরের ব্লক বসানো হয়।

নদীভাঙ্গন প্রতিরক্ষা কাজ মূলত দু প্রকারের। এক বর্ষাকালে আপতকালীন কাজ, যখন বিশেষ কোনো স্থাপনা নদীভাঙ্গন থেকে রক্ষার জন্যে জরুরিভাবে বালির বস্তা ফেলা হয়; দুই শীতকালে স্থায়ী প্রতিরক্ষার কাজ। বর্ষাকালে নদীর শ্রোত যখন পাড়ে আঘাত হানে তখন ঐ পাড়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা থাকলে তা প্রতিরক্ষার জন্যে শ্রোতের মুখে বড় বড় বালির বস্তা ফেলে শ্রোতকে বাধা দেয়া যায়। বাপাউবো ঐসময় জিওটেক্সটাইল কাপড়ের ব্যাগে বালি পুরে নৌকায় করে এনে নদীতে ফেলে। এই কাজটি পাটের তৈরি বড় বড় ছালার বস্তা দিয়েও করা যায়। ছালার বস্তা জিওটেক্সটাইল বস্তার চেয়ে রোদের তাপে বেশি টেকসই। জিওটেক্সটাইল বস্তা যেমন পানির তলায় বেশিদিন টেকে, ছালার বস্তাও বেশিদিন টেকে। তাই সহজলভ্য, ব্যয়সাশ্রয়ী দেশীয় পণ্য পাটের তৈরি ছালা ব্যবহার করা বেশি যুক্তিসম্পন্ন। কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে বালি ও খোয়ার পরিবর্তে জিওটেক্সটাইল চাদর বসানোর প্রবণতা এই প্রতিরক্ষা কাজগুলোকে ব্যয়বহুল, ঝুঁকিপূর্ণ এবং অমেরামতযোগ্য করে রেখেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সুদূর অতীতকাল থেকে সফলতার সাথে পাড় প্রতিরক্ষা কাজ করে আসছে। কিন্তু যমুনা নদীতে স্বল্পব্যয়ের নাম করে কিছু পরীক্ষামূলক স্পার নির্মাণ করা হয়েছে যা ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভাঙ্গন প্রতিরোধে স্বল্পব্যয়ের কাজ বলে কিছু নেই। এছাড়া স্বল্পব্যয়ের নামে জিওটেক্সটাইল সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। এই জিওটেক্সটাইল রোদ ও তাপে গুণ হারায়। তাছাড়া এতে আছে দুর্নীতি। এই কাজে ব্যবহৃত নিম্নমানের সামগ্রী মাঠে পরীক্ষা করা যায় না বিধায় অনেক মালামাল নিম্নমানের হয়। জিওটেক্সটাইল ব্যাগ ভাঙ্গন প্রতিরোধে অতি দ্রুত ফেলা যায় এই যুক্তি দিয়ে কম ফেলে বিপুল পরিমাণে

বিল নেয়া হয় ও কাজ ব্যর্থ হয়। তাই ভাঙ্গন প্রতিরক্ষা কাজে ব্যয় কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হলে যেখানে যা প্রয়োজন সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। যেখানে নদীস্রোতের জন্য ভাঙ্গন আছে সেখানে ভাঙ্গন প্রতিরোধী ডিজাইন, যেখানে ঢেউয়ের ভাঙ্গন আছে ঢেউ প্রতিরোধী ডিজাইন এবং যেখানে অস্থিতিশীল ভারী পাড় সেখানে পাড় স্থিতিশীল করার জন্য ডিজাইন দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, স্রোত প্রতিরোধী কাজে নির্মাণক্রম অনুযায়ী নদীর তলদেশ থেকে কাজ করে না আসলে চুরি বেশি হবে ও সমুদয় কাজ বিফলে যাবে। আবার ঢেউ-প্রতিরোধী কাজে স্রোত-প্রতিরোধী ডিজাইন দিলে ব্যয় ও চুরি বেশি হলেও কাজ টিকে থাকবে। কিন্তু মাটির ভেতরের পানির চাপে পাড় অস্থিতিশীল হলে তা নিক্ষেপন ছাড়া যত Hard Material দেয়া হোক পাড় বসে যাবে।

প্রকৃত অবস্থা এই যে, বর্ষাকালে ভাঙ্গন প্রতিরোধের ত্বরিত ব্যবস্থা হিসেবে বালিভর্তি জিওটেক্সটাইল ব্যাগ নিক্ষেপ করার যে কথা মিডিয়া প্রচার করা হয়, ঐসকল অধিকাংশ কাজই বিফলে যায়। কারণ ঐসকল জিওটেক্সটাইল ব্যাগ বন্ডার পানি সরে গেলে রোদে ফেটে বালি বেরিয়ে যায়। এমনিতেই ভাঙ্গন প্রতিরক্ষা কাজে বালির ব্যাগ ফেলার প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে জনমনে অনেক প্রশ্ন থাকে, তার ওপর অপচয়মূলক লোকদেখানো কাজ দিয়ে জবাবদিহিতার কোনো সুযোগ থাকে না। আমরা এই কাজে পাটের বস্তা ব্যবহারের পরামর্শ দিতে চাই। শুধুমাত্র নদীভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজই নয়, স্থায়ীভাবে সড়ক ও বাঁধ নির্মাণের সময় স্তরে স্তরে মাটি ফেলে ভিত মজবুতকরণের কাজে পাটের চাদর ব্যবহার করা সম্ভব। এখন এইসব কাজে জিওটেক্সটাইল চাদর ব্যবহার করা হয়। বাঁধের পাড়ে জিওটেক্সটাইল চাদর বিছিয়ে তার উপর ব্লক বসিয়ে ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজও পাটের চাদর বিছিয়ে করা সম্ভব। জিওটেক্সটাইল চাদর তেজস্ক্রিয়তার দোষেও দুষ্ট, সেক্ষেত্রে পাটের চাদর অবশ্যই শ্রেয়।

[লেখক: ম. ইনামুল হক। প্রকৌশলী। চেয়ারম্যান, জল পরিবেশ ইন্সটিটিউট।

ই-মেইল: minamul@gmail.com]

পাট উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব

মো. মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশের অবস্থান ২০° হতে ২৬° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° হতে ৯২° দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। কর্কটক্রান্তি (Tropic of Cancer) বাংলাদেশে বুকের ওপর দিয়ে অতিক্রম করেছে। গড় উচ্চতা ১২ মিটার (সমুদ্র সমতলের ওপরে)। বিশ্বজলবায়ুর সংজ্ঞায় বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশের জলবায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত। তাপমাত্রার পরিবর্তন এখানে কম হলেও তার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। যেমন ধারণা করা হয়, আগামী ৩০ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হলে অপ্রতুল চাষযোগ্য জমির ওপর জলবায়ুর প্রভাব খাদ্য উৎপাদনে প্রবল চাপ সৃষ্টি করবে। সুতরাং জলবায়ুর সামান্য পরিবর্তন কার্যত কৃষির ওপর বড় ধরনের আপেক্ষিক প্রভাব ফেলবে। সূর্যের কিরণ ফসলের উন্নয়ন ও উৎপাদনে মূল ভূমিকা পালন করে থাকে বলে তার স্বল্পতায় কৃষি উৎপাদনে নিশ্চিতভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। যুগপৎভাবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে গাছের শ্বসণ (respiration) বেড়ে গিয়ে ফসলের উৎপাদন কমিয়ে দেবে। ইন্টারগর্ভনমেন্টাল ক্লাইমেট চেঞ্জ প্যানেলের (IPCC) ধারণা অনুযায়ী বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২১০০ সালে (১৯৯০ সালের তুলনায়) নিম্নতম পর্যায়ে ১.৪ থেকে ৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (ডি.সে.) বেড়ে যাবে। যা উচ্চতম পর্যায়ে ২.৫ থেকে ৫.৮ ডি.সে. পর্যন্ত বাড়ার সম্ভাবনা আছে গ্রিন হাউজ গ্যাস (GHG) ও বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য প্রভাবের (aerosol effect) কারণে। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব শিল্পবিপ্লবের পূর্বে (১৮৫০ খ্রি.) স্থিতিশীল ছিল ২৮০ পিপিএমভি (পার্টস পার মিলিয়ন ভলিউম) শিল্পবিপ্লব শুরু হলে সেটি প্রতি বছর ১.৫ থেকে ১.৮ পিপিএমভি বাড়ছে। ধারণা করা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব ২১০০ সালে বর্তমানের তুলনায় বেড়ে

গিয়ে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। জলবায়ুর এই পরিবর্তন গাছের বৃদ্ধিতে তারতম্য ঘটিয়ে ফসলের উৎপাদনে বিশাল পরিবর্তন ঘটাবে।

যেহেতু ফসলের ক্রমবৃদ্ধি (growth) ও উন্নয়ন (development) জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে সার্বিকভাবে (dynamically) সম্পর্কযুক্ত। তাই জলবায়ুর এই ক্রম-পরিবর্তন বৈশ্বিক খাদ্য ও আঁশ উৎপাদনে একটি নিশ্চিত পরিবর্তন ঘটাবে। এসব কারণে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে কৃষি উৎপাদনের ওপর কী পরিবর্তন আসবে তা কৃষিবিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিনির্ধারকদের জন্য বিশেষ জরুরি। পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল এবং কৃষি বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক তথা শ্রমঘন খাত। উত্তরের পাহাড়ি এবং দক্ষিণের সমুদ্র উপকূল এলাকায় কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছাড়া পাট বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাতেই উৎপাদিত হয়ে থাকে। পাট উৎপাদনের জন্য উচ্চ তাপমাত্রার সাথে বাতাসের অধিক আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়, যা মার্চ মাস হতে সেপ্টেম্বর মাস অর্থাৎ খরিফ-১ ও খরিফ-২ মওসুম জুড়ে বাংলাদেশের সর্বত্র বিরাজমান থাকে। ফলে সর্বোৎকৃষ্ট পাট সারা বিশ্বের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই উৎপাদিত হয়ে থাকে। পাট পচনশীল (biodegradable) এবং পরিবেশবান্ধব। তাই পাট ও সমগোত্রী আঁশ জাতীয় ফসলের চাহিদা সময়ের সাথে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ কৃত্রিম আঁশ যুগপৎভাবে মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশকে দূষিত করছে।

বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তন এবং তার কী প্রভাব কৃষি তথা পাটের মত কৃষিজ পণ্যের ওপর পড়বে সেটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার ওপর ব্যাপক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নির্ণয় করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো (parameters) সরাসরি পরিমাপ করা খুবই ব্যয়সাধ্য এবং এর জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন, যেটা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য অসম্ভব বিষয়। ফসল বৃদ্ধির সিমুলেশন মডেল (crop growth simulation model) সেক্ষেত্রে স্বল্প ব্যয় ও অল্প সময়ের সর্বোৎকৃষ্ট বিকল্প, যার দ্বারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন মাত্রা ও প্রতিবেশ (scenarios) বিবেচনা করে ফসলের উৎপাদনে তার প্রভাব নির্ণয় (simulation) করা যায়। এয়াবৎ বিশ্বে উদ্ভাবিত এমন মডেল খাদ্যশস্যের ওপরেই বেশি উদ্ভাবন করা হয়েছে, আঁশ জাতীয় ফসলের ওপর সীমিত সংখ্যক যা উদ্ভাবিত হয়েছে তার সবগুলোই প্রায় তুলার ওপর। এ বিষয়ে বাংলাদেশে খুবই সীমিতসংখ্যক গবেষণা হয়েছে, যার সবগুলোই খাদ্যশস্যের ওপরে। আঁশ জাতীয় ফসলের ওপর তেমন কোনো গবেষণা পাওয়া যায় না। ফাইবগ্রো (Fibgrow) মডেলই বাংলাদেশে আঁশ জাতীয় ফসলের ওপর প্রথম মডেল এবং বিশ্বে পাটের ওপর প্রথম মডেল (Md. Mujibur Rahman, 2010)।

এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যই হল ফাইব্রো মডেল ব্যবহার করে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পাটের উৎপাদন কেমন হবে তা নির্ণয় করা।

তাপমাত্রা : ফসল উৎপাদনের জন্য একটি জরুরি বিষয় (parameter) যা উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে (ফসলের শারীরিক ও প্রজনন) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পাট উৎপাদনের সময়ে (মাসগুলোতে) দৈনিক গড় (গত ৩০ বছরের) সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও দিবাভাগের তাপমাত্রা নিম্নে ১ নম্বর সারণিতে দেখানো হল।

সারণি ১

পাট উৎপাদনের সময়ে দেশের গড় তাপমাত্রা

তাপমাত্রা (ডি. সে.)	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর
সর্বোচ্চ	৩১.৭৬	৩৩.২০	৩২.৮৬	৩১.৬৮	৩১.০৪	৩১.২৬	৩১.৫৩	৩১.৩৩
সর্বনিম্ন	১৯.৬৫	২৩.২০	২৪.৫৫	২৫.৫১	২৫.৬০	২৫.৬৯	২৫.৩৮	২৩.৬৫
দিবাভাগ	২৮.৭৩	৩০.৭০	৩০.৭৮	৩০.১৪	২৯.৬৮	২৯.৮৭	২৯.৯৯	২৯.৪১

সূত্র: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), ২০০৬।

সূর্যের কিরণ (Solar Radiation) : ফসল উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। গাছের পাতার মাধ্যমে গৃহীত কার্বন ডাই অক্সাইড সূর্যের কিরণ শক্তির (Photosynthetically Active Radiation, PAR) দ্বারা খাবার (CH₂O) তৈরি করে গাছের বর্ধন কলা (structural tissues) গঠিত হয়।

কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব [CO₂] : গাছের শারীরিক গঠনের একটি মূল কলা (structural tissue) হল কার্বন বা কার্বোহাইড্রেড (CH₂O), যেটি একটি জটিল জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাছের পাতার মাধ্যমে গৃহীত কার্বন ডাই অক্সাইড হতে গঠিত হয়ে থাকে। সুতরাং বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড-এর ঘনত্ব গাছের শারীরিক গঠনের একটি মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব সাধারণত একটি স্থিতিশীল (optimum condition) পরিমাণে থাকে, যার বর্তমান পরিমাণ ৩৯০ পিপিএমভি।

তাপমাত্রার সাথে সূর্যের কিরণের মিলিত ফলাফল : বর্ধিত তাপমাত্রা আঁশের ফলন কমিয়ে দেয়, কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বেড়ে গেলে সি-৩ (পাট সি-৩ পর্যায়ভুক্ত) ফসল লাভবান হয়। সেক্ষেত্রে বর্ধিত তাপমাত্রার সাথে সূর্যের কিরণের বৃদ্ধি ঘটলে যৌথ ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১, ২ ও ৩ ডি.সে. তাপমাত্রা

বৃদ্ধির সাথে ৪৪০, ৪৯০, ৫৪০ ও ৬৪০ পিপিএমভি কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্বের মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে আঁশের ফলন ফাইব্রো মডেল ব্যবহার করে সিমুলেট করা হয়েছে।

বাতাসের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় আঁশের ফলন সিমুলেট করা হয়েছে। ভিত্তি বছরে (২০০৬) সর্বোচ্চ (মওসুমের গড়) তাপমাত্রা ছিল ৩৩.২৬ ডি.সে. এবং আঁশের ফলন সিমুলেট করা হয়েছে ২০৯৭ কেজি (প্রতি হেক্টরে) সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডি. সে. হলে আঁশের ফলন কমে ৫.১৯% এবং এ কমার হার তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে। প্রতি ১ ডি.সে. সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে ৪০ ডি.সে. পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় আঁশের ফলন যথাক্রমে ১৩.০৬, ২২.৪৭, ৩২.৪৫, ৪৩.০৭, ৫৪.৮৬ ও ৬৬.৭৪% কমে যায়। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়ার ফলাফল পাটের আঁশ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ভিত্তি বছরে (২০০৬) সর্বনিম্ন (মওসুমের গড়) তাপমাত্রা ছিল ২৪.৭৯ ডি. সে. এবং সেক্ষেত্রে মডেল আঁশ উৎপাদন সিমুলেট করেছে ২০০৪.১৬ কেজি/হেক্টর। এক্ষেত্রেও অর্থাৎ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে আঁশের ফলন কমে থাকে, ২৫ ডি.সে. তাপমাত্রায় আঁশের ফলন দাঁড়ায় ১৯৯৩.৫৭ কেজি/হেক্টর। আঁশের ফলন ৩.১৪, ৫.৯৬, ৮.৯৪, ১১.৯৬, ১৫.১৪ এবং ১৮.৪৩% কমে যায় প্রতি ১ ডি. সে. তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে, যেটি প্রমাণ করে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়ার প্রভাবও নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে আঁশ উৎপাদনের ক্ষেত্রে।

পাট উৎপাদনের মওসুমে গড় সূর্যের কিরণ ২০০৬ সালে ছিল ১২.৭৪ মে. জৌ./ব.মি./দিন, এবং আঁশের ফলন সিমুলেট করা হয় ১৬৮৫.৩৮ কেজি/হেক্টর। ২০ মে. জৌ./ব.মি./দিন পর্যন্ত প্রতি ১ মে. জৌ./ব.মি./দিন সূর্যের কিরণ বাড়ার সাথে সাথে ফলন যথাক্রমে ৩.৪৩, ১৬.০২, ২৬.৭৭, ৩৫.৬৫, ৪৩.৬৮, ৫০.৯৫, ৫৭.৭১ ও ৬৩.৭০% বেড়ে যাবে, যদি অন্যান্য প্রতিক্রিয়া (বাতাসের তাপমাত্রা ও কার্বন অক্সাইডের ঘনত্ব) অপরিবর্তিত থাকে।

কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়ার প্রতিক্রিয়ার আঁশে উৎপাদনের প্রভাব সিমুলেট করা হয়েছে। কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব ৩৯০ পিপিএমভি (ভিত্তি বছর ২০০৬-তে) হতে বেড়ে ৪৪০ পিপিএমভি হলে আঁশের ফলন ৭.২৫% বেড়ে যাবে। কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বেড়ে ৪৯০, ৫৪০, ৬৪০ ও ৭৪০ পিপিএমভি হলে আঁশের ফলন বেড়ে যাবে যথাক্রমে ১১.৩৬, ১৪.৮৫, ১৭.৪০, ২১.৭৩ এবং ২৪.৬৮%।

বাতাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি (০ ডি. সে., + ১ ডি. সে., + ২ ডি. সে. এবং + ৩ ডি. সে.) ও সূর্যের কিরণ পরিবর্তনের (০% + ৫% + ১০% এবং -৫%) ১৬ টি ট্রিটমেন্ট কম্বিনেশনে আঁশের ফলন সিমুলেট করা হয়েছে। বাতাসে ভাসমান নানান পদার্থের জন্য সূর্যের কিরণ কমে যাওয়ার সম্পর্ক আছে। বর্ধিত সূর্যের কিরণ গাছের বৃদ্ধিতে সহযোগী ভূমিকা পালন করে কিন্তু একই সাথে তাপমাত্রা বাড়ার মিলিত প্রভাব আঁশের উৎপাদন কমিয়ে দেয়। ফাইব্রো মডেল দ্বারা সিমুলেট করে দেখা গেছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১ ডি. সে.-এর মধ্যে থাকলে সূর্যের কিরণ ৫% থেকে ১০% বৃদ্ধিতে আঁশের উৎপাদন বেড়ে যায়, কিন্তু তাপমাত্রা ২ ডি. সে. বা তদূর্ধ্ব বৃদ্ধিতে আঁশের উৎপাদন ১৫% থেকে ৫০% পর্যন্ত কমে যায়। কিন্তু সূর্যের কিরণ ৫% কমে গেলে তাপমাত্রা কমা বা বাড়ার সকল ক্ষেত্রে আঁশের উৎপাদন কমে যায়।

বাতাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি (০ ডি. সে. + ১ ডি. সে., + ২ ডি. সে. এবং + ৩ ডি. সে.) এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্বের (৩৯০, ৪৪০, ৪৯০, ৫৪০ এবং ৬৪০ পিপিএমভি) ২০ টি ট্রিটমেন্ট কম্বিনেশনে আঁশ উৎপাদন ফাইব্রো মডেল দ্বারা সিমুলেট করা হয়েছে। কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব ৪৪০ থেকে ৬৪০ পিপিএমভি পর্যন্ত বৃদ্ধিতে (যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি না পায়) আঁশের উৎপাদন ৫% হতে ১৪% পর্যন্ত বেড়ে যায় কিন্তু তাপমাত্রা ১ ডি. সে. হতে ৩ ডি.সে. বৃদ্ধিতে আঁশের উৎপাদন ১৪% (৬৪০ পিপিএমভি) থেকে ২৮% (৪৪০ পিপিএমভি) এবং ৩৬% (৩৯০ পিপিএমভি) পর্যন্ত কমে যায়। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্বের বৃদ্ধি, তাপমাত্রার ১ ডি. সে. পর্যন্ত বৃদ্ধির ক্ষতি পোষাতে সক্ষম, কিন্তু তাপমাত্রা ২ ডি. সে. বা তদূর্ধ্ব বৃদ্ধির ক্ষতি (আঁশ উৎপাদনের ক্ষেত্রে) মারাত্মক প্রভাব ফেলবে।

জলবায়ুর গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারগুলোর (বাতাসের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, সূর্যের কিরণ ও কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব) দশকওয়ারি পরিবর্তনের খতিয়ান বিভিন্ন বৈশ্বিক জলবায়ুর মডেল (GCM) ও আইপিসিসি যেভাবে বর্ণনা করেছে তা নিম্নোক্ত সারণি ২-তে দেখানো হল।

সারণি ২
২১০০ সাল পর্যন্ত দশকওয়ারি জলবায়ুর পরিবর্তন

প্যারামিটার	বছর									
	২০১০	২০২০	২০৩০	২০৪০	২০৫০	২০৬০	২০৭০	২০৮০	২০৯০	২১০০
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডি.সে.)	৩৩.২৬	৩৪.০১	৩৪.৭৬	৩৫.৫১	৩৬.২৬	৩৭.০০	৩৭.৭৬	৩৮.৫০	৩৯.২৫	৪০.০০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডি.সে.)	২৪.৭৯	২৫.৪৮	২৬.১৭	২৬.৮৬	২৭.৫৫	২৮.২৪	২৮.৯৩	২৯.৬২	৩০.৩১	৩১.০০
সূর্যের কিরণ(মে.জৌ./ব.মি./দিন)	১২.৭৪	১৩.৫৫	১৪.৩৫	১৫.১৬	১৫.৯৭	১৬.৭৭	১৭.৫৮	১৮.৩৯	১৯.১৯	২০.২০
কার্বন ডাই অক্সাইড(পিপিএমভি)	৩৯০.০০	৪০৬.৬৭	৪২৩.৩৩	৪৪০.০০	৪৫৬.৬৭	৪৭৩.৩৩	৪৯০.০০	৫০৬.৬৭	৫২৩.৩৩	৫৪০.০০

জলবায়ু উপর্যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারগুলোর (সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, সূর্যের কিরণ ও কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব) দশকওয়ারি পরিবর্তন ধরে (সারণি ২) ফাইব্রো মডেল দ্বারা পাটের আঁশ উৎপাদন সিমুলেট করা হয়েছে।

জলবায়ুর ক্রমাগত পরিবর্তনের সাথে আঁশের উৎপাদন ২০৩০ সাল পর্যন্ত খুব একটা তারতম্য না হলেও ২০৩০ সালের পর উৎপাদন কমা হার বৃদ্ধি পাবে, এটা বেশ দৃঢ়তার সাথেই বলা যায়। পাটশস্য (corp physiological) শ্রেণিবিন্যাসে সি-৩ পর্যায়ভুক্ত হওয়ার দরুন বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব (৪২৩ পিপিএমভি) বৃদ্ধি এবং সূর্যের কিরণের সুবিধা (১৪.৩৫ মে. জৌ./ব.ম./দিন) ব্যবহার করে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১.৫০ ডি. সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১.৩৮ ডি. সে. বৃদ্ধিতে গাছের শ্বসণ প্রক্রিয়া (respiration) বৃদ্ধির চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু ২০৪০ সাল এবং তারও পরবর্তী সময়ের জন্য আঁশের উৎপাদন অতি দ্রুততার সাথে কমে বর্তমানে ১৯১০ কেজির স্থলে হেক্টর প্রতি ৮১১.১৫ কেজিতে পৌঁছাবে, যদিও তখন বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব ৫৪০ পিপিএমভি এবং সূর্যের কিরণ ২০ মে. জৌ./ব.মি./ দিন থাকবে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় ভবিষ্যতের পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাবে পাট ও সমগোত্রীয় আঁশ জাতীয় ফসলের উৎপাদন বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে পতিত হবে।

[লেখক: মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সিএসও), পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।]